ভারতের বিদেশনীতিতে বাংলাদেশ : জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিকতা

গবেষক:কৌশিক বৈদ্য
রেজিস্ট্রেশন নং:A00IR1200315

তত্বাবধায়ক:
প্রফেসর ইমনকল্যাণ লাহিড়ী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

Certified that the Thesis entitled

'ভারতের বিদেশনীতিতে বাংলাদেশ :জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিকতা' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Iman Kalyan Lahiri and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: .....

Candidate:

Dated: .....

Dated: .....

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(Acknowledgement)

এই গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ করতে আমাকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। এই ছোটো পরিসরে আমি তাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ও আমার Ph.D.-র তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ইমনকল্যাণ লাহিড়ি মহাশয়কে। যাঁর কাছে আমি চিরঋণী, মহাশয়ের সাহায্য ছাড়া আমি এই গবেষণাপত্রটি কখনোই সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। আরও ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকশিক্ষিকাগণকে, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় গ্রন্থাগারের পার্থদাকে, যিনি নানা সময়ে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই ড. অভিজিৎবাবু ও দেবাংশুবাবুকে, যাঁরা আমাকে বাংলাদেশের কক্সবাজার স্থিত রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সর্বোপরি, আমি কৃতজ্ঞ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার প্রতি, যাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতা ব্যতীত এই কাজটি সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হত না। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের যারা অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে সাহায্য করেছেন নানা মতামত দিয়ে। ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধুদেরকে, যাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমাকে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

কৌশিক বৈদ্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

(Content)

	ভূমিকা	৭
	উদ্দেশ্য	১৩
	নিবন্ধ পর্যালোচনা	১৫
	গবেষণা প্রকল্প	২০
	গবেষণাপদ্ধতি-প্রকরণ	২২
	গবেষণা সম্বন্ধিত সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ	২৪
প্রথম অধ্যায়	দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ও বৈদিশিক নীতির বিবর্তনঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	২৫
	১.১ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের ইতিহাসের সন্ধানের প্রথম পর্যায়	
	১.২ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের ইতিহাসের সন্ধানের দ্বিতীয় পর্যায়	
	১.৩ অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয়করণ	
	১.৩.১ খাজা নিজামুদ্দিন ও গোলাম মোহম্মদ	
	১.৩.২ দ্বিতীয় সংবিধান সভা	
	১.৩.৩ আয়ুব খানের ক্ষমতা দখল	
	১.৩.৪ মুজিবরের ছয় দফা দাবি	
	১.৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ	
	১.৫ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশ গঠনে ভারতরাষ্ট্রের ভূমিকা	৬০
তৃতীয় অধ্যায়	ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক	৭১
	৩.১. তিস্তা চুক্তি	
	৩.১.১ তিস্তার উৎপত্তিস্থল	
	৩.১.২ তিস্তা— উৎপত্তি, উৎস, বিতর্ক	
	৩.১.৩ তিস্তার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব	

৩.১.৪ তিস্তা ইস্যুতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব : আন্তর্দেশীয় বিতর্কসমূহ

৩.১.৫ জীববৈচিত্র্য ও জনজাতিসমূহ

৩.১.৬ তিস্তা ও ভূ-গর্ভস্থ জলের প্রশ্ন

৩.১.৭ তিস্তা অববাহিকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন

৩.১.৮ ২০১১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে চুক্তি কার্যকর না হওয়া

৩.১.৯ উত্তরবঙ্গের সমস্যা

৩.১.১০ বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া

৩.১.১১ রুদ্র কমিশন গঠন ও রিপোর্ট পেশ

৩.১.১২ তিস্তা জলবণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ

৩.২. স্থল সীমান্ত চুক্তি

৩.২.১ ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমান্ত সমস্যা

৩.৩. বাণিজ্য ও পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি

৩.৩.১ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য-পরিবহন (ট্রানজিট) চুক্তি

৩.৩.১.১ বাণিজ্য ও পরিবহন (ট্রানজিট) চুক্তির ফলে বাংলাদেশের আশঙ্কা

৩.৩.১.২ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও পরিবহন (ট্রানজিট) চুক্তির সুবিধা

৩.৩.১.৩ পরিবহনের সম্ভাব্য পথ নির্দেশনা

৩.৩.২ যৌথ উদ্যোগে ভারত-বাংলাদেশ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

৩.৩.৩ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা

৩.৩.৪ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ভারত সরকার ব্যবহার করতে পারবে

৩.৩.৫ ভারত-বাংলাদেশ তুলনামূলক আলোচনা

৩.৩.৬ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌ-বাণিজ্য

৩.৪. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

৩.৪.১ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

৩.৪.১.১ ভারতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা

৩.৪.১.২ স্কলার ও স্কলারশিপ-এর ভূমিকা

৩.৪.১.৩ নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও চাপসৃষ্টিকারী সংগঠনগুলির ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়	নিরাপত্তা— সামরিক ও অসামরিক	১১৮
	৪.১ আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইবুনাল	
	৪.২ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া	
	৪.৩ বাংলাদেশি সমাজের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া	
	৪.৪ খাগড়াগড়	
	৪.৫ বাংলাদেশে ও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল	
	৪.৬ বেআইনি বাণিজ্য	
	৪.৭ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবাবেগ বৃদ্ধির প্রভাব	
	৪.৮ সামরিক ও রণ ংনীতিগত দিকসমূহ	
পঞ্চম অধ্যায়	জাতীয় নিরাপত্তা— আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিক জোট	১৬৯
	৫.১ আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক জোট	
	৫.২ ভারতের ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতি	
	৫.৩ রোহিঙ্গা সমস্যা	
	৫.৪ রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন রিপোর্ট	
	উপসংহার	১৯৪
	গ্রন্থপঞ্জি	২০১

ভূমিকা

(Introduction)

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি ভারত রাষ্ট্রের মনোভাব বরাবরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং তা হল ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক স্বার্থ। ফলত নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ কখনোই সেই ভূমিকা নেয়নি— যা নয়াদিল্লিকে সমস্যার মধ্যে ফেলবে। বাংলাদেশ এই কারণে সেই সকল দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপন থেকে বিরত থেকেছে, যা এই উপমহাদেশে কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে। একই কারণে ভারতবর্ষের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে হানিকর হতে পারে, এমন কোনো প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তিতে বাংলাদেশ প্রবেশ করেনি। নিজভূমিতে এমন কোনো বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতিকেও স্বীকার করেনি, যে শক্তি ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকা নিতে পারে। বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের থেকে একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে এবং কাশ্মীর প্রসঙ্গে দেখিয়েছে এক অখণ্ড নীরবতা। প্রতিদানে ভারতরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক সহযোগী হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে এবং তার ভারসাম্য বিপন্ন হবার যেকোনো চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেছে পরিস্থিতি অনুসারে। ভারতরাষ্ট্রের অখণ্ডতা, ভৌগোলিক গুরুত্ব ও উপমহাদেশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করে নেবার ফলে ভারতবর্ষের শাসকরা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও রণনীতিগত নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

ভারতরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশই হল নিকটতম। স্থলভাগ-জলভাগ দুই সীমান্তে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। একমাত্র পার্থক্যসূচক বিষয় হল বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় পরিচয় ইসলাম— যে পার্থক্য এই দুই দেশের সম্পর্ককে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশরাজ বঙ্গবিভাজনের সিদ্ধান্ত নেয় মূলত প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদী হিন্দু বাঙালিকে প্রতিরোধহীন করার লক্ষ্যে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি অবশ্য এই বিভাজনকে সমর্থন করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের স্থায়ী বীজ বপন করে, যার ধারাবাহিকতায় ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লিগ। ১৯৪৭ পূর্ব বাংলায় এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতই তার বিষবাষ্পকে প্রসারিত করে— নোয়াখালি সংঘাত ও The Great Calcutta Killing-এর মধ্যে দিয়ে। পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণ হিন্দু জমিদার শ্রেণির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এবং সরকারি চাকুরিসহ বুদ্ধিবৃত্তির সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। ফলত বাঙালি মুসলিম জাতীয়তা বঙ্গবিভাজনকে অনিবার্য করে তোলে এবং অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ে বাঙালি মুসলিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে নেয়। পরবর্তী কয়েক দশক বাঙালি মুসলিমের আত্মপরিচয় সন্ধানের ইতিহাস। বাংলাদেশের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ইলিয়াস আখতারুজ্জামান এই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিকে তার দুই সুবিখ্যাত উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই* ও

খোয়াবনামা-তে উপস্থিত করেছেন এক অননুকরণীয় কায়দায়। '৪৭ পরবর্তী দশকগুলিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম মূর্ত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে দিয়ে। 'হিন্দু ভারতের' সঙ্গে তার টানাপোড়েন তাই কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, তার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ধর্ম, রাজনীতি ও নিরাপত্তা প্রশ্নটি দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিতে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই উপনিবেশিক সময় থেকে নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে Divide and Rule Policy-র বাস্তবায়ন ঘটেছে এবং উপনিবেশিক ভারত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে এক নতুন মাত্রাই শুধু যুক্ত করে, কারণ তা ছিল ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। একদিকে দেশভাগ দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে যেমন সংঘাতকে বাড়ায়, তেমনই দুটি দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে এক বড়ো প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নটি জাতিগঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাই গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিক থেকে বলতে গেলে, এই সমস্যা রাজনীতির, ধর্মের নয়।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় মূলত জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ধারণাকে সম্বল করে। উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি একটি কেন্দ্রীভূত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রায়শই মূল ধারার রাষ্ট্রপোষিত জাতীয়তাবাদের ধারণাকে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এক্ষেত্রে দুটি মডেলকে সামনে রেখে এগিয়েছে— ১. বাঙালি জাতি ও ২. বাংলাদেশি জাতি। দুই মডেলের পরিণামে দেশের সংখ্যালঘু সমাজ ক্রমশই বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক হয়েছে।

যদিও বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের নিশান উঠিয়েই, ধর্ম অতি দ্রুত এক গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের বীজ বপন হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, যখন জাতির জনক মহম্মদ আলি জিন্না উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন তার ঢাকা সফরকালীন সময়ে। নব রাষ্ট্র পাকিস্তান পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ধর্মকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে দেখা হতে থাকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বাংলাভাষার জন্য আরবি লিপির সুপারিশ করেন। বলা হয় যে, ''Not only Bengali literature, even the Bengali alphabet is full of idolatry. Each Bengali letter is associated with this or that god or goddessess of Hindu Pantheon ... Pakistan and Devnagri script cannot co-exist. It looks like befriending the frontier of Pakistan with Bharati Soldiers! ... To ensure a bright and great future for the Bengali language, it must be linked up with the Holy Quran ... Hence the necessity and importance of Arabic script.''

পূর্ববঙ্গের মানুষ ধর্মের এহেন ব্যবহারকে আধিপত্য বিস্তারের কৌশল হিসেবে দেখেছিলেন। এই ইসলামীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করার জন্যই এক 'ধর্মনিরপেক্ষ' জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি। '৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকেই এই দাবি বিবর্তিত হয় প্রথমে অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং তারপর পশ্চিম পাকিস্তানি এলিট নেতৃত্বের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ও স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলস্বরূপ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, নতুন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্যকারী ভূমিকায় রাখবে। যদিও বাস্তবে এই নবরাষ্ট্র যখন তার নিজস্ব উদ্যোগে এক সমসত্ত্ব বিশিষ্ট জাতি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থান ও জনমতকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্ন জোরালো হতে থাকে। জাতীয়তাবাদ যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি মতাদর্শিক নির্মাণ, ফলত মুজিবর রহমানও বাধ্য হন শেষপর্যন্ত ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির সঙ্গে আপোশ করতে। যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, ততদিন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা হিসেবে থেকেছে এবং মুসলিম পরিচিতির থেকে বাঙালি পরিচিতি ছিল অনেক বেশি গ্রহণীয়। কিন্তু যেই মুহূর্তে পূর্ববর্তী প্রভাবের অবসান হল, মুসলিম পরিচিতি সামনে এল সমান তালে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা এবং ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আওয়ামি লিগের অতি সম্পর্ককে দেখা হতে লাগল হিন্দু আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে। শিক্ষা থেকে গণমাধ্যম— সমস্ত স্তরে এই মুসলিম পরিচিতির বিকাশ যত বেশি সোচ্চার হয়েছে, বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি হয়েছে দুর্বল। টিভিতে সংবাদ উপস্থাপিকা যেমন ধর্মাশ্রয়ী শব্দকে ব্যবহার করে গণমাধ্যমকে সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, তেমনই রাজনৈতিক নেতৃত্বের বক্তব্য ও ভাষণে মুখের ভাষাও পালটিয়েছে। Bangladesh Nationalist Party (BNP)-র রাজনৈতিক নেতা জিয়াউর রহমান তার নিজস্ব ভাষায় তাই বলে ওঠেন, ''Religious belief and love for religion are a great and imperishable characteristic of the Bangladeshi Nation ... the vast majority of our people are followers of Islam. The fact is well reflected and manifest in our stable and liberal national like.''

গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এটা দেখানোর চেষ্টা থেকেছে যে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তা উত্তর-উপনিবেশিক ভারত ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক হিংসার জন্ম দিয়েছে, সংখ্যালঘিষ্ঠকে প্রান্তিক ও বিপন্ন করেছে এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে জটিল করে তুলেছে। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই জাতীয়তা কীভাবে এক অমানবীয় রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের এই সমাজে তাদের পরিচিতির ভিত্তিতে কীভাবে আলাদা করা হয়েছে এবং কীভাবে বৈষম্যমূলক নীতি ও আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে প্রান্তিককে। রাজনীতির নামে এই সংখ্যাগরিষ্ঠবাদী গণতন্ত্র তার বহুত্ববাদী চেহারা নিয়ে কীভাবে ধ্বংস করেছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ও মানুষকে পরিণত করেছে ভোটের সংখ্যায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাব পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করেছে আরও।

নিরাপত্তার প্রশ্নটি সমাধান করতে হলে তাই সমাজের গণতন্ত্রীকরণ জরুরি। ভারত ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রকেই তার সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় দায়বদ্ধ ভূমিকা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্তরে এই পর্যায়ের দায়বদ্ধতা থাকলেই সংখ্যাগুরু হোক বা সংখ্যালঘু— যেকোনো ধরনের মৌলবাদকে প্রতিহত করা সম্ভব।

ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে— প্রথমত, ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের পর্যায়; দ্বিতীয় পর্যায় বলা যায় সামরিক শাসনের বছরগুলি '৯০-এর দশক পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় পরবর্তীকালে বহুদলীয় শাসনের সময়কাল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এক উল্লাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল এবং তৎকালীন কংগ্রেসি নেতৃত্বকে এক অবিসংবাদিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন সেই বিজয় উদ্‌যাপনের দিনে ভারতরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে থেকে হিন্দু-শিখ ও অন্য সম্প্রদায়ের কমান্ডারদের উপস্থিত করে এটা দেখানোর জন্য যে, এই বিজয় আসলে পাকিস্তানি মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। এটা দেখানোর প্রয়াস চলে যে, এই বিজয় আসলে জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে এক জোরালো আঘাত এবং ভারতরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি এর ফলে জয়যুক্ত হয়েছে। মার্কিনী শক্তি ও চীনারা, যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল, সেই অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয় এবং দেখানোর প্রয়াস চলে যে, এই নবরাষ্ট্র গঠন একান্তভাবে সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় জনগণের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে। এটা স্থির সত্য হিসেবে তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই নবরাষ্ট্র ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াবে না এবং প্রতিদানে ভারতরাষ্ট্র তাকে নৈতিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা প্রদান করবে।

বিচক্ষণতার সঙ্গে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশ একটি উপগ্রহ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ভারতরাষ্ট্র তার উদারতা ও দাক্ষিণ্যের মধ্যে দিয়ে এই নবগঠিত রাষ্ট্রটির সহজাত বিবিধ সমস্যার সমাধান করবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভয়াবহ সাইক্লোনের আঘাত, যার ফলশ্রুতিতে জন্মলাভের পরেই প্রায় ১ কোটি মানুষ ঘরছাড়া ও বাস্তুচ্যুত হয়। পাল্লা দিয়ে বাড়ে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ ও সর্বোপরি ছিল শেখ মুজিবর রহমানের অপদার্থ প্রশাসন। ভারতরাষ্ট্র এই পর্যায়ে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, ওষুধপত্র, বাড়ি বানানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রভূত পরিমাণে সরবরাহ করলেও তা কোনোভাবেই পর্যাপ্ত ছিল না।

পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয়ও তার গতি হারায় এবং ধর্মীয় অভিমুখ ধীরে ধীরে পুনঃজাগরিত হতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতি যদিও শেখ মুজিবর রহমানের এক ধরনের দায়বদ্ধতা ছিল, কিন্তু তবুও ইসলাম বাংলাদেশের প্রাথমিক আত্মপরিচয় হিসেবে বিকশিত হতে থাকে এবং সৌদি আরবের মতো দেশ, যারা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে ঋণ ও অনুদান প্রদান করে, সেই সকল ইসলামিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বাড়তে থাকে। মুজিব-পরবর্তী নেতৃত্বের কাছে ইসলাম একটি গতিসঞ্চারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তান এবং অন্য ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যত ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে, ততই একমাত্র কেন্দ্রীয় বন্ধু হিসেবে ভারতবর্ষের ভূমিকা দুর্বল হয় এবং বাংলাদেশী সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার ও বাঙালি জাতীয়তার আদর্শ থেকে গোটা ইসলামিক শক্তির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকে। মুজিব হত্যার পরবর্তীকালে এই মৌলবাদী সংস্কৃতির বিকাশ তুঙ্গে ওঠে এবং সামরিক শাসনের পর্যায়কাল

জুড়ে বাংলাদেশের সমাজে ভারতের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির কাছে এই অবস্থা ছিল চূড়ান্ত বিজয় থেকে একেবারে সামূহিক বিপর্যয়।

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক বাহিনীর এক অংশের সহযোগিতায় মুজিব-পরবর্তীকালে সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল এবং এই অভ্যুত্থানের পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, চীন এবং সৌদি আরবের মতো দেশের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের এটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়, যখন ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষিত হয়। ঢাকার সরকারি নীতি এই পর্যায়ে ছিল ভারত থেকে ঘোষিত দূরত্ব বজায় না রেখেও পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন শক্তিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক শক্তিকে রাষ্ট্রীয় মদতদান। এই পর্যায়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক দুর্বল হয় এবং বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের জন্য বাংলাদেশ সেইসকল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়— যারা এককালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। ৮০-র দশকের শেষ এবং ৯০ দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদানের মধ্যে ভারতের ভাগ ছিল যৎসামান্য। যদিও এই পর্যায়ে ১৯৮৮ সালে সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা সংঘটিত বিপর্যয়ে নয়াদিল্লি ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশে এবং সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সময় ছিল দুই দেশের সম্পর্কের শীতলতম পর্যায়।

১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের অবসান ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের আর এক পর্যায়ের সূচনা হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, তার দাবি ছিল ভারতীয় দখলদারি থেকে মুক্তি। প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে আওয়ামি লিগ (AL) শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদ নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। যে সকল আদর্শ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের অবস্থানের সঙ্গে তা ছিল সমগোত্রীয়। সহজাত কারণেই নয়াদিল্লির শাসকরা মুজিব কন্যা শেখ হাসিনাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের দুই রাজনৈতিক দলই ইসলামের পুনরাবির্ভাবের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের আত্মীকৃত করে এবং জামাত-ই-ইসলামের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইসলামিক এই সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধকে বর্ণনা করেছিল ভারত ও ইসলামের মধ্যে সংঘাত হিসেবে। নির্বাসন পর্ব শেষ করে সামরিক শাসনের সময়কাল জুড়ে এই সংগঠনের নেতারা দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং মূলধারার দুই রাজনৈতিক দল যেহেতু তাদের প্রতি তোষণ নীতি অনুসরণ করে, ফলত এই সংগঠন পুষ্ট হয় এবং ইসলামীয় চিন্তার বিকাশের পথে বস্তুগত পরিস্থিতি প্রস্তুত হয়। ২০০২-২০০৬-এর মধ্যে বিএনপি-র শাসনকালে একের পর এক জঙ্গি আক্রমণ ও বাংলাদেশ জুড়ে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘুদের আক্রান্ত হবার ঘটনা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে এক উত্তেজনার পর্যায়ে নিয়ে আসে। আল-কায়দা,

জামাত-ই-ইসলাম সহ অন্যান্য ভারতবিরোধী শক্তি এই পর্যায়ে বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করতে থাকে এবং পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা ISI এবং বাংলাদেশ প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

২০০৯ সালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামি লিগের প্রত্যাবর্তন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের চতুর্থ পর্যায় হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই পর্যায়ে অর্থনীতি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দুই দেশের নিকটত্ব প্রসারিত হয় এবং ২০১৪ সালে আওয়ামি লিগের পুনরায় জয় ভারতের কাছে যেন মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খাকে সম্প্রসারিত করে। বর্তমান পর্যায়ে এরই ধারাবাহিকতায় অতীতের সমস্যাগুলিকে নতুনভাবে ফিরে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে কোনো পূর্ব ধারণা ছাড়াই দুই দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ককে প্রসারিত করতে পারে।

উদ্দেশ্য

(Objective)

ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত উপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়ে বহু ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। একদিকে ছিল অভ্যন্তরীণ আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার বাস্তবতা আর অন্যদিকে ছিল আন্তর্জাতিক শক্তি ও প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন বিদেশনীতি গড়ে তোলার দায়। এই পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত— দুই মহাশক্তির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল মধুর, যদিও ভারতের বিদেশনীতির নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবকে কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক অস্বীকার করবেন না। পশ্চিমি বিশ্লেষকদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এই পর্যায়ে ভারতের কূটনীতিকে যেমন একদিকে আদর্শবাদী বলেই মনে করেন, তবে কারও কারও মতে, এটি ছিল দ্বি-চারী অবস্থান। এই পর্যায়ে ভারত আরও একটি সদ্য স্বাধীন বৃহৎ রাষ্ট্রের (চীন) সঙ্গে যেন সীমান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তেমনই তারই অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গেও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতের শাসক শ্রেণি এই সময় ব্রিটিশ রাজের অংশ হিসেবে নিজেদেরকে দেখতেন এবং ফলত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে এক ধরনের সম্প্রসারণশীল মনোভাবই তাদের পরিচালিত করেছে।

অবস্থা বদলাল ৮০-র দশকের পরবর্তী ভাগ থেকে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-মুক্ত বাণিজ্য ও Structural Adjustment Programme (কাঠামোগত সংস্কার)-এর মধ্যে দিয়ে যে নতুন দুনিয়ার বীজবপন করা হল, তার ফলশ্রুতিতে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অবস্থান পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি এবং Balance of Payment-এর সংকট একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও পশ্চিমি শক্তি জোটের প্রতি যেমন ভারতকে নির্ভরশীল করে তোলে, তেমনই বিদেশনীতিতে পরিবর্তন আনে। এই পর্যায় থেকেই প্রতিবেশী সম্পর্কিত ভারতীয় কূটনৈতিক আমলাদের ভাবনায় কিছু নীতিগত পরিবর্তন আসতে থাকে। বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটটি ঠিক এখানেই লুকিয়ে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের বিবর্তনের বিগত ৪০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করাই বর্তমান গবেষকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

যে ধর্মীয় পরিচিতির উপর ভিত্তি করে ও দ্বি-জাতি তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে পাকিস্তার রাষ্ট্রের জন্ম হল, তার স্বপ্ন ভঙ্গ হল অচিরেই। যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগণ প্রথম থেকেই স্থির করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমের নিছক উপনিবেশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে তারা অস্বীকৃত হন। ফলত পূর্বের বাঙালি মুসলমানের কাছে দুটি রাস্তাই খোলা থাকল। মুজিবর রহমান এ কথাই স্পষ্টভাবে বলেছিলেন— 'হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু।' স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ও তার ভিত্তি হিসেবে ভাষা আন্দোলন গোটা বিশ্বে গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে এবং ভারতের জনগণের কাছে এক আলোকবর্তিকা হিসেবে হাজির হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সদ্যস্বাধীন

বাংলাদেশ যেমন সমানাধিকারের ধারণাকে মূর্ত করে তুলবে, এক বৈষম্যমুক্ত সমান নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাবে, তেমনই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতিফলন ঘটবে, যদিও তা হয়নি। অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই সকল রাজনৈতিক আদর্শকে যতটা না ভাবাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি নিয়েছিলেন নিজস্ব স্বার্থপূরণের উপায় হিসেবে। এই স্বার্থের প্রতিফলন দেখা গেল পরবর্তীকালে বাংলাদেশের কূটনীতি ও বিদেশনীতিতে। মুজিবরের সময়েই সমাজের মুসলিমিকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল— আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামিক বিশ্ব ও ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অনুদান ও ঋণের ছত্রছায়ায় যে বন্ধন তৈরি হয়, তা পূর্ববর্তী অবসানের বিপরীত বলেই অনেকে মনে করেন।

বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতা এক সুউচ্চ মাত্রায় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সহযোগী ভারত কীভাবে বাংলাদেশি জনগণের মনে এই বিরূপতার আসনে অধীষ্ঠ হল তার পর্যালোচনা করা আজ এক গুরুত্বপূর্ণ দায় হিসেবে হাজির হয়েছে। কূটনৈতিক ও বিদেশনীতির পরিবর্তন সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই পরিবর্তনের চালচিত্রকে উপলব্ধি করা ও দুই দেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যে যে বাস্তব বাধা রয়েছে তা নির্মোহভাবে আবিষ্কার করা বর্তমান গবেষকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নিবন্ধ পর্যালোচনা

(Literature Review)

B.K. Jahagir-এর*Nationalism, Fundamentalism and Democracy in Bangladesh*। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনকে বোঝার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানী জাহাঙ্গির তাঁর গ্রন্থে মূলত উল্লেখযোগ্য তিনটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে নিজস্ব যুক্তিক্রম সাজিয়েছেন। এরা হলেন শেখ মুজিব, জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ। একদিকে শেখ মুজিবর রহমান যেমন তার জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করেছেন, অন্যদিকে বাকি দুইজন তাদের জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সম্পৃক্ত করেছেন সামরিক বাহিনীর উত্থানের সঙ্গে। এই দুই চিন্তার সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ও গণতন্ত্র একদিকে কতটা বিকশিত হয়েছে এবং অন্যদিকে কতটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে গণতান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ায়, জাহাঙ্গীর তা দেখিয়েছেন নির্মোহ ভঙ্গিতে। বর্তমান গবেষকের গবেষণা কার্যে বহু চিন্তার রসদ জুগিয়েছে এই অমূল্য গ্রন্থটি

Sanjoy Hazarika-র*Strangers of the Mist* অপর একটি উল্লেখযোগ গ্রন্থ। বর্তমান গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের বিবর্তন। যেহেতু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এক দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে এবং Look East Policy-র কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারত রাষ্ট্রের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেই উত্তর-পূর্বের সমস্যা সংকট জাতি দ্বন্দ্ব অনুপ্রবেশের প্রশ্ন ও সাম্প্রতিক কালে নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে যে বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার উৎস ও সূত্রকে উপলব্ধি করতে প্রভূত সাহায্য করেছে এই গ্রন্থটি।

Hasan Zaheer-এর The Separation of East Pakistan (The Rise of Realization of Bengali Muslim Nationalism) গ্রন্থটি সাহায্য করেছে বাঙালি মুসলিমের মন ও তার আত্মপরিচয়কে উপলব্ধি করতে। বিশেষত ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যায় পর্যন্ত যে বাঙালি মুসলিম তার আত্মপরিচয়ের সংকটের কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করল, সেই একই পরিচিতি সত্তার অসমাধানযোগ্য সংকটের কারণে আবার একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের জন্য মরনপণ লড়াই করতে হল। সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ আলেখ্যকে জাহির তুলে ধরেছেন তার নির্মোহ ভঙ্গিতে। বর্তমান ভারত-বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে উপলব্ধি করতে গবেষককে যেহেতু বার বার আশ্রয় নিয়ে হয়েছে উৎসমুখের ইতিহাসে, সেই ইতিহাস ব্যাখ্যায় এটি একটি অনন্য দলিল।

David M. Malone, C. Raja Mohan এবং Srinath Raghavan-এর সম্পাদিত *Indian Foreign Policy* গ্রন্থটি দক্ষিণ এশিয়ার বিগত ৭০ বছরের ভারতের বিদেশনীতির বিবর্তন উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দ্বিমেরু বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র তার নিজস্ব বিদেশ নীতি তৈরি করার ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে এবং কীভাবে তার মোকাবিলা

করেছে, তা বুঝতে এই গ্রন্থটি অনন্য। একইসঙ্গে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে কী কী বাধাবিপত্তি থেকেছে, তার অনুপুঙ্খ সংকলন রয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

Mukley R. Osmany, Muzaffer Ahmed-এর সম্পাদিত *Security in the Twenty First Century (A Bangladesh Perspective)* গ্রন্থটি একদিকে যেমন প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ধারণার বিবর্তন কীভাবে আবর্তিত হয়েছে তার ইতিহাসকে তুলে ধরেছে, তেমনই বর্তমান সময়ে এই নিরাপত্তার ধারণা ভূ-রাজনৈতিক জটিলতার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কী চেহারা নিয়েছে, তাও দেখিয়েছে তার নিজস্ব শৈলী ও কায়দায়। বর্তমান গবেষণায় এই গ্রন্থটি প্রভূত সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন বদরুদ্দিন উমর। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে সামরিক শাসনের পর্যায়কাল পেরিয়ে বিগত ৫০ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসকে তিনি একদিকে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, তেমনই এই জটিল ও মূল্যবান সময়কে ধারাবাহিকভাবে উন্মোচন করেছেন তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের ইতিহাসকে বুঝতে ও একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি কীভাবে নিজের শিকড় বিস্তার করল, তার ভিত্তিকে উপলব্ধি করতে অমূল্য সহযোগিতা জুগিয়েছে বদরুদ্দিন উমরের প্রবন্ধ সংকলন ও অন্যান্য লেখা।

২০০৪ সালে প্রকাশিত Sreeradha Datta-র *A Fragile Democracy* গ্রন্থটি বর্তমান গবেষণা কার্যে বিভিন্ন সময় সহায়তা করেছে। বাংলাদেশের উপর শ্রীরাধা দত্ত তার বহু মূল্যবান কাজ করেছেন। অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝতে চেয়েছেন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাসকে। দক্ষিণ এশিয়ার মতো একটি জটিল কেন্দ্রবিন্দুতে দুই মহাশক্তিধর সামরিক বাহিনীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে আরও মজবুত করে তুলবে, না ক্ষণভঙ্গুর হয়ে উঠবে গণতান্ত্রিক কাঠামো, তা বোঝার জন্য শ্রীরাধা দত্ত-র এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য রসদ।

২০১৩ সালে প্রকাশিত S.M. Uddin-এর *Constructing Bangladesh: Religion, Ethnicity and Language in an Islamic Nation* একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যা বর্তমান গবেষণায় অমূল্য সহযোগিতা করছে। যদিও ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম, সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্র তাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সমস্ত সংখ্যালঘু ভাষাগত মানুষের ভাষিক পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রাখার। এই প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে গিয়ে কীভাবে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সত্তার অধীনে এক সমসত্ত্ববিশিষ্ট কাঠামো হয়ে উঠল, তার নিদর্শন রয়েছে এই গ্রন্থে, যা গবেষণা কার্যে সহায়তা করেছে।

নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *Rivers of the Ganga-Brahmaputra-Meghna Delta*। তিস্তাকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে গবেষকের বর্তমান কাজে।

S. Narayan এবং Sreeradha Dutta-র দ্বারা সম্পাদিত *Bangladesh at 50: Development & Challenges* গ্রন্থটি দুই দেশের সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

D.N. Bezboruah-এর *Illegal Migration from Bangladesh* গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। নাগরিকত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, তা বোঝার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

ধর্মীয় মৌলবাদের স্বরূপ ও তার প্রকৃতি বুঝতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে P.B. Choudhury-র *A Comparative Study of Communalism in Bangladesh & India* গ্রন্থটি। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম ও হিন্দু মৌলবাদের বিস্তার ও তার প্রভাবকে উপলব্ধি করতে এই রচনা বর্তমান গবেষণায় ভূয়সী সহযোগিতা করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে ২০১০ সালে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের মধ্যে দিয়ে পুরোনো সমস্যার সমাধান এবং নতুন করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য দুই দেশ প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ট্রানজিট, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যার সমাধান, তিস্তা জলবণ্টন চুক্তির দ্রুত সমাধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কবিগুরু রবি ঠাকুরের ১৫০তম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুই দেশের যৌথ উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনাকারীদের আশ্রয় না দেবার বিষয়টি স্পষ্ট করেন শেখ হাসিনা। সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ, মাদকচক্রকে নির্মূল করার জন্য দুই দেশের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান এবং গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের প্রচেষ্টা করা হয়। দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। এই অঙ্গীকারগুলি বাস্তবায়িত করে জনগণের কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়াই দু-দেশের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে লেখিকা মনে করেন। (Sreeradha Datta, *India and Bangladesh: The Road Towards Common Peace and Prosperity, Strategic Analysis*, Vol. 34, No. May 2010.)

Jalal Alamgir ও Bina D'costa লিখিত 'The 1971 Genocide: War Crimes and Political Crimes', *Economic and Politcial Weekly*, Vol. XIVI, No. 13, March 2011 পত্রে ১৯৭১ সালে যে গণহত্যা পূর্ব-পাকিস্তানে আয়োজিত হয়েছিল তার নায়কদের কী কারণে বিচার প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে আনা সম্ভব হয়নি, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকের মতে, এর মধ্যে আঞ্চলিক ক্ষমতার রাজনীতি, স্বাধীনত্তোর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলোযোগ এর জন্য দায়ী। বর্তমানে যে আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আছে, তাদের অন্যতম নির্বাচনের ইস্যু ছিল যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদান। আর সেই কারণে বর্তমান সরকার মূলত জামায়াতে ইসলামের সদস্য ও নেতাদের দ্বারা আয়োজিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া চালু করেছে। লেখকদ্বয় মনে করেন, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন। লেখকদের আলোচনাপত্র অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কারণ তাঁরা শুধুমাত্র জামাত নেতাদের কথা

বলেছেন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। কিন্তু বাস্তবে জামাতের শীর্ষ নেতারা যেমন ছিল, সঙ্গে বিএনপি-র নেত্রীর ঘনিষ্ঠ নেতারাও ছিল। কথিত যে, গ্রামগঞ্জে অনেক রাজাকাররাও বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ দলের সদস্যও বটে।

Anil Kamboj তাঁর 'Indo-Bangladesh Relations Changing Politics', *World Focus*, November-December 2009 নিবন্ধে বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশকে তার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো মজবুত করার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও প্রাপ্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমেই দুই দেশের বিদ্যমান সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন।

Mizanur Rahaman Shelly তাঁর 'Modi's visit to Bangladesh and South Asian Perspectives', *South Asia Journal*, Fall 2015 পত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছোনোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুই দিনের বাংলাদেশ সফর ছিল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার প্রথম বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে দুই দেশের পুরোনো দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলির সমাধান এবং নতুন করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল। লেখক ব্যক্ত করেছেন, ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ২০১১ সালের বাংলাদেশ সফর যেখানে শেষ হয়েছিল, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর সেই অসমাপ্ত জায়গা থেকে শুরু। দীর্ঘদিনের বিতর্কিত জমিবণ্টন চুক্তি, অমীমাংসিত তিস্তা ও ফেণী জলবণ্টন চুক্তি সহ ৫৪টি নদীর জলবণ্টনের বিষয়, ব্যবসা-বাণিজ্যিক চুক্তি ও ট্রানজিট চুক্তির মতো বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদির এই বিদেশ সফরে দীর্ঘদিনের জমি বণ্টন চুক্তির সুষ্ঠ সমাধান সম্ভব হয়, কিন্তু তিস্তার জলবণ্টন চুক্তির সমাধান সম্ভবপর হয়নি। ২৫টি বাংলাদেশী পণ্য বিনা শুল্কে ভারতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে, বাংলাদেশের রামপালে 1320 MW-এর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা লাভ করে, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ভারত বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২ বিলিয়ন মার্কিন মুদ্রা অর্থসাহায্য লাভের কথা ঘোষণা করা হয়। পারস্পরিক নিরাপত্তামূলক সহযোগিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাল মুদ্রার চোরাচালান বন্ধ সহ মানব পাচার (Human trafficking)-এর মতো বিষয় বন্ধ করার ক্ষেত্রে এই দেশ এগিয়ে এসেছে। Act East Policy সফল করতে গেলে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এই পত্রে স্পষ্ট উত্থাপন করা হয়, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুটি বাস পরিষেবারও সূচনা করা হয়।

অমীমাংসিত বিষয়গুলির দ্রুত সমাধান করে নাগরিকদের কাছে তার সুফল পৌঁছোনো দুই দেশের আশু লক্ষ্য বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

K.A.S. Murshid তাঁর 'Transit and Trans-shipment: Strategic consideration for Bangladesh and India', *Economic and Political Weekly*, Vol. XLV, No. 17, April 2010 নিবন্ধে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ট্রানজিট সংক্রান্ত বাণিজ্য ও পরিবহন চুক্তিকে তার লেখার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই চুক্তির ফলে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হবে। লেখক মনে করেন, এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে নানা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক উন্নয়নের বিষয় যুক্ত রয়েছে। তার মতে, বাংলাদেশের কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই ট্রানজিটের মাধ্যমে নিজের কৌশলগত স্বার্থকে সংরক্ষণ করা। এছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি কিছু অসমাপ্ত বিষয় বিরাজমান বলে জানিয়েছেন।

গবেষণা প্রকল্প

(Hypothesis)

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে প্রতিটি রাষ্ট্র একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। যার ফলে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিকর স্তরে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে সাদৃশ্য বিদ্যামন। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে প্রায় ৪০৯৬ কিলোমিটার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত, যার মধ্যে ভারতের বেশিরভাগ উত্তরের সীমানা অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র, যার তিনদিকেই ভারতের রাজ্যগুলির সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। আবার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এক বহুল অংশ ভারতীয় রাষ্ট্র দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে, বাংলাদেশ নিজেকে ভারত দ্বারা আবৃত (India locked) রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করে থাকে।

ভূকৌশলগত ও ভূরাজনৈতিক এই গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের বিদেশনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষত বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে ও সমস্যার সমাধান করছে তার আবিষ্কার পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্রগুলির সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বলা যায়, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে ভারতের বিদেশনীতিতে পরিবর্তন আসে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে এর ফলে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান মজবুত হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে মসৃণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, এমনটি নয়। ক্রমবর্ধমান চৈনিক প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করবে বাংলাদেশ, ভারতের উপগ্রহ রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখবে, না আঞ্চলিক শক্তিজোট গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সামনে আনবে তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

নদীমাতৃক উপমহাদেশে বৃহৎ নদীগুলি কোনো জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা মেনে চলার পরোয়া করেনি। নদীকে কেন্দ্র করে জীবন, সভ্যতা ও অর্থনীতির এক বড়ো অংশ যেহেতু নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলত নদীর জলের বণ্টন ও নদীকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের ব্যবহার সুষম হওয়া প্রয়োজন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বার বার অভিযোগ তুলেছে ভারতের বিরুদ্ধে নদীর জলবণ্টন সংক্রান্ত সরকারি নীতি নিয়ে। আজও বাস্তবায়িত হয়নি তিস্তা চুক্তি। এই চুক্তির উৎস-ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাই নির্দিষ্ট পর্যালোচনা জরুরি।

বাণিজ্য ও অর্থনীতি দুটি দেশের সম্পর্কের বিকাশে জীবনদায়ী হিসেবে কাজ করতে পারে। বাণিজ্যের বিকাশ, জাতীয় আয়বৃদ্ধি, গড় আয় ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অনেকটাই নিশ্চিত করতে পারে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।

একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেণ উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিকাশেরও প্রভূত সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিবিধ সমস্যা। যেকোনো গবেষণা কাজে লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সমস্যাকে সঠিকভাবে তুলে ধরা ও তার সমাধানে দিক নির্দেশ করা।

একদিকে বিশ্বায়নের নামে যেমন মুক্তবাণিজ্যের সম্ভাবনা বাড়ছে, তেমনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সংরক্ষণবাদী রাজনীতি। এবং একইসঙ্গে মজবুত সীমান্ত না থাকার কারণে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে, যার বাস্তবসম্মত সমাধান প্রয়োজন। ফেলানির ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, অনুপ্রবেশের প্রশ্নটির শিকড় রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যেই। এই শিকড়কে উপড়ে ফেলে দুটি দেশ পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধনকে কীভাবে মজবুত করতে পারে, তা আবিষ্কারের দাবি রাখে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন আজকের পৃথিবীতে একটি জটিল প্রশ্ন। একইসঙ্গে বাংলাদেশে মাথা চাড়া দিয়ে যেমন ইসলামীয় মৌলবাদ উঠছে, তেমনই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে শক্তিশালী হয়ে উঠছে হিন্দু মৌলবাদী শক্তিগুলি। ভারতে সামরিক আক্রমণ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী ও এজেন্সিগুলি যেহেতু বাংলাদেশি গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করে, ফলত এই প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের সদর্থক ভূমিকা ছাড়া ভারতের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। দুই দেশের সম্পর্কে আস্থা, বিশ্বাস ও পারস্পরিক সংবেদনশীলতার পরিবেশ তৈরি হলে এবং তার ভিত্তিতে তথ্যের সুনির্দিষ্ট আদানপ্রদান ঘটলে, তবেই এই ধরনের হামলাকে রোখা সম্ভব। যে বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে আলোচনার দাবি রাখে।

একসময় বাংলাদেশের উদ্যোগে সার্ক গঠিত হয়েছিল। আঞ্চলিক শক্তি জোট গড়ে তোলার এই ভাবনা— বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল যথেষ্ট বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে আঞ্চলিক স্তরে আরও বহুমুখী উদ্যোগ তৈরি হয়েছে। যার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সকল শক্তিজোটের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা তাই জরুরি।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য নিবন্ধনে উপস্থিত হয়েছে আরও বহুবিধ বিষয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলি যার জন্য অবশ্যপাঠ্য।

গবেষণা পদ্ধতি প্রকরণ

(Research Methodology)

নিরাপত্তাসংক্রান্ত রণনৈতিক প্রশ্নটি যেহেতু সুদীর্ঘকাল ধরে আলোচনার বিষয়, তাই একে পর্যালোচনার জন্য এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বোঝা জরুরি। যেমন বর্তমান গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আমাকে বার বার আশ্রয় নিতে হয়েছে— ভারত ও বাংলাদেশের জাতি গঠনের কাঠামোগত সমস্যাটির প্রতি। একুশ শতকে রাজনৈতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা আরও বহুবিধ প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, বাণিজ্য, আঞ্চলিক জোটগঠন ইত্যাদি। একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে কীভাবে নিরাপত্তার মূল কাঠামোটিকে অক্ষত রাখা যায় তা উপলব্ধি করতে হয়েছে।

একমেরু বিশ্বের সূচনায় ৯০-এর দশকের প্রথম ভাগে ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা ঘোষণা করেছিলেন, ইতিহাসের শেষ বই। বহু রণনৈতিক বিশ্লেষক সেই সময় তার এই কথাকে ধ্রুব সত্য ধরে নিয়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এক সমাপ্তি রেখা ঘোষণা করেছিলেন। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বহুজাতিক ও অধিজাতিক নিয়ন্ত্রিত এই দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট জাতি রাষ্ট্রের অনুগামী থেকেই নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সমাধান করা যাবে। কালক্রমে এই তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় মেরুকরণ যত তীব্র হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে আরও বেশি। একুশ শতকে তৃতীয় পাদে দাঁড়িয়ে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ঘনীভূত হচ্ছে, তখন আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নটি আরও বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলি আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে যদি ভারত রাষ্ট্রকে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে হয়, বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে দর কষাকষির ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি করতে হয়, তবে নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাকে যেমন অর্জন করতে হবে, তেমনই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে বিশেষ সুবিধা ও ছাড়ও দিতে হবে নিজস্ব নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে। বাংলাদশের দিক থেকে দেখলে একদম সীমান্ত সন্নিকটে যখন দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে, তখন এই দুই বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ভারসাম্যের খেলায় তাকে যোগ্যতার মাত্রা অর্জন করতে হবে এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের থেকে এগিয়ে থাকতে হবে আরও বেশি সুবিধা ও ছাড়ের অংশীদারিত্ব অর্জনে।

আলোচ্য গবেষণায় মূলত অপ্রত্যক্ষ উৎস ও অবদানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আলোচনা এসেছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, রণনৈতিক নিরাপত্তা, সামরিক রণনীতি, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত নীতি সহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচনায় আছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সার্বিক সংকটের ক্ষেত্রটি। আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে একটি রণনৈতিক নীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা আলোচিত হয়েছে নির্মোহ ভঙ্গিতে। একটি

অ-ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে আলোচনা করার ফলে অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে সমসাময়িক বাস্তবতা।

Qualitative Research-এর মাধ্যমে আমার গবেষণা পত্রটি আলোচনা করা হয়েছে। Fieldwork, Interview এবং Secondary Information-এর মাধ্যমে যে data পাওয়া গেছে তার গুণগত মান বিশ্লেষণ করে Hypothesis-কে প্রমাণ করাই লক্ষ্য হিসেবে থেকেছে।

গবেষকের আলোচ্য ক্ষেত্র হিসেবে থেকেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাগুলি। এই সকল এলাকায় প্রশ্নপত্র, ফিল্ডওয়ার্ক, ইন্টারভিউ, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকে ব্যবহার করেই গবেষণা বস্তুনিষ্ঠ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা, যে নিরাপত্তার প্রশ্ন দুই দেশের সুস্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড়ো বাধা, তা বার বার উঠে এসেছে এই গবেষণায়। একে সঠিকভাবে বুঝতে বর্তমান গবেষককে যেমন যেতে হয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজারর রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিতে, তেমনই যেতে হয়েছে সীমান্ত লাগোয়া ছিলমহলগুলিতে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার মূল সূত্রগুলিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সম্পর্কিত video নথি গবেষণা পত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত করা থাকল।

যদিও গবেষণা কার্যটির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এমনও ক্ষেত্র রয়েছে এই বিষয়ে, যেখান থেকে প্রত্যক্ষ উপাদান ও উৎস সংগ্রহ করা সম্ভব হলে এই সংক্রান্ত গবেষণা আরও বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে। নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের অভিজ্ঞতার সার সংকলনও অপ্রতুল। এই বিষয়ে অন্যতম উৎস সাংবাদিকদের নিজস্ব রিপোর্ট ও তথ্য, যা বহু ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট। সতর্কতার সঙ্গে তাই সেইগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। আশা রাখি, আগামী দিনে যত বেশি সম্ভব গবেষক এই দুই দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে গবেষণা কাজে প্রবৃত্ত হবেন। একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা নিশ্চিতভাবে এগোতে পারব।

গবেষণা সম্বন্ধীয় সম্ভাব্য প্রশ্ন

(Research Questions)

১) দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতি ও আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে?

২) দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে কী কী বাধা রয়েছে ও তা কীভাবে দূরীভূত করা সম্ভব?

৩) তিস্তা সহ নদীর জল সুষম উপায়ে বণ্টনের ক্ষেত্রে যে যে কায়েমি স্বার্থ রায়েছে, আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব কি না?

৪) বাংলাদেশের মাটিতে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ রোধ করার প্রক্রিয়া কীভাবে করা যেতে পারে?

৫) অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন, যা দুই দেশের সম্পর্কে এক বড়ো প্রতিবন্ধকতা, তার সুস্থায়ী সমাধান কীভাবে সম্ভব?

৬) দ্বিপাক্ষিক স্তরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে কী কী যৌথ কাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে?

৭) আঞ্চলিক স্তরে রাষ্ট্রীয় শক্তিজোট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্র কীভাবে ভূমিকা নিতে পারে?

৮) Look East Policy-র ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে?

৯) জাতি দ্বন্দ্বে দীর্ণ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সদর্থক ভূমিকা কতটা আশা করা যায়?

১০) বৃহৎ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সমাবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুটি দেশ কীভাবে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সাপেক্ষে বর্তমান গবেষণা কার্যের বিভিন্ন অধ্যায়গুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ও বৈদেশিক নীতির বিবর্তন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

(Evolution of Bangladesh's Foreign Policy and Her Position in South Asia: A Historical Analysis)

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক এক জটিল ও বিমিশ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। মূলগতভাবে এই সকল সমস্যার ধাত্রীভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ ভারতের বিভাজন এবং পরবর্তীকালে অবিভক্ত পাকিস্তানের থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা। নির্মোহ দৃষ্টিতে যদি অতীতের দিকে তাকাই, তবে নিঃসন্দেহে মনে হয় রাষ্ট্র পরিচালক ও সিদ্ধান্ত প্রণেতারা যদি আরও অনেক বেশি সহনশীল ভূমিকা নিতে পারতেন, তবে হয়তো ইতিহাস অন্যরকমের হত।

বিভাজনের সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছিলেন, তারা বোধহয় এটা ভেবেও দেখেননি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলিমকে দুটি পৃথক জাতিতে বিভক্ত করে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত প্রকৃত অর্থে দাঁড়ায় প্রত্যেকটি গ্রাম শহর সহ লক্ষ লক্ষ জনপদে কোটি কোটি মানুষকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে শিকড়চ্যুত করে নিজ নিজ রাষ্ট্র বেছে নেবার কথা বলা এবং যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে এক দীর্ঘস্থায়ী চেহারা দেওয়া। ১৯৪০ সালে B.R. Ambedkar তাঁর *Pakistan or The Partition of India* গ্রন্থে এই সম্ভাবনার কথাই আশঙ্কা করেছিলেন। যদিও বাস্তববাদী জিন্না ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বরের অনেক আগেই এর সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। ১৫ নভেম্বর ১৯৪৬-এ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালির দাঙ্গার পর তিনি হিন্দুদের সেই এলাকা থেকে উচ্ছেদের পক্ষে রায় দেন এবং স্পষ্টভাবে বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে নাগরিক বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মুসলিম লিগের অন্যতম নেতা Raja Ghaznafar Ali Khan-ও মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য নাগরিক বিনিময়কে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং মূলত গান্ধী-নেহেরু বিভাজনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে নাগরিক বিনিময়কে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে দেখেনি এবং সেই অনুসারে জনমানসে তাদের ভাবনার কোনো প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়নি। এমনকী ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর অব্যবহিত আগে ও পরে গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত তীব্র রূপ নিলেও তারা পাকিস্তানের অমুসলিম জনগণকে নিজেদের ঐতিহ্যশালী ভূমিতে

থেকে যাবার জন্য তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। একদিক থেকে এটা অনেকটাই রাজনৈতিক অসততার পর্যায়ে পড়ে, কেননা তাদের মতো যারা হিন্দু ভারতে নিরাপত্তা ভোগ করছিলেন, তারাই নিরাপত্তাহীন হিন্দুদের অন্য দেশে থেকে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভারতের চলে আসা ২১ শতকের এই পর্যায়েও বহমান ও ক্রমবর্ধমান। নিঃসন্দেহে বলা যায় দূরদর্শী জিন্নার মতামত অনুসারে সে সময় জাতীয় কংগ্রেস যদি এই বিনিময় প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিত, তবে মানবসম্পদের এক অবর্ণনীয় অপচয় ও নিদারুণ যন্ত্রণা এড়ানো সম্ভব হত। দুই পক্ষের রাজনীতিবিদরা দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর ও শাসন পরিচালনার প্রতি এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, এই বিষয় তাদের অগ্রাধিকার তালিকাতেও ছিল না।

১৯৭১ সালে ভারতরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয় এবং ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ গণহত্যার পর সরাসরি সামরিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মূলত ভারতীয় সহযোগিতার কারণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সে সময় মনে করেছিলেন, নবগঠিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থান সুরক্ষিত হবে। যদিও পরবর্তীকালে এই ভাবনা সম্পূর্ণ রূপে ভুল পরিগণিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসে এবং বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি ক্ষমতার দখল নেয়। এই সময় থেকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত সামরিক শাসকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ শাসন করে এবং এই পর্যায়ে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি অপসৃত হয়। মুনতাসির মামুন বাংলাদেশের সুবিখ্যাত লেখক এক জায়গায় বলেছেন, বাংলাদেশ হল সেই বিরলতম দেশ, যেখানে একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বী ও বিরোধীদের সহাবস্থান দেখা যায়, যেখানে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ্যে প্রকাশিত হয় এবং যেখানে স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলিকে প্রকাশ্যে এবং ধারাবাহিকভাবে অপদস্থ করে।

এর অর্থ এটা নয়, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকেনি। বরং তার মাত্রাগত তারতম্য ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, নয়াদিল্লির শাসকরা এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রশ্নে তার প্রতিবেশীর উপর খুব যে কার্যকরী চাপ তৈরি করতে পেরেছে এমন নয়, বরং সীমান্তের ওপারে তাদের অসহায়ত্বের নীরব দর্শক হিসেবে থেকেছে। ১৯৪৭-এর বিভাজনের দিনগুলিতে জাতীয় নেতৃত্ব অ-মুসলিমদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে তাদের যন্ত্রণা লাঘব করার নৈতিক এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল। ভারতরাষ্ট্র এই প্রশ্নে তার কোনো ভূমিকাই সার্বিকভাবে পালন করেনি। বলাই বাহুল্য, ভারতের বৈদেশিক নীতিও এই অনৈতিক উদাসীন অবস্থানের থেকে আলাদা কিছু ছিল না।

এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গণহত্যার কথা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই হত্যার পরিকল্পনা ছিল সরকারি মদতপুষ্ট। কেন্দ্রীয় মুখ্যসচিব আজিজ আহমদ এই হত্যা পরিকল্পনার নীল নকশা তৈরি করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেডিও পাকিস্তান সরাসরি হিন্দুদের বিরুদ্ধে

জাগ্রত মুসলিম জনসাধারণকে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানায়। ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা কাজ বন্ধ রাখে এবং ভিক্টোরিয়া পার্কে জমায়েত করে। গোটা সমাবেশ ছিল হিন্দুবিরোধী স্লোগানে মুখর। সভা শেষ হবার অনতিবিলম্বে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় এবং বিদ্যুৎগতিতে তা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সবথেকে আক্রান্ত এলাকাগুলির মধ্যে ঢাকা ছাড়াও ছিল সিলেট, চট্টগ্রাম ও বরিশাল। এই সমস্ত এলাকায় সরকারি মদতপুষ্ট উন্মত্ত ও হিংস্র জনতা অকল্পনীয় হিংসা দেখায় ও বহু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। পুলিশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে নীরব দর্শক ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যার সহযোগী। কোনো কোনো এলাকায় প্রকাশ্যে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব বলছে, পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ ছিল হিন্দু এবং ঢাকা শহরের মোট সম্পত্তির ৮৫ শতাংশ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৫০ সালের হলোকাস্টের পর হিন্দুদের সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয় ১২.৭ শতাংশ। ১৯৫০ সালের আগে স্কুলে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০০, তা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে কমে দাঁড়ায় ১৪০ জনে। ১০ ফেব্রুয়ারি ওই কুখ্যাত দিনে ঢাকার হিন্দু মালিকানাভুক্ত প্রায় ৯০ শতাংশ দোকান লুঠ করা হয় ও আগুন লাগানো হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বাড়ি ধ্বংস করা হয় ওই একই দিনে এবং মৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯-এর ডিসেম্বর থেকে হিন্দুদের ওপর ছোটো ছোটো আক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে বাধ্যতামূলকভাবে ভারতবর্ষে চলে আসার ঘটনা ঘটতে থাকে। যা পরবর্তী সময়ে বলা যায় একদিনের জন্যও থামেনি। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে এই ঘটনাগুলি অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষ ও তার ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা কী ছিল? পাকিস্তানকে তোষণ করা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বিপুল জনস্রোতের দায়িত্ব এড়ানো এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবিরোধী পাক প্রচারকে মোকাবিলা করতে না পারা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা *অমৃতবাজার পত্রিকা*য় ১৯৫০ সালের ১৮ মার্চ জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আচার্য J.B. Kripalni 'Writing on the Wall' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখেছেন, ''While we admit what happens here and minimize the atrocities in Pakistan, the latter denies what happens there once exaggerates the happenings in India. If there are 10 deaths the figure broadcast throughout the world is 10,000 ... On the other hand, every communal action of barbarity perpetrated on the Hindu minority in Pakistan is here [in India] sought to be either hushed up or minimized. Ours is a secular state with vengenance, in a much as it allows a fanatical religious state on its borders to play on the feelings of its population, while we in India cannot afford to give the barest facts for fear of possible communal repercussions.''

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুমেয় পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু নিধনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান কী ছিল। নেহরু অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছিলেন সামান্য। যদিও এই পর্যায়ে তিনি অনেকবার

পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু তার পরও তার লেখায় ও বক্তব্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের অসহায়তার তুলনায় মুসলিম অনুপ্রেবেশের বিপদকেই বড়ো করে দেখানোর প্রয়াসকে লক্ষ করা যায়। সংসদেও এই পর্যায়ে নেহেরুর বক্তব্য ছিল অস্পষ্ট ও অগভীর, কারণ তিনি জানিয়েছিলেন যে এমন কোনো জাদুদণ্ড তার হাতে নেই যার মাধ্যমে তিনি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বরং এই বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। যদিও তিনি জানতেন যে, এই সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের মাধ্যমে সৃষ্ট, কিন্তু তার পরও এই বক্তব্য নিছক আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু না। কংগ্রেস নেতৃত্ব সমস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সংকটজনক মুহূর্তে প্রত্যেক সচেতন মানুষের উচিত নেহেরুর চিন্তা ও রাজনৈতিক লাইনের পক্ষে দাঁড়ানো, যদিও বাস্তব সত্য হল— এই প্রশ্নে তার কোনো লাইনই ছিল না।

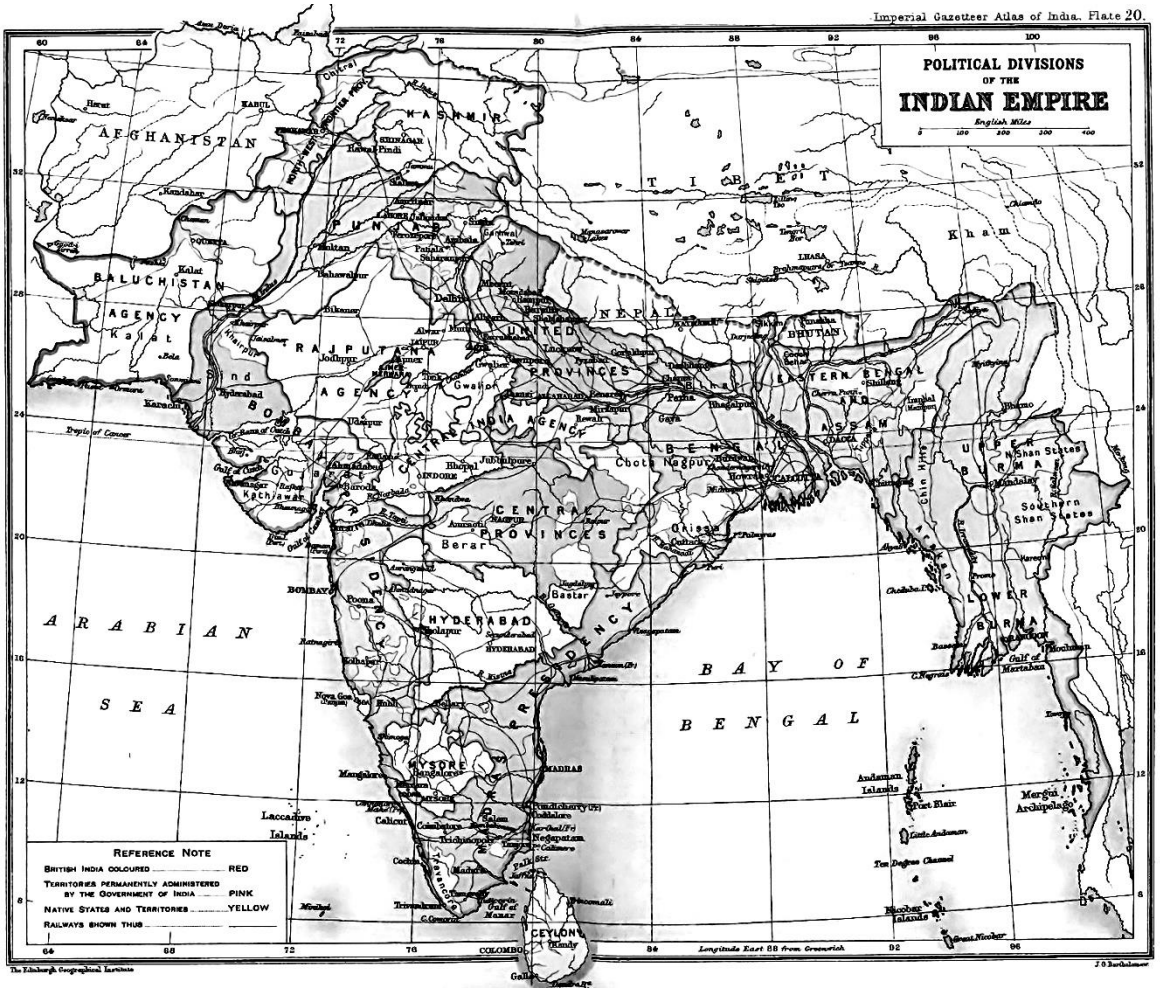

১৯৪৭-পূর্ববর্তী ভারত

এই পর্যায়ে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদিও নেহেরু কূটনৈতিক সমাধান ছাড়া অন্য উপায়ের কথা বলেছিলেন, কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ জনগণের সামনে প্রকাশ্য ভাষণে তিনি সামরিক সমাধানের কথা বলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বাস্তব অবস্থা যদিও ভারতকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। যেমন, পূর্ববঙ্গে কয়লার জোগান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সীমান্ত জুড়ে বেশ কিছু ব্যাটেলিয়নকে নিযুক্ত করা হয়। অপরিণামদর্শিতা ও

অদূরদর্শিতার ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে মোড় ঘোরানোর এক নতুন প্রয়াস শুরু হল নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির মধ্যে দিয়ে।

যদিও বলা হয়, নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি দুই দেশের সংখ্যালঘু অধিকার সুরক্ষিত করার নবগঠিত দুই রাষ্ট্রের প্রথম প্রয়াস, কিন্তু এই ইচ্ছাপত্রের কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। শুধু এই চুক্তি নয়, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল ও ডিসেম্বরে যে Inter Dominion Aggrement গড়ে উঠেছিল দুই রাষ্ট্রের মধ্যে, তা ফলপ্রসূ না হয়ে শরণার্থীর ঢল নেমেছিল ভারতে।

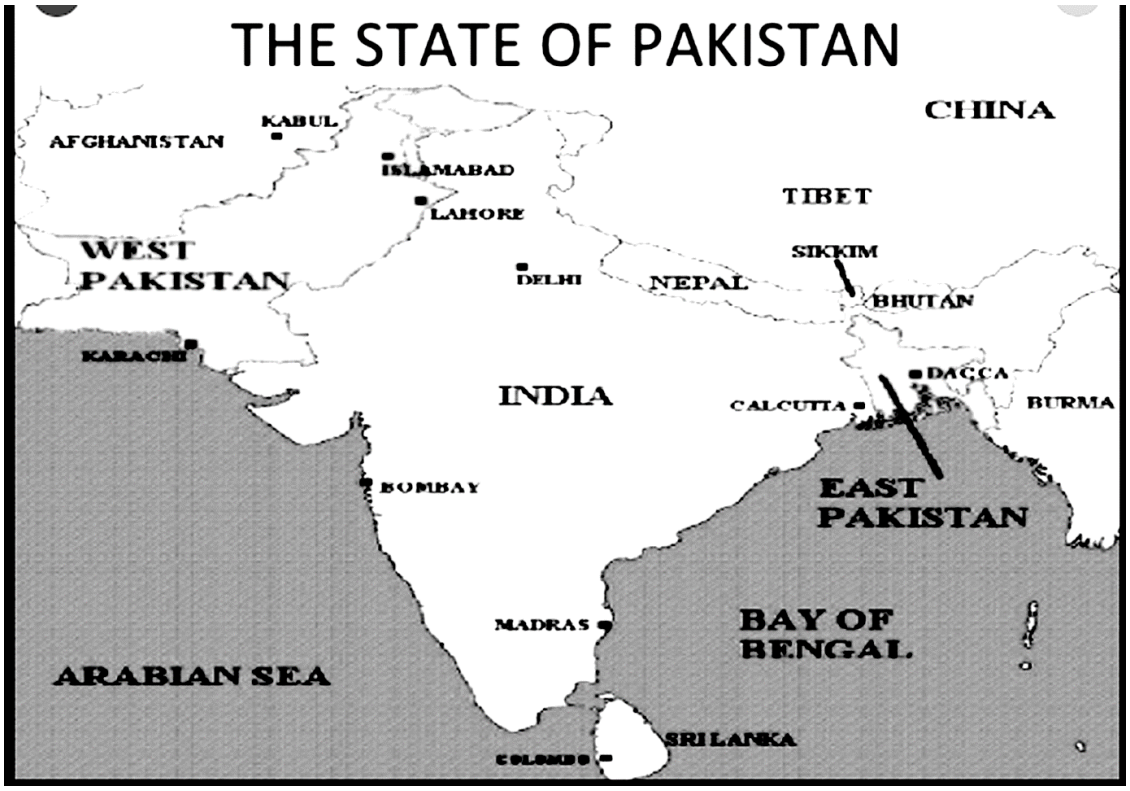

অবিভক্ত পাকিস্তান

এরপরের দফা নিঃসন্দেহে ৬০-এর দশকের মধ্যভাগে জেনারেল আয়ুব খানের সময়কাল, যখন পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলিম জনগণের উপর নির্মম আক্রমণ চালানো হয়। কাশ্মীরের পবিত্র হজরতবাল মসজিদে মোহাম্মদের স্মৃতিবিজড়িত বস্তু হরণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। তথ্যপ্রমাণ বলছে, এই আক্রমণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী Khan S.A. Satur সহ আয়ুব খানের গুরুত্বপূর্ণ পার্ষদরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বাগেরহাট-খুলনার একটি জনসভায় মোনেম খানের ভাষণের পর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। খুলনায় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজনা তৈরি হয় কলকাতায়। ১৯৯২ সালে বাবরি মসিজদ ভাঙার ঘটনা বা সাম্প্রতিক অতীতে মুজফফরনগরের হিংসা ভারতে সংগঠিত হবার পর নিদারুণ আক্রমণের ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের

সংখ্যালঘুদের ওপর। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে গেছেদুই দেশেরই সংখ্যালঘুর অবস্থানের প্রশ্নটি।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক বিকাশের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা প্রত্যয়সূচক সম্ভাবনায় রূপায়িত হতে পারেনি। দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে যা ছিল এক নিদারুণ বাস্তবতা। সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ইতি ঘটেছিল প্রাথমিকভাবে ১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতায় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, যদিও এই পর্যায়কে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সাময়িক মধুচন্দ্রিমার পর্যায় বলা হয়, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের ভিত্তি তৈরি করে।

বাঙালি অস্মিতা তার সমানাধিকার দাবি করে উর্দুভাষী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছ থেকে, যার ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ৭০-এর দশকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রের জন্ম। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যালঘু মুসলিম শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের উপর শুধু ভাষাগত আধিপত্য চাপিয়েছিল এমন নয়, প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগের নির্বাচিত হবার অধিকারকেও অস্বীকার করে। ফলে মুক্তিবাহিনী গঠন, ভারতের ভূমিকা, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, যা বহু চর্চিত বিষয়।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৭৫ সালে নিধনের আগে পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। যদিও এর আগে ১৯৭০ সালের অবিভক্ত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন। ফলত এই পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর প্রশ্নটি তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজেও এই পর্যায়ে অবিসংবাদী নেত্রী ছিলেন। তাদের দুজনের যৌথ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে। যদিও এই চুক্তির ভিত্তি ছিল সমমর্যাদা, কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ ও জনমানসে ভারতের ভূমিকা ক্রমশই আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী হিসেবে দেখা হয়। নদীর জল বিভাজন ও তার অংশীদারিত্বকে কেন্দ্র করে যে টানাপোড়েন অবিভক্ত পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের ছিল, বাংলাদেশ দ্রুত তার শরিক হয় এবং ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে মোড় নেয়।

১৯৭৫ সাল থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক ও আধা-সামরিক শাসনকাল চলেছে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ-এর মাধ্যমে। এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল অস্থিতিশীল। কারণ, ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা, '৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া ও তিন বছর বাদে বৃহৎ সাফল্যের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় ফেরত আসা— এই পুরো পর্যায়েই ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণি এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জনতা সরকারের তিন বছরের শাসনকালে (১৯৭৭-১৯৮০) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হয়।

মুজিবর রহমানের মৃত্যু নিঃসন্দেহে এই তৈরি হওয়া মজবুত সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিল এক জোরালো আঘাত। অন্যদিকে জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে সংহত করেন, তাঁর বৈদেশিক নীতি দৃশ্যত ছিল তাঁর পূর্বসূরীর থেকে পৃথক, যা ভারত রাষ্ট্রকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইস্তাম্বুল-এ ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত ফারাক্কা প্রকল্পটি জোরালোভাবে উত্থাপন করে। একই বছর কলম্বোতে অনুষ্ঠিত নির্জোট আন্দোলনের পক্ষে থাকা রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রশ্নটি উত্থাপন করে। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ সভাতেও বিষয়টি তোলে। অর্থাৎ ভারতরাষ্ট্রের যেখানে লক্ষ্য ছিল দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়টি সমাধান করা, সেখানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার প্রেক্ষিতে একে নিয়ে আসে।

স্পষ্টত, এই অবস্থান ছিল ভারতবিরোধী, কেননা ঠান্ডাযুদ্ধ ও ছায়াযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত কখনোই চায়নি দুই দেশের সম্পর্কে কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি।

ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হবার পর যখন মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ১৯৭৭ সালে ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীকালে মোরারজি দেশাই-এর বাংলাদেশ সফরের মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়। ফারাক্কাকে কেন্দ্র করে সাময়িক সমাধান অবশ্যই কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল, কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের আরও অনেকগুলি পর্যায় ছিল, সীমান্ত সমস্যা যার মধ্যে ছিল অন্যতম প্রধান।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। যদিও বিভাজন-পরবর্তীতে এই সীমান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা এখনও রয়ে গেছে। ১৯৭০ থেকে ৮০-র দশকের মধ্যে যে যে জটিলতাগুলি আলোকবৃত্তে উঠে এসেছে, সেগুলি হল— তিন বিঘা করিডর, মুহুরির চর নিয়ে বিতর্ক এবং নিউমূর আইল্যান্ড নিয়ে মতপার্থক্য। ১৯৭৯ সালে BSF ও BDR-এর মধ্যে মুহুরি নদী তীরবর্তী জমিকে কেন্দ্র করে এক সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটে। যদিও ভারতরাষ্ট্র একে তাৎক্ষণিক ও ক্ষুদ্র ঘটনা বলেই মনে করেছিল, কিন্তু জিয়াউর রহমানের সরকার এটিকে একটি প্ররোচনা বলে মনে করে। একই ঘটনা ঘটে পূর্বাশা বান নামে পরিচিত নিউমূর দ্বীপের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ সংলগ্ন দক্ষিণ তালপাটি এলাকায়। হরিভাঙা নদীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা এই দ্বীপখণ্ডের উপর দুই দেশই অধিকার দাবি করে এবং তার স্বপক্ষে নিজস্ব যুক্তি ও প্রমাণ হাজির করে। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনে এই ইস্যু বারংবার উঠে এসেছে।

১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসীন হন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমাবনতি হয়। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যার পর বাংলাদেশ সরকারের মনোভাবেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যদিও তার উত্তরাধিকারী পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ এই সম্পর্ককে কিছুটা পুনঃসংঘটিত করতে আগ্রহী হন। দুই দেশের কূটনীতিবিদদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জেনারেল এরশাদ এক দু-দিন ব্যাপী সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যেকার বিতর্কিত সকল বিষয়ই আলোচ্যসূচিতে আসে এবং তিন বিঘা করিডরের লিজ সংক্রান্ত প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌঁছোনো সম্ভব হয়। যদিও দাবি করা হয় ফারাক্কা ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই সম্মেলন যে মউ চুক্তি স্বাক্ষর করে তা দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করেছিল; কিন্তু বাস্তব সত্য অন্য কথা বলে।

১৯৮৩ সালে সার্ক (SAARC) গঠনের প্রস্তুতিপর্বে যে South Asian Regional Cooperation-এর সম্মেলন হয়, তাতে দুই দেশই অংশগ্রহণ করে এবং সমস্যাগুলি চর্চায় আসে। যদিও এই সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পরে ভারত রাষ্ট্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের রোধ করার জন্য বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই কাঁটাতার ছিল ৩৩০০ কিমি দীর্ঘ, যার মধ্যে একটি বড়ো অংশ ছিল অসম সীমান্তে এবং ধরে

নেওয়া হয়, এই সীমান্তের মাধ্যমে বেআইনি মুসলিম অনুপ্রবেশ বড়ো আকারে সম্ভব। যদিও জেনারেল এরশাদ জোরের সঙ্গে এই অনুপ্রবেশের তত্ত্বকে নাকচ করেন, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাষ্ট্রনায়কই করেছেন, কিন্তু তার পরেও এই 'Infiltration Theory' ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনে স্থায়ী ক্ষত হয়ে আজ পর্যন্ত থেকে গেছে।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর যখন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন তার তারুণ্য, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষিপ্রতা এবং সংগঠন ও প্রশাসনের ওপর অবিসংবাদী নিয়ন্ত্রণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক— দুই স্তরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ফলপ্রসূতে তিনি তার সময়কালে প্রায় ৪৮টি দেশ সফর করেন এবং বলা যায় তার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে গড়ে ওঠে SAARC (সার্ক)। জেনারেল এরশাদের সঙ্গে জলসংক্রান্ত বিতর্কে তিনি ঐক্যমতে উপনীত হন এবং মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে দুই দেশের কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে Joint Committee of Expert বা JCE গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বহুদিন ধরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালকে শামিল করার দাবি জানিয়ে আসছিল। রাজীব গান্ধী তাতেও সম্মতি দেন। যদিও পাঞ্জাব ও অসমের জাতিসত্তার সমস্যা, শ্রীলঙ্কায় Tamil Tiger-দের উত্থান ও সর্বোপরি Boforce দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ধারাবাহিক যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করে, তার ফলে এই সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সামগ্রিকভাবে তাই বলা যায়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০— এই পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ও পরবর্তী অভ্যুত্থানের পর জনতা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের পর্যায়ে জেনারেল এরশাদের শাসনকাল এবং রাজীব গান্ধীর কূটনৈতিক দৌত্য সবকটি পর্যায়েই কিছু অগ্রগতি হলেও সামগ্রিক ভারসাম্যের স্থিতাবস্থা বজায় থেকেছে।

দক্ষিণ এশিয়া ও সামগ্রিকভাবে বিশ্বের কাছে ১৯৮৯-৯১ সময়কাল এক সন্ধিক্ষণের সময়কাল। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। বাজারের দর্শন একমাত্র বিকল্প হিসেবে উঠে আসে। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ, যা দীর্ঘকাল জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির নামে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার অনুসারী ছিল, নিজের পূর্বতন অবস্থান থেকে সরে এসে তাকে অভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্ত করতে হয়। শুরু হয় উদার অর্থনীতির জয়জয়কার। দক্ষিণ এশিয়ায় অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে এই বদল ক্রমান্বয়ে ঘটে। সর্বোপরি কংগ্রেস দলের একাধিপত্য এই পর্যায়ে নষ্ট হয়েছিল এবং যদিও জনতা দল খুব অল্প সময় শাসনক্ষমতায় ছিল, কিন্তু সেই পর্যায়েই সংসদীয় রাজনীতিতে উচ্চবর্গের কংগ্রেসি ধারার বিপরীতে আঞ্চলিক স্তরে নিম্নবর্গের রাজনীতি ও দলের উত্থান ঘটে। এই সময় থেকে পুরোনো সর্বভারতীয় দল কংগ্রেসের পরিবর্তে যেমন নতুন রাজনীতিক শক্তির বিভিন্ন প্রদেশে বিকাশ ঘটে, তেমনি ভারতীয় জনতা পার্টির হাত ধরে বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে মোকাবিলা করে এক নতুন সর্বভারতীয় দলের উত্থান হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় যখন এই পরিবর্তন

সংঘটিত হচ্ছে, তখন গোটা বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী ইসলামি শক্তির উত্থান আরও একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা। বলা যায়, বাংলাদেশে ইসলামিকরণের বিস্তার এই পর্যায়ে।

দুই মহিলা নেতৃত্বের দ্বারা সংগঠিত হয়ে বাংলাদেশের দুটি প্রধান রজনৈতিক দল জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে, নির্বাচন সংগঠিত হয় এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উত্থান ও ভারতে কংগ্রেসি সরকারের নেহরু পরিবার বহির্ভূত ব্যক্তির ক্ষমতায় আসা একই সময়ে হয়েছিল। তামিল আত্মঘাতী বাহিনীর হাতে রাজীব গান্ধী নিহত হবার পর নরসিমা রাও ক্ষমতায় আসেন আসেন এবং ১৯৯৬ সালে ভারতবর্ষে রাও ও বিএনপি— দুই শক্তিই ক্ষমতাচ্যুত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সরকার চালালেও ভারতীয় জনতা পার্টি এই পর্যায়ে দুটি নির্বাচনে জয়যুক্ত হয় এবং ১৯৯৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করে। যদিও ২০০৯ সালের পর কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় আসে, কিন্তু এক তথাকথিত অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী ড. মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন।

বাংলাদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসা বড়ো আকারে কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। বিএনপি-এর ভারতবিরোধী অবস্থান এবং একইসঙ্গে ভারতে হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থান প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল— এই পর্যায়ে গড়ে ওঠা সম্পর্কের প্রগতির অন্তরায় হবে। এই পর্যায়ে একমাত্র সাফল্য ছিল ভারত কর্তৃক তিন বিঘা করিডরের স্বীকৃতি।

১৯৯০-এর দশক দক্ষিণ-এশিয়ার হিন্দু মৌলবাদ ও ইসলামীয় মৌলবাদ— দুই-এর উত্থানের কাল। রামমন্দির গঠনকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত জমিতে সংঘ পরিবারের পা রাখা ও ৮০০ বছরের পুরোনো মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর, মূলত হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণের ঘটনা ঘটে এবং ১৯৯৩ সালে বোম্বাই বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে ইসলামিক মৌলবাদীরা ভারত রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। বিজেপি, শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল সহ বহু হিন্দুত্ববাদী সামাজিক সংগঠনের যেমন এই পর্যায়ে বিকাশ ঘটে, তেমনি বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামি, হরকত-উল-জেহাদি, ইসলামি হুজি সহ অন্য ইসলামি শক্তিগুলির বিকাশ হয়। দুই দেশেই এই শক্তিসমূহের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও অন্তর্ঘাতমূলক আক্রমণ চলতে থাকে এবং এই পর্যায়ে বহুত্ববাদের চেহারা থেকে সরে গিয়ে হিন্দু ভারত ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ অনুসারী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের ভাবনা থেকে সরে এসে ইসলামিক বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে নতুন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলেও তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে ভারত-বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো অগ্রগতি হয়নি; উলটে অবনতি হয়েছিল। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দেয়। মৌলবাদী শক্তিগুলির প্রভাবে পাকিস্তানি শক্তিগুলির প্রভাব বাড়তে থাকে বাংলাদেশে। আবার চীনের সঙ্গে বিএনপি দলের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার ফলে

বাংলাদেশে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক গঠন হলেও এর মাধ্যমে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল এই সময়ে।

অবশেষে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হয় আওয়ামি লিগ দল— শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৯৬ সালে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে দীর্ঘদিনের সংঘর্ষের চিত্র আমরা বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে দেখে এসেছি চট্টগ্রাম পার্বত্য হিল শান্তি চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের থেকে তা মুক্তি পায়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক-বাণিজ্যেরও উন্নতি সাধন হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আওয়ামি লিগ দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেও প্রধান বিরোধী দল বরাবরই এই বিষয়ে আওয়ামি লিগের সমালোচনা করে এসেছে। ঐতিহাসিক গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে বিএনপি-র পক্ষ থেকে বলা হয়, ভারতের দাবির কাছে শেখ হাসিনা আত্মসমর্পণ করেছে।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি ও তার জোট শরিক জামাত ক্ষমতায় আসে। মেজর জিয়া ও হুসেন মো. এরশাদের সময় বাংলাদেশকে যেভাবে ইসলামিক বাংলাদেশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, এই সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ সরকারকে ইসলামি শরিয়তি মাফিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়। তাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে চলেছিল বিএনপি। ৯/১১-র পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উলট-পুরাণ শুরু হয়। সর্বত্র এক আগ্রাসী প্রচেষ্টা শুরু হল মুসলিম দুনিয়া কায়েমের। আর সরকারি প্রচেষ্টাতে বাংলাদেশ হয়ে যায় তার অন্যতম পীঠস্থান। আল-কায়দার অন্যতম ঘনিষ্ঠ হুজি বাংলাদেশকে তাদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলে। এই সময় 'বাংলাভাই' নামে এক সন্ত্রাসবাদীর দাপটে বাংলাদেশ তটস্থ। এই 'বাংলাভাই'কে বলা হয় মুসলিমদের জাগ্রত সৈনিক। বাংলাভাই প্রকাশ্যে তালিবানের সমর্থনপুষ্ট বলে দাবি করত কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তাকে আটকানোর জন্য। তার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল জেএমজেবি নামক এক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, যাদের ১,০০০ সশস্ত্র ক্যাডার ছিল বলে দাবি করা হত। এছাড়া, জেএমবি নামক তালিবানপন্থী সংগঠনটি সরকারের শরিক জামাতের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠতে থাকে।

হরকত-উল-জেহাদি-ইসলাম (হুজি) তার সব প্রচার কার্যকলাপ চালাতে শুরু করে ঢাকা থেকে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০১ সাল থেকে ভারতে যতগুলি সন্ত্রাসবাদী হিংসার কার্যকলাপ হয়েছে, তার বেশিরভাগই 'হুজি' নেতৃত্বে। কলকাতায় মার্কিন সেন্টারে হামলা, ট্রেনে বিস্ফোরণ সর্বত্র হুজির নাম উঠে আসে। হুজি বাংলাদেশ সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার ও জঙ্গল ঘেরা বান্দারবন এলাকাতে সন্ত্রাস ক্যাম্প তৈরি করে বাহিনীর প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।

বিএনপি-জামাত সরকারের সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল— ভারত সরকারবিরোধী সমস্তরকম শক্তিকে ঢাকা মদত ও আশ্রয় দিতে শুরু করে। আইএসআই ঢাকাতে তার তৎপরতা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে।

জালনোট ছাপানো, ভারতের বাজারে জালনোট ঢোকানো, ভারতবিরোধী শক্তিগুলিকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বার বার এই অভিযোগ জানিয়েও কোনো কার্যকরী ফল লাভ হচ্ছিল না। ঢাকা সুরক্ষার দিক থেকে ভারতের সবথেকে বড়ো বিপদ হিসেবে দেখা দেয়। আল-কায়দা Let-এর সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি তাদের নিরাপদ আশ্রয় পায় ঢাকাতে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী বিএসএফ-এর গোয়েন্দাবাহিনীর তথ্য বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়ে দাবি করা হয়, বাংলাদেশে কমপক্ষে ২০০ ক্যাম্প চালাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। এর মধ্যে ULFA ৩৩টি ক্যাম্প, National Front of Tripura ২১টি, National Democratic Front of Bodoland ১৯টি ক্যাম্প চালাচ্ছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করে বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে দাবি করা হয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। গোয়েন্দা রিপোর্টে কোথায় কোথায় এই ক্যাম্প চালানো হচ্ছে, তারও উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— সিলেট, ময়মনসিংহ, খাগড়া গাছি, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, রাজশাহি প্রমুখ জেলা। ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনী বাংলাদেশের তৎকালীন সীমান্তবাহিনী BDR-কে এই সমস্ত তথ্য তুলে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, শুধুমাত্র একবার নয়, বার বার ভারতীয় গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার অবস্থান উল্লেখ করেও তথ্য প্রদান করা হয়। এই যবনিকার পতন ঘটে চট্টগ্রাম বন্দরে আটক হওয়া অস্ত্রবোঝাই ১০টি ট্রাকের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ফলে। গোয়েন্দাসূত্র থেকে জানা যায়, চীন থেকে এই অস্ত্র আসছিল আলফার জন্য। ১০ ট্রাক অস্ত্র নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার পুত্র তারিক জিয়া, বেগম জিয়ার ঘনিষ্ঠ সাকা চৌধুরী, জামাত ও প্রশাসনিক প্রধানরা। এত অভিযোগ নিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট করার পরও বাংলাদেশের তরফ থেকে সমস্ত রকম অভিযোগ অস্বীকার করা হতে থাকে।

এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, বিএনপি প্রধান বেগম জিয়ার কোনোরকম রাজনৈতিক ইচ্ছা ছিল না ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বৈদেশিক সম্পর্ক অটুট করা। তার ফলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মসৃণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার মুখোমুখি হতে থাকে দুই দেশ। উপরোক্ত বিএনপি সরকার চীনকে সন্দ্বীপ বন্দর নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করে। কক্সবাজরে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণও চীন করেছে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে অবনতি ২০০১-২০০৬ সাল নাগাদ ঘটে চলেছিল। কিন্তু Caretaker Govt. শাসনব্যবস্থা (২০০৬-২০০৮) সুদৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তি নির্মাণ করে। ফরুকউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত Caretaker Govt দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা কাটানোর প্রচেষ্টা নিয়ে চলেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। অস্থিতিশীল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত কীভাবে করা যায় তা নিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। কিছু শক্তি বাংলাদেশকে ব্যবহার করেছে ভারতের বিরুদ্ধে, তা নিয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দেয় Caretaker Govt.।

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে গঠিত জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে আওয়ামি লিগের ক্ষমতায় আসা প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছিল। বিএনপি যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন চীন ও পাকিস্তান স্বাধীনতা উপভোগ করে। তেমনি আওয়ামি লিগ ভারতের সঙ্গে তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি বাড়িয়ে তুলতে আগ্রহী হয়। কারণ এর পিছনে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান। ভারতের গান্ধী পরিবারের সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের পরিবারের পারিবারিক সম্পর্ক। তাই ক্ষমতায় আসার পর হাসিনার বিদেশনীতিতে ভারতের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দীর্ঘ রাজনৈতিক সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদী। নতুন সরকার ঘোষণা করে, ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। তারই ফলশ্রুতিতে আলফা নেতা অরবিন্দ রাজখোয়া, রাজু বড়ুয়া প্রমুখকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে হাসিনা ভারত সফলে আসেন। বলা যেতে পারে, হাসিনার এই সফর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সফরে অনেকগুলো চুক্তি ও দুটি মেমোরেন্ডাম সই করা হয়। তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি ভারত অঙ্গীকার করে, কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার ও বিতর্কিত সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকলেও ভারত সরকার তার অভ্যন্তরীণ আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এই সমস্ত চুক্তি এখনও বাস্তবে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ভারত-বাংলাদেশ রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অভিনব বিষয় লক্ষ করা গেছে বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ভারত সফরে। বেগম জিয়া দিল্লি সফর করে ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এই সফরে বেগম জিয়া ও তার সঙ্গীরা ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, বিরোধী নেত্রী সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের সভানেত্রী মিসেস গান্ধী, বিজেপি সভাপতি নিতীন গড়কড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও জাতীয় সুরক্ষা আধিকারিক শিবশঙ্কর মেনন ও বিদেশ সচিব রঞ্জন মাথাই-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, বেগম জিয়া তার সরকারের মেয়াদকালে ভারত সম্পর্কে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, বর্তমানে তিনি তার ১৮০° ডিগ্রি উলটো অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বেগম জিয়া ভারতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন যে, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতবিরোধী কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। পূর্বে তাকাও নীতি অনুসারে— বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার দলের কোনো আপত্তি নেই বলে জিয়া দাবি করেন। এমনকী ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি নিয়েও কোনো আপত্তি জানাননি তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা

করেছিলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া সম্ভবত মৌলবাদী দল জামাত-ইসলামের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করবেন, এই কারণে তার এই আদর্শগত পার্থক্য।

কিন্তু বেগম জিয়ার এই ভাবমূর্তির পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির বাংলাদেশ সফরে। স্বাধীনতার সময় মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের বিচারের দাবিতে গোটা বাংলাদেশ উত্তাল। স্বাধীনতার বিরোধিতার জন্য বিএনপি সঙ্গী জামাতের নেতারা দায়ী। শুধুমাত্র জামাত নয়, বিএনপি নেতারা এই একই অপরাধে জড়িত। তাদের বিচারের জন্য শাহবাগ আন্দোলন। এই সময় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সময়ে তিনি সাক্ষাৎ করেননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপি নেত্রী তার রাজনৈতিক জোট সঙ্গীদের বার্তা দিলেন যে, আমি ভারতের সঙ্গে নেই।

তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুই নেত্রীই শেষ কথা। তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছার উপর আঞ্চলিক সমস্যা সমাধান সম্ভব। প্রতিবেশী অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলা বাংলাদেশের মননশীল মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। প্রতিবেশী জাতির সঙ্গে গঠনশীল সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর। শেখ হাসিনার যে রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে, তিনি তা বার বার প্রমাণ করেছেন। ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য হাসিনাকে কম মূল্য দিতে হয়নি। তাকে বার বার শুনতে হয়— বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে তিনি ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ভারতবিরোধী হাওয়া তুলে ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসে।

কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার বিএনপি নেত্রী তার কিছুমাত্র ধার ধারেন না। না হলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষৎ করা। বিএনপি নেত্রী কোনোরকম সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়, তার প্রমাণ আগত রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নিয়ম নির্দেশ করা সত্ত্বেও তিনি তা বাতিল করে দেন।

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া যে রাজনৈতিক অসৌজন্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বা তাঁর দলের কোনোরকম রাজনৈতিক সদিচ্ছা নেই, যা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার পক্ষে মসৃণ ও পরিপূরক নয়।

১.১ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের ইতিহাসের সন্ধানের প্রথম পর্যায়

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম ছিল বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের সাফল্যের বিন্দু। ১৯৩০-এর দশক থেকে যে আত্মপরিচয়ের সন্ধান শুরু হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু সংখ্যগরিষ্ঠ জনসম্প্রদায় সহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথকভাবে বাঙালি মুসলিমের যে যাত্রা শুরু, তা প্রথম পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন ও পরে একটি পৃথক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের আত্মপ্রকাশের সূচনা করে। ১৯৩৬ সালে

বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে ঢাকার নবাব হাবিবুল্লার নেতৃত্বে United Muslim Party ও ফজলুল হকের নেতৃত্বে 'কৃষক প্রজা সমিতি' অংশগ্রহণ করে। United Muslim Party-র মুখ হিসেবে হুসেন সুরাবর্দি ছাড়াও ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং তার ভ্রাতা খাজা সাহাবুদ্দিন— যারা উভয়েই ছিলেন নবাবের পরিবারের অংশ এবং এই দল মূলত ছিল মুসলিম সম্পত্তিবান জমিদার ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। পক্ষান্তরে ফজলুল হক ও তার সমিতি ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং কৃষক প্রজার স্বার্থের সঙ্গে তাদের দলীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। গ্রামীণ বাংলায় কৃষক প্রজার মধ্যে ফজলুল হক ও তার দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতি ঘিরে এই দুই দল ও তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংঘাত বাঙালি মুসলিমকে ক্ষতবিক্ষত ও বিভক্ত করে। ১৯৩৬ সালে সমস্ত মুসলিম সংগঠনগুলিকে একই সম্মেলন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার পরও এই বিভাজন শেষ হয়নি। জনাব ইস্পাহানি-র পর জিন্নাকে আমন্ত্রণ করেন All India Muslim League-এর পক্ষে সমস্ত মুসলিম সংগঠনগুলিকে নিয়ে আসার জন্য। সংসদীয় নির্বাচনের জন্য জিন্না লিগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করেন ৫২ জন সদস্যকে নিয়ে, যার মধ্যে চার (4) জন ছিলেন জিন্নার মনোনীত সদস্য ও বাকিরা অপরাপর মুসলিম দলভুক্ত। ফজলুল হক এবং তার দল যদিও জিন্নার দ্বারা মনোনীত অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং এই বিষয়ে তার স্পষ্ট অভিমত ছিল যে, তিনি কলকাতার অ-বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে কোনোভাবেই বাঙালি মুসলিমের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হতে দেবেন না। এই বিরোধের ফলস্বরূপ জিন্না ফজলুল হককে পার্লামেন্টারি বোর্ড থেকে বহিষ্কার করেন।

বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লিগ দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজেদের পরিচয়ের সচতনতা এবং হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে অধিকার সচেতনতাই ছিল এই নির্বাচনী ফলের প্রত্যক্ষ কারণ। ফজলুল হক যদিও নিজামউদ্দিনকে পরাজিত করেন, কিন্তু যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তাকে লিগের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং একইসঙ্গে লিগের পক্ষে বিপুল জনসমর্থনের কারণে তিনি লিগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং প্রাদেশিক মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট (president) হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৩৮-৩৯ সালের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির রাজনৈতিক নেতারা এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা স্পষ্টভাবে ভারত রাষ্ট্রের বিভাজনের পক্ষে মত প্রকাশ করতে থাকেন অথবা তাদের অভিমত ছিল হিন্দু এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হোক। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক সৈয়দ জাফলুল হাসান এবং ড. আফজাল কাদিরির পেশ করা এই প্রস্তাবনাটি মুসলিম জনসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীকুলের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং কালক্রমে 'লাহোর Resolution'-এর বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করে। প্রায় একই সময়ে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লিগের president নবাব স্যার মহম্মদ শাহানওয়াজ খান একই প্রস্তাব পেশ করেন। এই সকল প্রস্তাবের সম্পূরক প্রক্রিয়া হিসেবে লিগ কমিটি ১৯৪০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনকে ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির প্রায় সকল অংশ এই প্রস্তাবে সম্মতি পেশ করে। যদিও প্রথম থেকেই এই 'পবিত্র রাষ্ট্র' বা নিজেদের দেশ গঠনে

বাঙালি মুসলিম-এর চিন্তা ও অন্য সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশগুলির ভাবনার মধ্যে পার্থক্য ছিল। আলিগড় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত উত্তর ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি ছিল মুসলিম চিন্তায় নবজাগরণের বহিঃপ্রকাশ, যার শুরু হয়েছিল সৈয়দ আহমদ খানের হাত ধরে। তাদের কাছে এই দাবি ছিল গোটা উপমহাদেশে মুসলিম ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বাহক। তারা আশা করেছিলেন, এই দাবির মধ্যে দিয়ে মুসলিম জনজাতির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে বাঙালি মুসলিমের কাছে হিন্দু আধিপত্যবাদের থেকে মুক্তি ছিল প্রধান ইস্যু।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফজলুল হককে লিগ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। নিজের পদত্যাগ পত্রে বহিরাগত মুসলিম নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করে ফজলুল হক লিখেছিলেন, ''I will never allow the interest of the thirty-three million Muslims of Bengal to be put under the domination of any outside authority, however eminent it may be.'' ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে ৪৯৪ আসনের মধ্যে ৪৩৯ আসন মুসলিম লিগের দখলে আসে। জিন্নার প্রভাব এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এতটাই ব্যাপক ছিল সেই পর্যায়ে যে, বাংলা থেকে ৭ জন অ-বাঙালি ব্যক্তিত্ব মুসলিম লিগের প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালের এপ্রিলে মুসলিম লিগ নবনির্বাচিত বিধায়কদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে জনাব সুরাবর্দি এবং আবদুল হাসিম এই সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। অসম থেকে প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানি।

এটা সর্বজনবিদিত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে এটলির লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ায় ভারতের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধের সময় চার্চিলের নেতৃত্বে জাতীয় সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার ছিল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো এবং ভারতের ভবিষ্যতের বিষয়টি হিমাগারে রেখে দেওয়া। ১৯৪০ সালের ৮ আগস্ট লিনলিথগোর ঘোষণায় শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য এই পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়— অগ্রগতির পন্থার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের একমত হতে হবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ একমত হতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রশ্ন বিবেচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ব্রিটিশরা যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশনকে লন্ডনের প্রভুদের পরিকল্পিত একটা জনসংযোগ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না— সফল হওয়া এ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল না। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের কাছে বিবেচ্য বিষয় করে তোলার জন্য ওয়াভেলের নাছোড়বান্দা প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। কিন্তু এটলি ক্ষমতা গ্রহণের পর অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজে পরিবর্তন আসে; সিমলা সম্মেলনের পর দ্রুততার সঙ্গে ১৯৩৬-৩৭ সালের পর ভারতে নির্বাচন হয় এবং ক্যাবিনেট মিশনের আগমন ঘটে। ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি না, এটা আর আলোচনার বিষয় ছিল না— বরং কত দ্রুত, কার কাছে এবং কী শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, এটাই ছিল আলোচনার বিষয়।

পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়— যদিও এ প্রস্তাবের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল অস্পষ্ট। যুদ্ধের পর দ্ব্যর্থক এই দাবির বিপদ ব্রিটিশ নীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিন্নাহ ও মুসলিম লিগ সুবিধাজনক মিত্র হলেও ব্রিটিশরা ভারতের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল; ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তারা ভীষণ বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। লন্ডনের অগ্রাধিকার ছিল ভারতে এমন এক উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করা যে, সুয়েজের পূর্বাংশে ব্রিটিশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম। এ জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ভারত, শক্তিশালী কেন্দ্র ও অবিভক্ত সৈন্যবাহিনী। ক্ষমতা ধরে রাখার প্রশ্নে পাকিস্তান, রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য বিভক্তিমূলক বিষয়গুলো অত্যন্ত সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়। ওইসব বিষয় ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ধীরে ধীরে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে নির্বাচনের ফলাফল এবং মুসলমান ভোটররা লিগের পক্ষে যে রায় দেয়, তার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় আপোশ-মীমাংসায় লিগ ও জিন্নাহকে উপেক্ষা করা লন্ডন ও দিল্লির পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। অনেক কারণে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে লন্ডন ছিল খুবই আগ্রহী। সুতরাং, আপোশ-মীমাংসার বিষয়টির জন্য আর অতীতের মতো ঢিলেঢালা সময়সূচি রাখা হল না; যেসব পক্ষ ও বিষয় সমস্যার দ্রুত সমাধানের পথে বাধার কারণ হতে পারে, সেসবকে যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া হল। আলোচনার জন্য একটি কার্যকরভাবে ত্রিপাক্ষিক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হল— ব্রিটিশদের পক্ষে কথা বলার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ। বাংলার জন্য এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রিশ দশকের শেষের দিকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পর বাংলায় যে কংগ্রেস টিকে থাকে, সেটি কেন্দ্রের শিখণ্ডীতে পরিণত হয়। কেন্দ্রের আলোচনায় বাংলার মুসলমান নেতাদের কার্যকরভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। চল্লিশের দশকে প্রাদেশিক সরকারের দুর্বল ভূমিকার কারণে তাদের সামান্যই গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং দিল্লির উপর তাদের প্রভাব তাই ছিল অল্প। কেন্দ্রে দর কষাকষির জন্য সমানাধিকারের দাবির প্রতিনিধি হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশগুলো জিন্নাহর কাছে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সন্দেহপূর্ণ। তিনিও যতদূর সম্ভব তাদের কাছ থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখতেন। তাই এটা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে, নিজের পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে জিন্নাহ বাঙালি মুসলমানের স্বার্থ ও দাবিকে কেন্দ্রে তুলে ধরবেন।

তবু সর্বভারতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ায় প্রাদেশিক রাজনৈতিক চাপ একটা ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস হাই কমান্ড যখন দেশ-বিভাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং খণ্ডিত পাকিস্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তারা বেঙ্গল কংগ্রেসের ইচ্ছাকে পদদলিত করেনি, বরং বেঙ্গল কংগ্রেস তাদের দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। বাঙালি হিন্দুরা সবসময় তাদের প্রদেশকে (বাংলা) নিজের প্রদেশ বলে গণ্য করে। ১৯৪৬ সালের শেষদিকে এবং ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে এই অস্বীকৃতি এমন দৃঢ় সংকল্পে পর্যবসিত হয় যে, বাংলাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে এবং হিন্দুরা অবশ্যই নিজেদের জন্য কেটেছেঁটে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করবে। এর অর্থ হল, পশ্চিম ও উত্তর

বাংলার হিন্দু-প্রধান জেলাগুলো নিয়ে নতুন এক প্রদেশ সৃষ্টি করা যেখানে হিন্দুরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি হিন্দু রাজনীতির অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতির থেকে এই দৃঢ় সংকল্পের উৎপত্তি ঘটে; তবু দেখা যায়, এর সফলতা কেন্দ্রের কংগ্রেসের সমর্থনের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। প্রাদেশিক ভদ্রলোক রাজনীতি ও কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের অগ্রাধিকারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীল এই প্রতীকী সম্পর্ক ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করে।

১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্ব গ্রহণের সময় কংগ্রেস হাই কম্যান্ড সরকার গঠনে কোয়ালিশন নীতি গ্রহণে অস্বীকার করে। এর পরিবর্তে নেতৃত্ব প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কংগ্রেস চাপ সৃষ্টি করে যে, আইনসভায় নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া প্রদেশগুলোতে সে এককভাবে সরকার গঠন করবে। যেসব দল নির্বাচনী ঐক্য করেছিল, তারা ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তাদের স্বতন্ত্র দলীয় পরিচিতি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেতে বলা হয়। যুক্ত প্রদেশে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ১৩৪টি আসনের মধ্যে ২৭টি আসনে জয়লাভ করে, বাকি আসন লাভ করে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস তার নির্বাচনী ঐক্য ভঙ্গ করে বলে যে, প্রাদেশিক মুসলিম লিগ সরকারে যোগ দিতে চাইলে তাদের স্বতন্ত্র সংগঠন ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যুক্ত প্রদেশের মুসলিম লিগ ও জিন্নাহর কাছে এই শর্ত গ্রহণযোগ্য হয়নি। একইভাবে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মধ্যে যেখানে কংগ্রেসের সরকার গঠনের সুযোগ ছিল না, সেখানে অন্য কোনো স্থানীয় দলের সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে প্রাদেশিক কমিটিগুলোকে নিষেধ করা হয়। একই নীতি বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এখানে স্থানীয় কংগ্রেস আইন সভায় দল হিসেবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। স্থানীয় নেতৃবর্গ, বিশেষ করে শরৎ বসু, কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের অনুমতির জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু কেন্দ্র তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস আড়াই বছর সরকার পরিচালনা করে। বিরোধী দলে থাকার সময় যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, সেই সব বিষয় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সমস্যায় পড়ে। কংগ্রেস যেসব গ্রুপের প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবি করে সেই সব ভিন্ন স্বার্থের সব গ্রুপকে সন্তুষ্ট করা যে কতটা কষ্টকর তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় ওইসব মন্ত্রীসভার। দলের ভেতর ও বাইরে থেকে কৃষিসংস্কারের দাবি ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনও গঠিত হয়— সমাজের দুর্বল ও গরিব শ্রেণির লোকদের জন্য কথা বলার কংগ্রেসের দাবি নিয়েও তারা প্রশ্ন তোলে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের বাড়তি দাবিকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে আন্দোলনরত কিষাণ সভা, ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দলগুলো। চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আগের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ডানপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে দলীয় নেতৃত্ব বামপন্থীদের চাপের মুখে পড়ে। অপরদিকে, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষ অভিভাবক হিসেবে দলের দাবি মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। উভয়ক্ষেত্রে হাই কম্যান্ড তাদের বিরোধী পক্ষের বৈধতা ও আন্তরিকতা অস্বীকার করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে; এমনকী জাতীয়তাবাদের প্রতি তাদের অঙ্গীকার নিয়েও হাইকম্যান্ড প্রশ্ন তোলে। এই অহমিকাপূর্ণ

আচরণের জন্য কংগ্রেসের সমালোচকেরা আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। দলের ভেতর ও বাইরের বামপন্থীরা সবশ্রেণির লোকের পক্ষে নেতৃবৃন্দের কথা বলার দাবির বিরুদ্ধে অবিরামভাবে আক্রমণ চালায়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জিন্নাহ ও মুসলিম লিগ ক্রমশ আগের চেয়ে অনেক বেশি অনমনীয় হয়ে ওঠে।

যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারত ত্যাগ করতে ব্রিটিশ মনস্থির করে ফেলেছে, তখন কংগ্রেসই যে তার একমাত্র যথার্থ ও একক উত্তরাধিকারী, এই দাবির বিরুদ্ধে সব মহল থেকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস 'সাধারণ' হিন্দু নির্বাচনী এলাকায় খুবই ভালো করে; কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি প্রমাণে সে ব্যর্থ হয় (সারণি ৬)। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লিগ মোট মুসলমান ভোটের মধ্যে শতকরা ৮৬.৭ ভাগ ভোট পায়; অথচ এর বিপরীতে কংগ্রেস পায় শতকরা মাত্র ১.৩ ভাগ। প্রদেশগুলোতে সব মুসলমান ভোটের মধ্যে মুসলিম লিগ ভোট পায় ৭৪.৭ ভাগ, আর কংগ্রেস পায় শতকরা মাত্র ৪.৬৭ ভাগ। ব্রিটিশ ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়ে ১৯৩৬ সালের চেয়ে স্পষ্টত ভালো ফল পায়। উভয়ে আলোচনার টেবিলে আসে, কিন্তু যুক্তি থাক আর নাই থাক স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থেকে তারা তাদের চূড়ান্ত খেলার সমাপ্তি টানতে চায়। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিমলা সম্মেলনে জিন্নাহ জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁকে মুসলমানদের 'একমাত্র মুখপাত্র' হিসেবে গণ্য করা হোক, এবং প্রস্তাবিত যেকোনো ফেডারেল সরকারে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মুসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হোক। অন্যদিকে কংগ্রেস তার পুরোনো মনোভাব ব্যক্ত করে; এর নেতারা জোর দিয়ে বলে যে, তারা মুসলমান সহ সমগ্র জাতির পক্ষে কথা বলে। স্বাধীন ভারতের সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্ব স্পষ্ট করে বলে যে, একটা শক্তিশালী ও কেন্দ্রীয় একক রাষ্ট্র গঠনে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ (বস্তুত ১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্ট থেকেই এটা স্পষ্ট)। বল্লভভাই প্যাটেলের মতো নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও দলের প্রাদেশিক শাখার ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহী মনোভাবের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে যে, একটা শক্তিশালী কেন্দ্র অত্যাবশ্যক। জওহরলাল নেহেরুর মতো অতি বামঘেঁষা নেতারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন; ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে এ কথা তাঁর কাছে অনুভূত হয় যে, সামগ্রিকভাবে সারা দেশের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এটলি গভর্নমেন্ট ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশনকে ভারতে পাঠায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটা নিষ্পত্তি করার জন্য। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আজাদ মিশনকে অবহিত করে যে—

> ফেডারেল ইউনিয়নকে আবশ্যিকভাবে কতকগুলি জরুরি দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে হবে ... একে হতে হবে সুসংবদ্ধ, এর প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকতে হবে, সেইসঙ্গে ওইসব বিষয় দেখাশোনার জন্য এবং স্বীয় ক্ষমতায় ওই উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ের অধিকার থাকতে হবে। এসব দায়িত্ব ছাড়া ফেডারেল ইউনিয়ন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ... পররাষ্ট্র বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগসহ সাধারণ বিষয়ের মধ্যে থাকতে হবে মুদ্রা, শুল্ক, ট্যারিফ এবং অন্য এমন সব বিষয়, যার সঙ্গে এসবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

সারণী ৬ ঃ ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সর্ব-ভারতীয় ফলাফল

প্রদেশ	কংগ্রেস	মুসলিম লিগ	অন্যান্য	মোট আসন
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০	১৭	৩	৫০
পাঞ্জাব	৫১	৭৩	৫১	১৭৫
সিন্ধু	১৮	২৭	১৫	৬০
যুক্তপ্রদেশ	১৫৪	৫৪	২১	২২৮
বিহার	৯৮	৩৪	২০	১৫২
উড়িষ্যা	৪৭	৪	৯	৬০
বাংলা	৮৬	১১৩	৫১	২৫০
মাদ্রাজ	১৬৫	২৯	২১	২১৫
মধ্যপ্রদেশ	৯২	১৩	৭১	১৭৫
বোম্বাই	১২৫	৬০	২০	১৭৫
অসম	৫৮	৩১	১৯	১০৮

সূত্র ঃ এন.এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৪৬, খণ্ড ১, পৃ. ২৩০-৩১

১৯৪৬ সালের শেষদিকে এবং ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে লিগের সঙ্গে কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকারের সময় অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই প্রত্যয়টি আরও দৃঢ় হয়। অন্তর্বর্তী সরকারে প্রাধান্য ছিল কংগ্রেস নেতৃবর্গের— জওহরলাল নেহেরু ও সরদার প্যাটেল ছিলেন যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। লিগের লিয়াকত আলি ছিলেন অর্থমন্ত্রী— তিনি অর্থ তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের কাজকর্ম কার্যকরভাবে আটকে দিতে সক্ষম হন। নেহেরু অভিযোগ করেন যে, 'উত্তম সরকার ও উন্নয়নের স্বার্থে বিভক্ত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে— সরকারি কাজ পরিচালনায় ... এবং দেশে এ সরকারের এক গ্রুপবিরোধী দল হিসেবে কাজ করছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলের কাছে এটা অসহ্য বলে মনে হয় যে,

> অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সময় থেকে লর্ড ওয়াভেল প্রদেশগুলোর জন্য এমন ক্ষমতার অনুমোদন দেন যে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করতে পারবে; তাছাড়া কংগ্রেসের পরামর্শের বিরুদ্ধে মুসলিম লিগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করা হয়েছে এবং এর ফলে ভারত একটা অরাজক রাষ্ট্র হিসেবে দ্রুত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে।

কংগ্রেসের কাছে 'লৌহমানব' হিসেবে পরিচিত প্যাটেলের কাছে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ ও শ্রমিক বিক্ষোভ দূর করার জন্য আবশ্যিকভাবে একটা জোরালো কেন্দ্রের শক্তিশালী কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তিনি মনে করতেন, 'যারা অন্যায় কাজ করে, তারা মনে করে যে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি নেই।' এ মুখ্য উদ্বেগ কংগ্রেস হাই কম্যান্ডকে জিন্নাহর পাকিস্তান দাবির বিষয়টিকে নতুনভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। এমন একটা সময় ছিল, যখন অখণ্ড ভারতীয় জাতির কোনো অংশের বিচ্ছিন্নতার ধারণা সব কংগ্রেস নেতার কাছেই অভিশাপ হিসেবে গণ্য হত। এখন তারা দেশের এমন সব অংশ ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, যেখানে কখনোই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আশা নেই এবং যা কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান। কিন্তু তারা অকিঞ্চিৎকর অংশ ছেড়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। অন্য কথায়, সাবেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো ভারতের সঙ্গে থাকতে হবে। এর অর্থ হল, কংগ্রেস যদি এ পথেই অগ্রসর হয় তাহলে বাংলা ও পাঞ্জাবকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে।

অন্যদিকে জিন্নাহ ও মুসলিম লিগের কাছে কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত ও একক রাষ্ট্রে সামান্য অংশীদার হওয়ার ধারণা ছিল বিস্বাদময়। জালালের মতে, জিন্নাহ চেয়েছিলেন একটা শিথিল ফেডারেশন, যেখানে প্রস্তাবিত কেন্দ্রের কাছ থেকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো ব্যাপকমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ পাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জিন্নাহকে মনে হয়, তিনি পাকিস্তানের ধারণাকে একটা 'দর কষাকষির প্রতিঘাত' হিসেবে প্রসারিত করেছেন। বলা হয় যে, জিন্নাহ ধারণা করেছিলেন যে, কংগ্রেস দেশ-বিভাগ এড়াতে খুবই উদ্বিগ্ন এবং ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে রাখার জন্য সে প্রয়োজনীয় যেকোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত। কেবিনেট মিশনের 'প্ল্যান-এ' শিথিল ফেডারেল কাঠামো ও সীমিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতের কথা ছিল, সে ব্যাপারে জিন্নাহর আগ্রহ দেখে বোঝা যায় যে, সম্ভবত এ ধরনেরই একটি ফেডারেশন তিনি চাইছিলেন।

এ কথা সত্য যে জিন্নাহ কখনো এমনকী ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে তাঁর পাকিস্তান দাবির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। জনগণের কাছে অতি পরিচিত লাহোর প্রস্তাবেও দেশ-বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আসলে 'পাকিস্তান' ধারণার অস্পষ্টতাই এই স্লোগানকে অত্যধিক শক্তিশলী করে তোলে। বিভিন্ন লোকের কাছে এর অর্থ বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয় এবং বলতে গেলে জিন্নাহর যত অনুসারী ছিল 'পাকিস্তান' সম্পর্কে প্রায় ততগুলো ধারণা সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে হিন্দু এবং নির্দিষ্টভাবে কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে দুঃখকষ্টের তীব্র অনুভূতি প্রকাশে এই স্লোগান যেভাবে ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে তেমনভাবে আর কিছু কখনো তেমনটি করতে পারেনি। জালাল যেমনটি মনে করেন, জিন্নাহর কাছে 'পাকিস্তানে'র অর্থ হল ভারত ফেডারেশনের মধ্যে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মুসলমানদের জন্য ব্যাপক মাত্রায় রাজনৈতিক ক্ষমতা (এবং সম্ভবত তাঁর নিজের জন্যেও), আর তাঁর অনুসারীদের কাছে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। জিন্নাহর অনুসারী অধিকাংশ মুসলমানের কাছে পাকিস্তান হল একটা ধর্মীয় আদর্শ— পাকিস্তান হচ্ছে একটি 'দার-উল-ইসলাম'-এর স্বপ্ন, একটি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ভূমি, যেখানে ইসলাম তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে বিকশিত হবে। এটা ছিল একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক স্লোগান— এর অঙ্গীকার ছিল ভারতে সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণে অধস্তন অবস্থান থেকে মুসলমানদের মুক্তি। জিন্নাহর উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, তাঁর রাজনীতি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটা শক্তিশালী ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগ্রত করে; তারা এমন এক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয় যা আবশ্যিকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের

মধ্যে সন্দেহ, ঘৃণা ও উগ্রতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যদি জিন্নাহ নিজে সত্যিকারভাবে পাকিস্তান নাও চান, তাঁর অনুসারীরা চেয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে শুধু পাকিস্তান দাবি করতেই উদ্বুদ্ধ করেননি, প্রয়োজন হলে তার জন্যে লড়াই করতে বলেছিলেন।

১.২ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের ইতিহাসের সন্ধানের দ্বিতীয় পর্যায়

যে বাঙালি মুসলিম পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান পেয়েছিল, জাতীয় সংহতি ও নিজস্ব দেশ পাওয়ার সেই স্বপ্নের মধুচন্দ্রিমা শেষ হয় অনতিবিলম্বে। অবিভক্ত পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে যে শিক্ষাবিষয়ক সম্মলন আহ্বান করেন, তাতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ইসলামিক আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। পূর্বপাকিস্তানের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সংবিধানসভার এক সদস্য সভায় উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষায় বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। লিয়াকত আলি খান এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং ঘোষণা করেন— পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মই হয়েছে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলিমের দাবির ও স্বপ্ন পূরণের জন্য এবং সেই মুসলিমের মাতৃভাষা হল উর্দু। জাতির সংহতির জন্য প্রয়োজন একক ভাষা এবং উর্দু ছাড়া অন্য কোনো ভাষারই সেখানে স্থান নেই।

রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলার দাবি যদিও ক্রমশই জোরালো হতে থাকে এবং বাঙালি আমলা ও বুদ্ধিজীবী ছাত্রছাত্রী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন অংশের কাছে এই দাবি জনপ্রিয় হয়। প্রাদেশিক আইনসভার বিভিন্ন সদস্য এমনকী বেশ কিছু মন্ত্রীও এই দাবির পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং বাংলাভাষা দাবি বিতর্ক ও চর্চার পরিসর থেকে সড়কে নেমে আসে। মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র আন্দোলন ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। বামপন্থী-মধ্যপন্থী-দক্ষিণপন্থী সমস্ত অংশই ভাষার অধিকারের দাবিতে সরব হয়। যদিও রাজনৈতিক দলগুলি এবং প্রাদেশিক আইনসভার বেশিরভাগ সদস্যই এই পর্যায়ে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না।

১১ মার্চ ছাত্রদের একটি জমায়েত পুলিশি লাঠিচার্জের সম্মুখীন হয় এবং একটি বড়ো সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গ্রেপ্তার হয়। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে জিন্নাহর ঢাকায় আসার প্রস্তুতিকালে। প্রাদেশিক সরকারের প্রধান নাজিমউদ্দিন বিক্ষোভের কারণেই হোক বা গভর্নর জেনারেলের আসার বা অনেকেই মনে করেন তার নিজস্ব সমর্থনের ভিত্তিতে আন্দোলনের অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। স্থির হয়, ১) প্রাদেশিক আইন সভা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও সমস্ত স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে এবং ২) প্রাদেশিক আইনসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবি জানাবে। প্রথম প্রস্তাবটি প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত হয়, কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অনুমোদন করেননি।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে জিন্না যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তখন এই ভাষা বিতর্ক অন্য মাত্রা পায়। জিন্নার ধারণা ছিল— নাজিমউদ্দিন ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভের কাছে সাময়িক নতি স্বীকার করে হয়তো এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং প্রাদেশিক আইনসভার এই দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তাবে না। বাঙালি শ্রোতাদের কাছে এক ভাষণে তিনি স্পষ্ট করেছেন— যে প্রদেশের ভাষা বাংলা হিসেবে স্বীকৃত হলেও পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু ভিন্ন কোনো ভাষাকে স্বীকারের প্রশ্ন নেই। Action Committee-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং তাদের উপলব্ধি করানোর প্রয়াস নেন কেন জাতীয় সংহতির জন্য একক ভাষা অনিবার্য। ছাত্ররা যদিও তার বক্তব্যে সম্মত হয়নি। কারণ ১৯৩৭ সালে All India Muslim League-এর লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে যখন মুসলিম ভারতের জন্য উর্দুভাষার দাবি ওঠে, তখন বাঙালি মুসলিম প্রতিনিধিরা তার বিরোধিতা করেছিলেন। জিন্না সে সময় এই বিতর্কে হস্তক্ষেপ করেন এবং তার মত ছিল, যেখানে উর্দুভাষী মানুষের সংখ্যা বেশি, সেখানে উর্দুভাষার বিকাশে উদ্যোগ নিতে হবে এবং যেখানে উর্দু প্রধান ভাষা নয়, সেখানে অন্য ভাষাকে স্বীকৃতি জানিয়ে উর্দুকে স্বেচ্ছামূলক বিষয় হিসেবে রাখতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে। Action Committee-র ছাত্র প্রতিনিধিরা তার এই অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

ভাষাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয়বার বিক্ষোভ আন্দোলন ও গণজমায়েতের সূত্রপাত হয় ১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি— যে সময় নিজামউদ্দিন একটি জমায়েতে জাতীয় ভাষার প্রসঙ্গে জিন্নার মতামত পুনর্বার উপস্থিত করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এই পর্যায়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ ও মুখ্যমন্ত্রীকে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতের পুতুল বলে চিহ্নিত করেন। অনতিবিলম্বে সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরেধ কমিটি গড়ে তোলে এবং ৩০ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ক্লাস বয়কট ও রাস্তায় মিছিল উভয়ই শুরু হয়। উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীরা যদিও এই বয়কটে অংশগ্রহণ করেনি যার ফলে সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

এই পর্যায়ে আওয়ামি লিগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নেতৃত্বে দানে এগিয়ে আসে। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট অনুসারে ৩০ জানুয়ারি একটি গোপন সভায় আওয়ামি লিগ ও কমিউনিস্ট সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মিলিত হন এবং তারা উভয়ই একমত হন যে, ছাত্রদের পক্ষে বৃহৎ আন্দোলন পরিচালিত করা সম্ভব নয়। ওই সভায় স্থির হয়, ব্যাপক জনগণের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক সমর্থন এবং ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামি লিগ কাজ করবে এবং নেতৃত্ব দেবেন— মৌলানা ভাসানি। ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আবুল হাসিম, হামিদুল হক চৌধুরী সহ গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে নিয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির জন্য কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২১ ফেব্রুয়ারি গোটা প্রদেশ জুড়ে বন্ধ ও স্ট্রাইক ঘোষণা করে এবং মিটিং মিছিল ও গণ জমায়েতের উপর সরকার যদি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে, তবে তাকে উপেক্ষা করেও রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে জনগণকে আহ্বান জানায়।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে গোটা প্রদেশের জনগণ অভ্যুত্থানের মূলে দাঁড়িয়েছিল। গোয়েন্দা রিপোর্ট এই পর্যায়ে বারংবার জঙ্গি জমায়েত ও প্রস্তুতির খবর দেয় কিন্তু তাকে উপেক্ষা

করেও পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সরকার এই অসন্তোষকে নেহাত একটি আইন শৃঙ্খলার বিষয় হিসেবে ভেবেছিল এবং সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসন ২০ জানুয়ারি সন্ধেয় সমস্ত রাজনৈতিক মিছিল-মিটিং-জমায়েত বেআইনি বলে ঘোষণা করে।

২১ ফেব্রুয়ারি শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমায়তে ও মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা হয়। দুপুরের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। উত্তেজনামূলক বক্তব্য দেওয়া হতে থাকে এবং প্রশাসনিক নির্দেশকে যথেষ্টভাবে অমান্য করা হয়। এই পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মিছিল ও আন্দোলনে মহিলাদের উপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে সাময়িক জমায়েত বিধানসভার দিকে রওনা হয়। পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের দমন করার চেষ্টা করে, ব্যর্থ হবার পর তারা বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি করে। ঘটনাস্থলে একজন ছাত্র মারা যান এবং পরবর্তীকালে দু-জন হসপিটালে মারা যান।

২১ ফেব্রুয়ারি গুলিচালনা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লিগের সমাধি তৈরি করে। মুসলিম লিগের জনপ্রতিনিধিরা গণ বয়কটের মুখোমুখি হন, বেশ কিছু জনপ্রতিনিধি পদত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট যারা ছিলেন, তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন। গুলি চালনার এই ঘটনা পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের সামগ্রিক মেরুকরণ ঘটায়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ যদিও একে ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু তা ধূলিসাৎ হয় যখন ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে মুসলিম লিগের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা ভাষার প্রশ্ন এর পরে আর উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রসারণবাদী ও সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে বাঙালি মুসলিমের আত্মপরিচয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

১.৩ অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয়করণ

ব্রিটিশ ভারত ও তার প্রশাসন একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালিত হত, যত দিন না ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আইন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকে সামনে রাখে। যদিও ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোনো ফলিত প্রয়োগ শাসন প্রণালীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না এবং যে সকল প্রাদেশিক সরকারগুলি এই পর্যায়ে ছিল তারা অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা ভোগ করত একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হিসেবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এবং অর্থনৈতিক নীতি কেন্দ্রই স্থির করত। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নব্যগঠিত পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের তাই কোনো অন্য কিছু হওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে এবং তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ শাসনের যে মডেলটি লাভ করেছিলেন, তাকে প্রয়োগ করতেই সদা উৎসুক ছিলেন। এই প্রবণতা গতি পায় যখন জিন্না নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনীতিক বিষয় দেখাশুনার জন্য এক ব্রিটিশ অফিসার Sir Archibald Rowlands-কে নিযুক্ত করেন। তার অভিমত ছিল, ‘‘If Pakistan is to be strong it must be strong as centre.’’ ফলস্বরূপ তিনি প্রাদেশিক রাজস্বের

এক বড়ো অংশ কেন্দ্রের কাছে হস্তান্তরিত করার কথা বলেন এবং কেন্দ্রীয় স্তরে একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন গঠনের কথা বলেন। Sir Rowlands অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতৃত্বের অভিযোগগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। রাজস্ববণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অসমতা

২। পাট ও অন্যান্য বৈদেশিক বাণিজ্য

৩। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত

কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে স্বায়ত্ত্বশাসনের লক্ষ্যে বাঙালি মুসলিমের আত্মপরিচয়ের লড়াই মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়।

রাজস্ববণ্টনের ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ মনোভাবের অভিযোগ যেমন ছিল, তার সঙ্গে ছিল পাট ও পাটের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে টানাপোড়েন। বিভাজনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান উপমহাদেশের সামগ্রিক পাট উৎপাদনের প্রায় ৭৩ শতাংশ উৎপাদন করত, যদিও বিভাজন পরবর্তীতে একটিও পাটকল তার ভাগে পড়েনি। ১৯৫০ সালের শেষভাগে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৪৫ শতাংশ আসত পাট থেকে। এই পাটের মূল ক্রেতা ছিল ভারত। যে ভারতই ছিল আবার পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহকারী। শতাব্দীপ্রাচীন এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে বিঘ্ন হতে চলেছিল যে দ্বন্দ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ এক জায়গায় লিখেছেন, ''East Bengal sends out goods in return for which she gets nothing. It means a continues economic drain of a magnitude and dimension unknown in any civilised country. East Bengal is being sucked dry or the life blood of her economy.'' তৎকালীন সরকারি তথ্য অনুসরণ করলে দেখা যায়— যে যদিও পূর্ব পাকিস্তানে বাস করতেন পাকিস্তানের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ, কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট অনুসারে তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ২৮ শতাংশ, যা ১৯৬৯-৭০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৬ শতাংশ। উন্নয়নের চালচিত্রে পূর্ব পাকিস্তানে ভাগিদারী কতটুকু ছিল তা নিম্নের সারণী চিত্র থেকে পরিষ্কার—

	West Pakistan	East Pakistan
	1947-48 to 1966-67	
Cotton Textiles (Production in million yards)	350 to 6836	508 to 550
Increase of Cement Production	1853%	8.26%
(in thousand tons)	305 to 1934	46 to 75
Increase of	534%	63%

দেশভাগ সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে সংকুচিত করেছিল। পূর্ববঙ্গের সমতল এলাকা অসমের পার্বত্য এলাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমতট দশকের পর দশক জুড়ে পরস্পরের বাজার হিসেবে থেকেছে ও সহাবস্থান করেছে। বাণিজ্য-নদীকেন্দ্রিক পরিবহন ও অবাধ মুক্ত চলাচলের মধ্য দিয়ে দুই অংশের বাণিজ্যর বিস্তার ঘটেছিল।

১.৩.১ খাজা নিজামুদ্দিন ও গোলাম মোহম্মদ

১৯৪৯ সালে মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে আওয়ামি মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গেই মুসলিম লিগ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন গতিবেগ লাভ করে। ১৯৫২ সালে মৌলানা ভাসানির উদ্যোগেই 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে দলের নাম আওয়ামি লিগ রাখা হয়। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয়কে নিয়ে এই দলকে একটি শক্তিশালী জাতীয় দলে পরিণত করার প্রয়াস শুরু করেন। অনেক কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কর্মী এই দলের মধ্যে ঢুকে কাজকর্ম শুরু করে। তার ফলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হতে শুরু করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে মুসলিম লিগের শক্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ১৯৫৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত 'মূলনীতি কমিটি' ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপরিষদে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণ প্রতিনিধিত্বের বিধান অর্থাৎ সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে সংবিধান প্রণীত হবে। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে মোট আসন সংখ্যা হবে ১২০টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬০টি ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৬০টি। এই রিপোর্টে স্থির হয় পূর্ব পাকিস্তান একটি ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত থাকবে।

মূলনীতির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন লাহোরে আঞ্চলিকভাবে সামরিক আইন জারি করেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী খাজা নিজামউদ্দিনকে বরখাস্ত

করেন। একইসঙ্গে পাঞ্জাব প্রদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে সরাসরি গভর্নর জেনারেলের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় মোহাম্মদ আলিকে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলির ক্ষমতার সংকোচন করেন। গভর্নর জেনারেল সামরিক বাহিনী ও পাক প্রশাসকের সাহায্য নিয়ে সংবিধান সভাকে ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলিকে কোনোরকমের ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। নতুন ক্যাবিনেটে জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বানানো হয়। জেনারেল মোহাম্মদ আয়ুব খান এক আর্মি কমান্ডার ছিলেন— তাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বানানো হয় এবং চৌধুরী মোহম্মদ আলি প্রাক্তন প্রশাসনিক প্রধানকে অর্থমন্ত্রীতে রূপান্তরিত করা হয়। এই নতুন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার সংকোচন এবং দেশের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। পাকিস্তানের ফেডারেল জোট নতুন সংবিধান সভার মিটিং আহ্বানের নির্দেশ দেয়। এই নতুন নির্বাচিত সংবিধান সভা ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে প্রথমবার মিলিত হয়। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে মোহম্মদ আলিকে সরিয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রী করে এবং গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদকে সরিয়ে ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জেনারেল ইসকান্দার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

১.৩.২ দ্বিতীয় সংবিধান সভা

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক ১৯৫৮ সালের মার্চমাসে সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হল। সমগ্র পাকিস্তানে এ নির্বাচন না নিয়ে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নেওয়া হল। ওই নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হল আওয়ামি লিগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন। এই অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর নেতা নেড়া অর্থাৎ পাকিস্তান আওয়ামি মুসলিম লিগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুসলিম লিগ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করা হয়। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে। যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ আসনের মধ্যে ২২৮টি আসনে জয়লাভ করে। পূর্ব বাংলার মুসলিম লিগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির আশা প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতি দেয় পূর্ববঙ্গবাসী। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বশাসনের দাবি মর্যাদা লাভ করে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলি ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রস্তুত করতে রাজি হন। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে নিয়ে একটি ইউনিট গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আরেকটি ইউনিটের স্বীকৃতি পায়। ১৯৫১ সালের সংবিধানে

পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়; যেটি ইসলানের নীতি আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। জাতীয় আইনসভাতে ৩০০টি আসন রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সমান সংখ্যক আসন বণ্টন করা হয়।

আওয়ামি লিগের শহিদ সোহরাওয়ার্দি ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হন। কেন্দ্রে আওয়ামি রিপাবলিকান পার্টি ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। আওয়ামি লিগ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার ছিল। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের কারণেই এই স্বায়ত্তশাসনের দাবি ওঠে। মূলত ১৯৪৭ সালের পর থেকেই পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যেই আওয়ামি লিগ ১৯৪৯ সাল থেকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছিল। ওই বছরের ১৯-২০ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামি লিগের কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা হয়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি আইনমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের সংবিধানের যে খসড়া করেছিলেন, তা নিয়েও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক অব্যাহত ছিল। এই সংবিধানে সংসদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব যুক্ত নির্বাচন এবং গোটা পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে এক ইউনিট স্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হয়। পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ মওলানা ভাসানি আওয়ামি লিগের সভাপতি পদ ত্যাগ করেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি ঘোষণা করেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ভীতসন্ত্রস্ত প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ক্ষমতা হারাবার ভয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সংবিধান পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্ট হন। ইতিমধ্যে রিপাবলিকান পার্টি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন নেই, এই অজুহাত তুলে প্রেসিডেন্ট মির্জা প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দিকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানান। ১৮ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দি পদত্যাগ করেন।

১.৩.৩ আয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

সাবেক গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ছিলেন দেশের প্রেসিডেন্ট আর জেনারেল আয়ুব খান ছিলেন প্রধান সেনাপতি। পরবর্তী সময়ে আয়ুব খান দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। ২৭ অক্টোবর মির্জা দেশত্যাগ করলে সমস্ত দায়দায়িত্ব জেনারেল আয়ুব খান নিজের কাঁধে তুলে নেন। আয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। আয়ুব খান প্রথমে রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার ও নির্বাসন শুরু করেন এবং ভবিষ্যত তারা যাতে রাজনীতি করতে না

পারে, তার জন্য সামরিক আইনে অধ্যাদেশ জারি করেন। এবডো নামে জারিকৃত সামরিক অধ্যাদেশের ফলে রাজনীতি প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেল দেশে। ১৯৫৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার ৪২ জন নেতাকে এবডোর মাধ্যমে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। আওয়ামি লিগ প্রধান শহিদ হোসেন সোহরাওয়ার্দিও এবডোর শিকার হন।

রাজনীতিবিদদের গ্রেপ্তার ও তাদের বিরুদ্ধে এবডো প্রয়োগের মাধ্যমে ১৯৬৬ পর্যন্ত তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। পাকিস্তানের জন্য আয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে নতুন গণতন্ত্র চালু করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ২৫ অক্টোবর আয়ুব খান তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রে স্তর ছিল পাঁচটি। ক্ষমতায় চিরস্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগঠনের ব্যাপারেও উদ্যোগী হন। তার লক্ষ্যে সামরিক আদেশ বলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। ১৯৬২ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন। এবং এখানে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। একইভাবে রাজনীতিতে ইসলাম ধর্মের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা বললেও ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেন।

ষাটের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন। আয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর একাধিক কমিশন গঠন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য বিচারপতি হাসিদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন শিক্ষা সংকোচনের লক্ষ্যে একটি গণবিরোধী রিপোর্ট প্রণয়ন করে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বিশেষ করে ছাত্রলিগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এই শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একসময় পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল। আয়ুব খান সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এ আয় হ্রাস পায় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ২.৬ শতাংশ। পাকিস্তানের আমদানি মূল্য নির্ভরশীল পূর্ব পাকিস্তানের পাট শিল্প ও চা শিল্পের উপর। তার ফলে বাঙালি রাজনীতিবিদরা বাংলার স্বায়ত্ত শাসনের দাবি রাখে।

১.৩.৪ মুজিবরের ছয় দফা দাবি

১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেখ মুজিব আওয়ামি লিগের পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে যান এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামি লিগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি লিগের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। মওলানা আবদুল রশিদ তর্কবাগীশকে আওয়ামি লিগের সভাপতি করা হয়।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৪-র নির্বাচনে এবং ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের পরে বাংলাকে নতুনভাবে আন্দোলিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ সর্বদা সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছিল। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামি লিগের লাহোর অধিবেশনে শেখ মুজিব ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন—রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের দাবি। ৬ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। কী ছিল এই ৬ দফা দাবিতে—

* পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবে সংসদীয় সরকার।
* ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি বিষয় থাকবে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে।
* দুটি প্রদেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পৃথক অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক নীতি থাকবে।
* কর ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে না; তবে অঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ লাভ করবে।
* পাকিস্তান ফেডারেশনভুক্ত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দুইটি পৃথক খাত হিসেবে রাখা হবে।
* অর্জিত পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ও বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রদানের জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি লিগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে প্রকাশ করা হয় বাঙালির দাবি ছয় দফা, বাঁচার দাবি ছয় দফা, ছয় দফার মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন নিহিত। আওয়ামি লিগের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশব্যাপী ছয় দফার পক্ষে প্রচারাভিযান শুরু হয়ে যায়। এদিকে ৬ দফা নিয়ে দলের মধ্যে সৃষ্ট মত বিরোধ নিরসনের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। ১৯ মার্চ শেখ মুজিবরকে আওয়ামি লিগের সভাপতি করা হয়। ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভাতে শেখ মুজিবর জানান যে, ''৬ দফা নতুন কিছু নয়। স্বায়ত্ত শাসনের দাবি আমরা জানিয়ে আসছি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। পাকিস্তান সেদিনই উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যেদিন উভয় অংশ সমান শক্তিশালী ও উন্নত হবে। ৬ দফা মূলত আমাদের বাঁচার অধিকারের দাবি। বাঙালি জাতির অস্তিত্বের জন্যই আমরা ৬ দফা প্রণয়ন করেছি। ৬ দফাই বাংলাদেশের সব মানুষের প্রাণের দাবি হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ৬ দফার কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। এই আন্দোলনই এখন থেকে বাঙালির একমাত্র আন্দোলন।''

৬ দফা দাবিতে বাংলাদেশ যখন প্রবল উত্তাপে ফুটছে, তখনই তাদের নেতা শেখ মুজিবকে ৮ মে ঢাকাতে গ্রেপ্তার করা হয়। সারাদেশে আওয়ামি লিগ নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায়। শেখ মুজিব সহ অন্যান্য নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সালের ৬ জুন হরতাল আহ্বান করা হয়। শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

থেকে বিরত রাখার জন্য নানাভাবে নিগৃহীত করা হতে থাকে। একের পর এক মামলায় তাকে জড়ানো হয়। এতে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৬ দফা দাবির স্বপক্ষে সারাদেশে প্রচার কার্য চালানোর জন্য ৮ মে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসার আগেই ঢাকা জেল গেট থেকে আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়— আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই ছিল পাকিস্তানের রাজনীতির এক টার্নিং পয়েন্ট।

১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকারি এক প্রেসনোটের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের প্রথম সচিবের সঙ্গে মিলে সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে ১৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রবিরোধী এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ মামলা সম্পর্কে মুজিব মন্তব্য করেছিলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র নয়, আসলে এটা ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা।

৬ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তাকে আরও তীব্রতর করে। ৬ দফা দাবির যৌক্তিকতা জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গেসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যের চিত্র ফুটে ওঠে। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুজিব সহ বাকি নেতৃত্ব মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পায়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের এক বিশাল সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ আয়ুব খান সাময়িক আইন জারি করে সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ান। এই নিয়ে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন আইন জারি করা হল।

শাসনক্ষমতা দখলের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি বিষয়ের ঘোষণা করেন—

১। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের বিলুপ্তি এবং এর পরিবর্তে সাবেক প্রদেশগুলো পুনর্বহাল করা হবে।

২। ফেডারেল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।

৩। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বে আগস্ট মাসে দেশে বন্যা হওয়ায় নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়। নভেম্বরের ১২ তারিখে এক প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করার দাবি জানায় কয়েকটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু আওয়ামি লিগ নির্বাচনের দিন পরিবর্তনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এই ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলবর্তী জেলাগুলি তছনছ হয়ে যায়। এই নির্বাচনে আওয়ামি লিগ ১৬২টি আসন লাভ করে। অপরদিকে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮১টি আসনে জয় লাভ করে। সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানি শাসকচক্রের কৌশল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

৩ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হয়। ১২ জানুয়ারি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১৪ জানুয়ারি ইয়াহিয়া মন্তব্য করেন, শেখ মুজিব দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে শেখ মুজিবই সরকার গঠন করবে। শেখ মুজিব ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আওয়ামি লিগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান।

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধান রচনার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ আসনের ৮৮ আসন লাভকারী ভুট্টোর দল শেখ মুজিবকে আলোচনার প্রস্তাব দেন। শেখ মুজিব ইতিমধ্যে ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিহলেন। ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসে পাকিস্তানের ক্ষমতায় ভাগ বসানোর প্রস্তাব দেয়। ৬ দফা কর্মসূচির প্রস্তাবে আপোশ করে ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে আওয়ামি লিগ রাজি না হলে ভুট্টোর দল ঢাকাতে জাতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এদিকে ইয়াহিয়া খান মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আপামর জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। পাকিস্তানে দু-জন প্রধানমন্ত্রী গঠনের প্রস্তাব দেওয় হয়; কিন্তু আওয়ামি লিগ ভুট্টোর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

এ অবস্থায় ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালন হয়। ওই দিন পল্টন ময়দানে ছাত্রলিগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ছাত্রলিগ নেতা শিবনারায়ণ দাসের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহাসানকে অপসারণ করে জেনারেল ইয়াকুব খানকে একইসঙ্গে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ভেতরে ভেতরে সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ শেখ মুজিব, ভুট্টো সহ ১২ জনকে ১০ মার্চ পুনরায় গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। পাকিস্তানের শাসনভার যাতে কোনো বাঙালির হাতে অর্পণ করতে না হয়, তার জন্য পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী, আমলা ও ভুট্টোর মতো রাজনৈতিক নেতা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াকুব খানের জায়গায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। আবার ৬ মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে সংসদ অধিবেশন ২৫ মার্চ আহ্বান করা হয়।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন— ''এবারের সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'' ৭ মার্চের এই বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে আইনত ও ন্যায়ত স্বাধীনতার ঘোষণা বলা হয়। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকাতে আসেন বৈঠকের জন্য। ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া খান ও

ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয়। এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক প্রস্তুতি চলছিল বাঙালিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে। ২৫ মার্চ ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান দু-জনেই ঢাকায় ছিলেন। সেদিনই দু-জনে পাকিস্তানে ফিরে যান। রাতে পাকিস্তানের মাটিতে পা দিয়েই টিক্কা খানকে তিনি নির্দেশ পাঠালেন— বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ট্যাঙ্কের নীচে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য।

রাতে ঢাকা শহরের ইতিহাসের বর্বরতম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটানো হয়। সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ঢাকার রাজপথে। ট্যাঙ্ক, কামান, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত নগরবাসীর উপর। পাকবাহিনী শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ গভীর রাতে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তারের আগে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। ২৬ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মুজিবের হয়ে ওই বাণী প্রচার করা হলে শুরু হয়ে যায় বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম।

১.৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাক হানাদার বাহিনী বাঙালির স্বাধীনতার দাবিকে মাড়িয়ে দিতে ঢাকা শহরকে হত্যামঞ্চে পরিণত করে। পাক বাহিনীর অন্যতম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলি এবং হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাতে গ্রেপ্তারের আগে মুজিব বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ বেতার মাধ্যমে এই ঘোষণা সারা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে যায়। ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কোলাঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মুজিবের নামে বাংলদেশে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পড়েন। ২৮ মার্চের মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকাতেই প্রায় ১০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে কমপক্ষে ৩ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন।

মার্চ মাসের এই ঘটনার পর থেকে ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে বাংলাদেশের নাগরিকদের আশ্রয়স্থল। কমপক্ষে ১২ লক্ষ বাংলাদেশি নাগরিক ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। শেখ মুজিবকে এই সরকারের প্রধান নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দিন আহমদ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। এম.এ.জি. ওসমানিকে বাংলাদেশের বাহিনীর প্রধান করা হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হতে থাকে। ভারত সরকারের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এমনকী অস্ত্রশস্ত্রে তালিম ও গোলাবারুদ প্রদান করা হয় ভারত সরকারের সহায়তায়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে সমস্তরকম সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দেন। কমপক্ষে দশ লক্ষ বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেন।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগামী ১২ দিনের যুদ্ধে পাকবাহিনী বাংলাদেশে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে

লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯২,০০০ পাক বাহিনীর পরাজয় স্বীকার করে, তখন মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে বিকেল চারটে নাগাদ আত্মসমর্পণ করেন।

অনেক রক্ত, অনেক আত্মত্যাগ, লাখো-কোটি মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটল আন্তর্জাতিক মানচিত্রে। এই যুদ্ধে কয়েক লক্ষ মানুষ শহিদ হন। নির্যাতিত হন অগণিত মা-বোন, যার পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর প্রায় ৫ হাজার অফিসার ও সৈনিক নিহত হন। ১৯৪৯ সাল থেকে বাঙালি যে সংগ্রাম করে চলেছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বাঙালির সেই সংগ্রাম শেষ হয়। ১৬ ডিসেম্বরকে বাংলাদেশি সরকার তার বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে।

১.৫ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনী যে ব্যাপক হত্যালীলা চালিয়েছিল, ১৯৪৯ সালে জেনেভা সম্মেলন অনুসারে তা গণহত্যা। স্বাধীনতার এত বছর পরে ২০১০ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিচার শুরু হয়েছে। আমরা জানি না, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে কত মানুষ নিহত হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হিসেব অনুসারে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ সারা দেশে নিহত হয়। আবার, পাকিস্তান সরকারের তথ্য অনুসারে মাত্র ২৬,০০০ মানুষ নিহত হয়। ২০০৮ সালে সম্পূর্ণ এক সমীক্ষা অনুসারে ২,৬৯,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়। পাক হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীরা শুধুমাত্র হত্যালীলা সম্পূর্ণ করে ক্ষান্ত হয়নি, ব্যাপক হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণের শিকার হয় বাংলাদেশের নারীরা। প্রায় ২ লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ কর হয় এবং প্রায় ২৫,০০০ মহিলাকে জোর করে অন্তঃসত্ত্বা করা হয়।

গণহত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী বাঙালি নর-নারী এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নিশানা করে হত্যা করে। সমস্ত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর অবধি পাক বাহিনী বাঙালি জনগণের উপর যে মারাত্মক অত্যাচার চালিয়েছে তা ফুটে ওঠে। এপ্রিলের প্রথম দিকের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাক হানাদার বাহিনী কমপক্ষে ১০ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। *The Sunday Times* এবং *New Stateman*-এর মতো সংবাদপত্রগুলি ১৯৭১ সালের জুন মাসে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, বাংলাদেশে গণহত্যা সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে মন্তব্য করে— মনে হয় ঢাকা শহরে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছে। (*New York Times,* 1971)

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে রাজাকার, আল-বাদর, আল-সামস-এর মতো সংগঠনগুলি, যারা এই গণহত্যা কাণ্ডের বেশিরভাগ সংঘটিত করে। এদের আক্রমণের নিশানা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষজন। এরা অতি পরিকল্পিতভাবে

ঠান্ডা মাথায় মানুষকে হত্যা করত। রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস এই সমস্ত বাহিনী ছিল জামাতের মধ্যেকার সংগঠন। এদিকে জামাত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি। জামাত বাংলাদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিল। সুতরাং বলা যেতেই পারে, জামাতের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদতে পাক বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশ জুড়ে গণহত্যা করা হয়, যাতে করে বাঙালি আর মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। এই লক্ষে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ঢাকাতে রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস দ্বারা বাঙালি পণ্ডিত, শিল্পী, সাংস্কৃতিক নক্ষত্র, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ গঠনে ভারতরাষ্ট্রের ভূমিকা

(India's Involvement in the Creation of Bangladesh)

ভারত যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই ভূমিকা একদিকে ছিল রাজনৈতিক, তেমনই সামরিক এবং একইসঙ্গে দুই দেশের জনগণের পরস্পরকে এক বিপুল সমর্থনের উপর দাঁড়িয়েছিল এই ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধে উচ্ছেদ হওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয়স্থল ছিল ভারত। ভারতীয় নাগরিক ও ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামি লিগ এক বিপুল জয় অর্জন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে এক সুবিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখে। সামগ্রিক ভোট শতাংশের হিসেবে লিগ প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত ছিল ৭২.৫৭ শতাংশ। একই ঘটনা ঘটে প্রাদেশিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে। সেখানে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামি লিগ ২৮৮টি আসন দখল করে এবং প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল ৮৯ শতাংশ। জাতীয় পরিষদে মহিলা সংরক্ষিত ৭টি আসনের ৭টিতে এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে ১০টির মধ্যে ১০টিতে আওয়ামি লিগ জয়লাভ করে। ফলস্বরূপ পাকিস্তানের ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (Pakistan People's Party) জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে ৪৪টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংসদীয় দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

যদিও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা আওয়ামি লিগের নেতা মুজিবর রহমানের কাছে হস্তান্তর না করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী অন্য পথ নেয়। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের রায়কে অস্বীকার করে ও সম্ভাব্য গণ অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বিনাশ করার জন্য ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় এক নির্মম অত্যাচার চালায়। এই আক্রমণ ও তার জবাবে প্রতি আক্রমণ এক পূর্ণতর যুদ্ধের দিকে গোটা পরিস্থিতিকে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দ্বারা গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে শেষতম পাকিস্তানি সেনাকে উচ্ছেদ না করা অবধি নিজের দেশ ও জাতির জনগণকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

আটক মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিরা এক নির্বাসিত সরকার গঠন করে। এই পর্যায়ে দেশীয় ইসলামীয় রাজাকার বাহিনী দ্বারা মদতপুষ্ট পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। ৩ লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হন। সমপরিমাণ ঘর বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় ১ কোটি মানুষ আশ্রয়চ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এই রক্তাক্ত ঘটনার পরিণতিতে।

ভারত এই পর্যায়ে যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন আদায়ের জন্য। এই সমর্থন ও ভারতের ভূমিকা ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব ছিল না।

ভারতীয় জনগণ, সরকার ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা এই যুদ্ধে অবিস্মরণীয়। যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দ্বারা বাংলাদেশে গণনিধন যজ্ঞ শুরু হয়, ভারত হস্তক্ষেপ করে এবং মুক্তিবাহিনীকে সামরিক সহায়তা দেওয়া শুরু করে। পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার জন্য যখন মার্কিন নৌবহর এসে উপস্থিত হয়, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নও নৌ-সেনা পাঠিয়ে ভারতকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সার্বিক সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা খুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের আশ্রয়হীন মানুষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম, বিহার, ত্রিপুরা নিজেদের রাজ্যে শরণার্থী শিবির তৈরি করে। বাংলাদেশের নির্বাসিত সামরিক বাহিনীর অফিসাররা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা এই ক্যাম্পগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করে মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষ্যে। যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে ভারত বিপুলভাবে পাশে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী গান্ধী মুজিবর রহমানের মুক্তির দাবিতে দেশে দেশে জনসমর্থন আদায়ের প্রয়াস নেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা ভারত বরাদ্দ করে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ৩৬৩০ জন অফিসার এই যুদ্ধে নিহত হন, ৯৮৫৬ জন অফিসার ও সৈন্য আহত হন এবং ২১৩ জন আজ পর্যন্ত নিখোঁজ। ফলত এই যুদ্ধে ভারত রাষ্ট্র যে এক ব্যাপক পরিমাণ ব্যয় ও ক্ষতি শিকার করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পশ্চিম ইউরোপ, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন ভ্রমণ করেন। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানকে সমর্থনের নির্দেশ দেন। যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা ছিল যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এই যুদ্ধে অংশীদার হয়ে পড়বে। চীন এই পর্যায়ে পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন দিলেও সামরিক সাহায্য খুব বেশি পরিমাণে দেয়নি। যদিও সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ভারতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমেরিকা, চীন ও পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে, তবে সোভিয়েত তার সর্বশক্তি নিয়ে পাশে থাকবে। ১৯৭১ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী লন্ডনে ইন্ডিয়া লিগে যে ভাষণ দেন, সেই বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশি জনগণের অসহায়তা ও পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক আচরণকে তুলে ধরেন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দাবি করেন। এই বক্তব্য ইউরোপের প্রথম সারির সমস্ত সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যুক্ত হওয়ার পূর্বে বিএসএফ-এর অফিসাররা মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করতেন। পরবর্তীকালে তারা গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণও দিতেন। পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের

সীমান্ত এলাকা জুড়ে এমনই প্রায় ৬৯টি প্রশিক্ষণ শিবির ছিল, যেখানে ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলার মাটিতেও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেই ঘাঁটি গেঁড়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই ভারতীয় সামরিক বাহিনী যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। নভেম্বরের পরবর্তীকালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে অনুমতি দেওয়া হয় সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি ভূখণ্ডের ১০ মাইল পর্যন্ত আক্রমণ সংগঠিত করার। সীমান্ত এলাকা জুড়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে মিত্রবাহিনী নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলে। ভারতীয় স্থল, নৌ ও বায়ু সেনার নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকার কারণেই সম্ভব হয়েছিল আরও বেশি গণহত্যা রোধ করা ও নতুন রাষ্ট্রের জন্ম।

জাতি-রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে তার স্বীকৃতির প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। প্রথম পর্যায়ে এই স্বীকৃতির বিষয়টি ভারতের কাঁধেই বর্তায়। ভারতের মূল ধারার সমস্ত রাজনৈতিক দল পেশাদার ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশ এটাই চাইতেন যে, ভারত এই স্বীকৃতি প্রদান করুক। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলও এই স্বীকৃতির পক্ষে ছিল, যদিও তাদের মত ছিল যে, একটি নির্দিষ্ট সময়েই এই স্বীকৃতি আসা উচিত। তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি ভারতকে এই বিষয়ে মেপে পা ফেলতে বাধ্য করেছিল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার উপর বহুল অংশে নির্ভর করছিল এই স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়গুলি। একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য যে যে শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ তার সবকটিই পূরণ করেছিল। যদিও ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর অবধি এই জন্য তাকে অপেক্ষ করতে হয়। পরিচিতির প্রশ্নে যদিও আইনগত দিকই ছিল প্রধান, কিন্তু বাস্তবে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির অভ্যন্তরীণ জাতীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রশ্ন।

আন্তর্জাতিক আইনের চোখে এবং ৬ ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী সময়ে যে যে নৃশংস ঘটনাবলি বাংলাদেশে সংগঠিত হয়েছে এবং ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃতির প্রশ্ন ছিল একটি open secret বিষয়। প্রথমে কলকাতা ও পরে দিল্লিতে বাংলাদেশ মিশন ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে একযোগে কাজ করে, তাতে স্বীকৃতির বিষয়টি অলিখিতভাবে এসেই পড়েছিল। এছাড়া ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির মধ্যে দিয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি বাংলাদেশ ইস্যুতে সদর্থক ভূমিকা নেয়। বুদাপেস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুজিব সরকারের পক্ষ থেকে আবদুল সামাদ আজাদ যখন প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে, তখন পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতির প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে এসেই যায়।

এই পর্যায়ে দিল্লিতে ভারত সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয় যাতে ২৪টি দেশ থেকে ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে এক ঘোষণাপত্রে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয় যাতে তারা বাংলাদেশকে এটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের সমস্ত ধরনের সামরিক ও সামাজিক

সাহায্য থেকে বিরত থাকেন। এই সম্মেলনে আরও ঘোষণা করা হয়, বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রাম আসলে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। প্রথম থেকেই মুজিবের সরকার ভারতের সমর্থনপুষ্ট ছিল। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মধ্যে দিয়ে ভারত সরকার সক্রিয় ছিল মুজিব সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে ও এমন বহুবিধ উদ্যোগ নেওয়ায়, যা বাংলাদেশের জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।

৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভাতে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের আর কোনো রাস্তাই খোলা নেই। বাংলাদেশের জনগণ তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন এবং ভারত প্রতিহত করছে আক্রমণকারীকে। আমরা উভয়েই এক সাধারণ শত্রুর মোকাবিলা করছি। সংসদের দুই কক্ষে তাই আমি এটা জানাতে চাই যে, এইরকম এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সরকারের থেকে ধারাবাহিক অনুরোধ আসার ফলশ্রুতিতে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার।

বাংলাদেশের দিক থেকে দেখলে কূটনৈতিক স্তরে এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছিল যথেষ্ট কঠিন বিষয়। কেননা জুলফিকার আলি ভুট্টো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, যদি কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, পাকিস্তান সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত রকম কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। লোকসভাতে শ্রীমতী গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটির উল্লেখ করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্পৃহা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের চরিত্রটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল প্রথম বৃহৎ রাষ্ট্র, যারা গণপরিসরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর যে আক্রমণ সংগঠিত করেছে, তার প্রকাশ্যে নিন্দা করেছে। ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা ও মুক্তির ৩৮ তম দিনের মাথায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সরকারি স্তরে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ মূলত ছিল পাকিস্তানকে মার্কিনি সমর্থনের প্রত্যুত্তর হিসেবে। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সমর্থন ছিল বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, পাকিস্তান মার্কিনি নেতৃত্বে গড়ে ওঠা CENTO এবং SEATO জোটের সদস্য ছিল এবং দ্বিতীয়ত, মার্কিন সরকার মনে করত যে, যুদ্ধে ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবীরূপে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাবকে আরও প্রসারিত করবে এবং ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে মার্কিনিদের যে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক ও রণনৈতিক স্বার্থ, তা ক্ষুণ্ন করবে।

অন্যদিকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট হওয়ার কারণেই ভারতের পক্ষে এই যুদ্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয়েছিল। ভারত সোভিয়েত সৌভ্রাতৃত্বের সূচনা অবশ্য ১৯৫৫ সালে, যখন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ নয়াদিল্লি সফর করেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এই মৈত্রী আরও বেশি প্রসারিত হয়। চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের পরাজয় এবং সোভিয়েত-চীন সম্পর্কের অধঃপতন ভারত ও সোভিয়েতকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং মস্কোর দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের ভারত সম্পর্কে আরও বেশি সদর্থক মনোভাব গঠনে বাধ্য করে। ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন বায়ুসেনার একটি

অংশ ভারতে পাঠান বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় ভারতকে ভীতিপ্রদর্শনের লক্ষ্যে। উদ্দেশ্য ছিল চারদিক থেকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে ঘিরে ধরা এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করা। এই পর্যায়ে মার্কিনিরা তাদের নৌবহরকেও প্রেরণ করে।

এই হুমকির মোকাবিলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি পরমাণু অস্ত্রশক্তিসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ পাঠায় ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। অ্যাডমিরাল Vladimir Kruglyakov-এর নেতৃত্বে এই নৌবহর উপস্থিত হয়। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পাল্লাসম্পন্ন ক্ষেপনাস্ত্র এবং পরমাণু অস্ত্র বহন ক্ষমতাসম্পন্ন সাবমেরিনও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেরণ করে।

সোভিয়েত ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও পারমাণবিক সাবমেরিনের একটি বাহিনীকে পাঠানো হয় এরপর। যেগুলি মার্কিন নৌবহরকে বাধ্য করে ভারত মহাসাগরীয় এলাকা ত্যাগ করতে। সোভিয়েত নীতি-নির্ধারকেরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রশ্নে যে যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন, তার কারণ সমসাময়িক বিশ্ব ও এশিয়ায় বৃহৎ শক্তি হিসেবে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে। ভারত যেহেতু এক দীর্ঘ সময় ধরে সোভিয়েতের রণনৈতিক বন্ধু হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে, তাই ভারতের স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা তাদের চিন্তিত না করে পারত না। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত যাতে তার প্রভাবশালী ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, সে সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল। বাংলাদেশের বিষয়কে ভূ-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার প্রয়োজনে এক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিল। একটি 'ত্রিমেরু বিশ্বে' রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারের জন্য বাংলাদেশের প্রশ্নে অবস্থান নেওয়াকে একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিল। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে 'Treaty of Peace, Friendship and Cooperation' গড়ে উঠেছিল, তার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে যেকোনো সামরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে দায়বদ্ধ ছিল। মার্কিন রণনীতির পক্ষে এটা ছিল এবং বড়ো বাধা ও বিপর্যয়। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় মার্কিনি আধিপত্যের সম্প্রসারণ ও সোভিয়েত প্রভাব বিনাশের জন্য এই পরিস্থিতি ছিল বাধাস্বরূপ।

মার্কিনিদের আশঙ্কা ছিল, সোভিয়েত প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে পাকিস্তানের প্রভূত ক্ষতিসাধন করবে এবং যে বিপুল পরিমাণ মার্কিনি অস্ত্র ও রসদ পাকিস্তানকে সরবরাহ করা হয়েছে তা ধ্বংস হবে। রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি ও পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশ নিরাপত্তা পরিষদে ভারত ও পাকিস্তান যাতে সেনা প্রত্যাহার করে যুদ্ধ বিরতিতে যায়, তার জন্য প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তারা আশঙ্কিত ছিলেন যে, ভারত এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়। নিক্সন ও কিংসিঙ্গার— উভয়েই সোভিয়েতের উপর যতদূর সম্ভব চাপ তৈরি করার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আসেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েতের ভূমিকাকে তাই নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়—

- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ও ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জনগণের যে রায় তাকে মান্যতা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর বার বার চাপ তৈরি করা। ১৯৭১ সালের ৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘে পাঁচটি খসড়া প্রস্তাব ও একটি সংশোধনী পেশ করে।
- ভারত সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন ও বাংলাদেশে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপকে বৈধতা দান।
- রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতির পক্ষে যে তিনবার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিই সোভিয়েত ভেটোর ফলে নাকচ হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অতুলনীয় ইতিহাসের সাক্ষী। এই যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ জয়লাভ করেছিলেন ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে যৌথভাবে। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনী ও জনতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই যুদ্ধে অতুলনীয় আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছে। যে ৩০ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন এবং সেই রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে নতুন দেশ গড়ে উঠেছিল, তারা প্রত্যেকেই এই ইতিহাসের সাক্ষী। মুজিব পরবর্তী সময়ে ইসলামীয় শক্তিগুলি পুনরায় শক্তি অর্জনের প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে এসেছে বটে এবং এটাও বাস্তব যে, বর্তমান বাংলাদেশে এক দীর্ঘ অপপ্রচারের পরিণতিতে এক জোরালো ভারতবিরোধী কণ্ঠস্বর রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার শক্তি যারা, তারা চিরকাল মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকাকে স্মরণ করবেন এক দায়বদ্ধ প্রতিবেশী হিসেবে, যে তার সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিবেশীর পাশে থেকেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও দিল্লির সফরে এসে মুজিব কন্যা হাসিনা সেই ভূমিকার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন।

২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্য। এই যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা যদিও কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তার পরও এটা বিচার্য যে, ১৯৭১ সালের শীতের দিনগুলিতে ঠান্ডাযুদ্ধের পটভূমিকায় যখন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ইস্যুতে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়া ছিল স্বাভাবিক; তখন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা কতটা মানবিক স্বার্থে ও কতটা দীর্ঘমেয়াদী রণনৈতিক প্রয়োজনে। যে সকল বিষয় এই প্রসঙ্গে চর্চায় আসা স্বাভবিক, তা হল এই পর্যায়ে ভারত রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভূমিকা ও আচরণ, উদ্বাস্তু শিবিরগুলির সামরিকীকরণ, পশ্চিমবাংলার মানুষের মধ্যে এই যুদ্ধের সমর্থনে সংহতি, দুই বাংলার অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্ত্বা এবং দক্ষিণ এশিয়ার শক্তির ভারসাম্য। ভারতের স্বকীয় ভূমিকা ও হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রশ্ন উঠে আসে, তা হল এই যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কি শুধুমাত্র পাকিস্তান বিরোধিতার কারণে অথবা একটি দ্বিতীয় হলোকাস্ট আটকানোর তাগিদে? রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধিরা ধারাবাহিকভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা ও অনুপ্রবেশ নিয়ে যে সকল প্রশ্ন ও উদ্বেগ প্রকাশ

করেছিলেন, এই হস্তক্ষেপ কি তার সঙ্গে সম্পর্কিত? সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রস্তুতি শিবিরগুলিতে দীর্ঘ নয় মাস ধরে অবস্থান করার সময় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে জটিলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, এই হস্তক্ষেপ কি তার জন্য? এমন বহু প্রশ্ন উঠে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপের সঙ্গে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী সমস্যা যুক্ত, যা নিঃসন্দেহে সেই সময় এক আন্তর্জাতিক সংকট তৈরি করেছিল। যদিও এই সংকটের ইতিহাসের শুরু তার আড়াই দশক আগে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভাজনের মধ্যে দিয়ে ও সর্বোপরি বাংলা বিভাজনের মধ্যে দিয়ে। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় Radcliff Report, যা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক শক্তির আক্রমণের মূলে দাঁড়িয়ে ভারতকে তার সীমানা খুলে দিতে হয়— বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা নিজেদের রাজ্যসংলগ্ন সীমান্তে শরণার্থী শিবির তৈরি করে। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি যত ভয়াবহ হতে থাকে ও আক্রমণ ও প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে— ভারত সরকারের হিসেব অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এই চাপ সহ্য করা ছিল যথেষ্ট উদ্বেগের।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মূলত লড়াই করছিল। যে সকল শরণার্থী শিবিরগুলি ভারতবর্ষের সীমান্ত এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে, সেগুলির অবস্থা ছিল নিঃস্ব করুণ। আবার একইসঙ্গে সামরিক যুদ্ধের পটভূমিতে শিবিরগুলিরও সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল। এই সময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সামগ্রিক লেখাপত্রে ভারতে অবস্থিত এই শিবিরগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাকিস্তানি বাহিনীর যে সৈনিক ও অফিসাররা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে— মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন— তারা প্রায়শই এই শিবিরগুলিতে আসা-যাওয়া করতেন। একইসঙ্গে আনাগোনা ছিল শিবির হাসপাতালগুলিতে কর্মরত বাংলাদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সাংবাদিক সহ সমাজের সকল অংশের এই শিবিরগুলিতে যাতায়াত ছিল। পুরোদস্তুর এই যুদ্ধে বহু সময় শিবিরগুলি অস্থায়ী সেনা ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর বিদ্রোহী শিবির ও সীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী স্থানে ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করত।

সীমান্ত লাগোয়া ভারতের অধিবাসীদের এই সকল শিবির এমনকী ট্রেনিং ক্যাম্পগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অনেকেই যদিও যুদ্ধের কারণে শিবিরের এই অবস্থানকে বিপজ্জনক হিসেবে দেখেছেন, কিন্তু তবুও তারা শিবিরগুলিকে নিজেদের ও দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক বলে কখনোই মনে করেননি। বরং তারা বিপরীত মত পোষণ করতেন যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মুক্তি অর্জনের জন্য এই সশস্ত্র শিবিরগুলির প্রয়োজন অনিবার্য। কারণ নিয়োগ বা রিক্রুটমেন্টের আদর্শ ভিত্তি হিসেবে এই শিবিরগুলি কাজ করেছিল। ১৯৭১ সালের ২ সেপ্টেম্বর *Far Eastern Ecomomic Review* এই শিবির সম্পর্কে লিখছে, ''Eye Witnesses report the Mukti Fauj (liberation force) is increasingly better organised and claim more and

younger men are joining it. An intensive recruitment drive is on in the camps to enlist all men and boys from the age of 14 up."

ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে শিবিরগুলির ভূমিকা এই কারণেই প্রাসঙ্গিক যে, শিবিরগুলির এই ধারাবাহিক সামরিকীকরণ প্রক্রিয়াই হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তুলেছিল কি না। একটি স্বাধীন দেশের সীমানায় সামরিক শক্তির উপস্থিতি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের, কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই সামরিকীকরণে যোদ্ধাদের উন্নত মানের ট্রেনিং পাওয়া সম্ভব ছিল না, সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত এবং শরণার্থীদের দেশে ফেরার সম্ভাবনা ছিল অনেকটাই অনিশ্চিত। এটাই কি ছিল সেই কারণ, যার জন্য ভারত সরকার ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। Sisson and Rose দেখিয়েছেন যে, মুক্তিবাহিনীকে ভারত সরকার যে সকল অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, সেগুলির বেশিরভাগই ছিল নিম্নমানের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাতিলযোগ্য। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের সমর্থন যতটা রণনৈতিক ছিল, তার চেয়েও ছিল অনেক বেশি প্রতীকী। ভারত কি তার থেকে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল সীমান্তে সামরিক সমাবেশ সম্পর্কে? এই প্রশ্নে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। কারণ, ভারতের সংসদে কোনো সংসদীয় বিতর্কে এই সামরিকীকরণের প্রশ্ন উঠে আসেনি, যদিও সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি হত। এক্ষেত্রে এটাই ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থী শিবির ঘিরে এই সামরিকীকরণকে কোনো নেতিবাচক রূপে দেখেননি।

অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তা সংহতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে এবং সেইজন্যই অর্থনীতির ওপর জোরালো প্রভাব পড়া সত্ত্বেও শতকরা ১০০ জনের মধ্যে ৭০ জনই মনে করতেন যে, এই যুদ্ধ ন্যায্য; তাদের নিকট আত্মীয়রাই এই যুদ্ধে সক্রিয় এবং তারাও এই যুদ্ধে সমান অংশীদার। পূর্ববঙ্গের বহু পরিবার ভারতের সীমান্ত এলাকাবর্তী মানুষের আশ্রয়ে থেকেছেন এবং এই নিয়ে সরকারি ও প্রশাসনিক স্তরে কখনো কোনো অভিযোগ লক্ষ করা গেছে এমন নয়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইন্দিরা গান্ধী সংসদীয় নির্বাচনে জয়ী হন। এই নির্বাচনে তিনি তার 'গরিবী হটাও' স্লোগানকে জনপ্রিয় করেন। শরণার্থীদের আসা যেখানে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করছিল এবং স্পষ্ট লক্ষ করা যায় যে তিনি তার পূর্বতন প্রতিশ্রুতি অক্ষত রাখতে পারবেন না। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় অধিবাসীরা যেমন শরণার্থীদের আসাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাদের অভিন্ন সত্ত্বার জায়গা থেকে, অসম ও ত্রিপুরার স্থানীয় অভিবাসীদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। শরণার্থীদের জন্য নতুন রেশনকার্ড ইস্যু করা মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা স্থানীয় অধিবাসীদের অসন্তোষের কারণ হয়।

যুদ্ধের গোটা পর্যায়ে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রচারকে তীব্র করে যে, এই সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত মূলগতভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্ত এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন রুদ্ধ হয়েছিল। স্কুল-কলেজগুলি শরণার্থী শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যা অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রায় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, তা পাকিস্তান ধারণার মধ্যেই

আনেনি। রণনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক সমাজকে যদি পাকিস্তান প্রভাবিত করতে পারত এই যুক্তির ভিত্তিতে, যে এটি একান্তই দুই রাষ্ট্রের সমস্যা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পাকিস্তানি শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার যদি আড়াল করতে পারত, তবে পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব ছিল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা। ভারতবিরোধী মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করে পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল এই আন্তর্জাতিক সহানুভূতি অর্জন এবং প্রমাণ করা যে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব ভারতের ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়। ২৪ মে ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধী সংসদের আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ''It is mischievous to suggest that India has had anything to do with what happened in Bangladesh. This is an insult to the aspirations and spontaneous sacrifices of the people of Bangladesh, and a calculated attempt by the rulers of Pakistan to make India a scapegoat for their own misdeeds. It is also a crude attempt to deceive the world community.''

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেনের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। রাষ্ট্রসংঘের অবস্থানকে সমালোচনা করে সমর সেন লিখেছিলেন,

> There was a great hue and cry to internationalise the problem: diplomatic moves, various moves in the United Nations through these proposals for observers and this, that and the other— all designed to make it into an anti-Pakistan dispute; once it turned into and Indo-Pakistan dispute, people will forget what the Pakistan army is doing in East Pakistan. They can go on burning their villages, raping their women and so on. People will then forget and say it is an Indo-Pakistan dispute. It is extraordinary, therefore, to find that today, when pressure for action is so great in some quarters, this back ground is forgotten.

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যেখানে ভারতের নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় ইস্যু, সেক্ষেত্রে ভারতের শাসকশ্রেণি এই যুদ্ধকে দুই দেশের দ্বন্দ্বের তুলনায় কেন অনেক বেশি পূর্ববঙ্গের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম হিবে প্রচার করেছিল। শরণার্থী সমস্যা এত বড়ো আর্থিক চাপ তৈরি করার পরও প্রচারের এই অভিমুখ কি এইজন্য যে ভারতের শাসকশ্রেণি সাময়িক স্বার্থের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদি লাভের কথাই মূলত চিন্তা করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী গান্ধী এই যুদ্ধের সংহতিতে আন্তর্জাতিক স্তরের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলেন, যাতে যেকোনো উপায়ে গণহত্যাকে আটকানো যায়। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন,

> The great powers have a special responsibility and are in a position to bring about durable peace in the Indian subcontinent through mere words. Why was the world taking such a long time to rebuke Pakistan?

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যদিও তার বক্তব্যে ঠান্ডা লড়াইয়ের উল্লেখ নেই, কিন্তু চেষ্টা আছে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করার। এই পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বকীয় সমর্থন থেকেছে পাকিস্তানের প্রতি। ফলত বর্বরতম মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণহত্যাও তার কাছে বিষয় হয়নি। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, যে মার্কিন জনমত ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অনেক বেশি সরব ছিল, সেই জাগ্রত মার্কিনি জনতার কণ্ঠস্বরকে বাংলাদেশ যুদ্ধের স্বপক্ষে সেভাবে সরব হতে দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় জানিয়েছিলেন,

> The problems which confront us are not continued to Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. They are national problems. Indeed, the basic problem is an international one. We have sought to awaken the conscience of the world through our representatives abroad and the repressentatives of foreign Governments in India. We have appealed to the United Nations. However, I must share with the House, our disappointment at the unconscionably long time which the world is taking to reach to this stark tragedy.

শরণার্থী ইস্যুকে প্রচারের মূল অভিমুখ করার ফলে নির্ধারিতভাবে বলা যায়, পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলও পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানি হত্যা ও লুণ্ঠনকে ধিক্কার জানিয়ে আন্তর্জাতিক জনমতকে ভারতের পক্ষে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

Uthant এই পর্যায়ে UNHCR-এর হাই কমিশনারকে নির্দেশ দেন তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল তৈরি করে সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার ও নিরপেক্ষ তদন্ত করার। ১৭ জুন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ওয়েলিংটনে মার্কিন শ্রোতাদের সামনে এক ভাষণে বলেন, মার্কিন সরকারের নীরবতা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পক্ষে জমি তৈরি করছে। যদিও এর পরও কার্যকরী ফল বিশেষ কিছু হয়নি।

সরকারি স্তরে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও যখন ব্যর্থ হন, তখন মিসেস গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সারা পৃথিবীব্যাপী সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এই পর্যায়ে President Nixon-এর সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ভাষণ দেন। তিনি স্পষ্ট করেন, এই শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ভারতের কাছে পর্যাপ্ত নয় এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রয়োজন। তিনি আশ্চর্য হন এটা দেখে যে, পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বনেতারা নেহাতই উদাসীন এবং নির্লিপ্ত। এই পর্যায় থেকে ভারতের ভূমিকা আবেদনের পরিবর্তে জোরালো হতে থাকে এবং পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী এটা স্পষ্ট করেন, আগামী দিনগুলিতে রক্ষণাত্মক ভূমিকার পরিবর্তে ভারতের ভূমিকা আক্রমণাত্মক হতে চলেছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও মিসেস গান্ধী দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে এই সময়ে যে সকল বক্তব্য রেখেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভারত স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশা করছে। ..... ডিসেম্বরে সামরিক হস্তক্ষেপের আগে ভারত রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ চেয়েছে এবং বাকি রাষ্ট্রসমূহকে ভারতের প্রতিনিধিরা এটা দেখাতে চেয়েছে যে

সার্বিক প্ররোচনা ও অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও ভারতের ভূমিকা রক্ষণশীল। এই বস্তুগত জমির উপর ভারতের যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ ও সামরিক আক্রমণের ন্যায্যতা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থনের যে অভাব, তার অনেকগুলো দিক আছে— প্রথমত, এর ফলে ভারতরাষ্ট্র এটা উপলব্ধি করে যে, শরণার্থীদের যে বিপুল চাপ, তা এককভাবে তাকে বহন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঠান্ডাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে শক্তির ভারসাম্য এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ভারতের দিক থেকে কোনো পদক্ষেপ অন্য রাষ্ট্রগুলির সরাসরি বিরোধিতার মুখোমুখি হবে না এবং তৃতীয়ত, এই পর্যায়-ই হল সেই সময় যখন আন্তর্জাতিক কূটনীতির তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় নিজস্ব অবস্থান শক্তিশালী করাই বিচক্ষণতার, কেননা এর হাত ধরে ভারত আগামী দিনে এক মজবুত পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

১০ জুন রাজ্যসভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে কী পরিমাণ অর্থনৈতিক চাপের মুখোমুখি ভারতকে হতে হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিসেস গান্ধী জানান,

> When any country has to take a large influx— not an influx over a long period, but a sudden influx within a few weeks, of nearby six million people— it is not a joke; it is not a small thing. I would like to know from humble members; do they know of any country in the world which has taken even one-tenth of this sitaution before? It is very easy to sit in this House and just criticise and criticise. If even the thousand refugees arrive in any European country, the whole continent of Europe will be atire with all the news papers, the governments, and everybody will be aroused. We are trying to deal with nearly 6 million human beings, who have fled from a region of terror, who have come wounded, with disease, with illness, hunger and exhaustion. In this country we have a shortage of practically everything which they need. We have a shortage or corrogated iron sheets, we have shortage of every possible things you can think of. We have tried to round these items from every part of the country; we are rushing them to the camps. But no matter what we do— I am sorry to say— we cannot (supporting the) refugees.

এই বক্তব্যের পরও যা উল্লেখযোগ্য তা হল, যদিও স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে ভারতের লক্ষ্য ছিল শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানো ও অর্থনৈতিক চাপ থেকে মুক্তি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের সামনে পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত ও দুর্বল করার সুযোগ হাজির করেছিল। চীনের উত্থানের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থান বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হয়েছিল বলে অনেক তাত্ত্বিকই মনে করেন।

যদিও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতোই বাংলাদেশও আজ জনবিস্ফোরণের শিকার। এক বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন কৃষকের আবাদভূমি।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

India-Bangladesh Bilateral Relations

দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশ শারীরবৃত্তীয়ভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। একই দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, স্বজন হারানোর বেদনা এবং দেশভাগের ফলে আত্মীয় বিচ্ছেদের যে যন্ত্রণা— তা দুই দেশই ভোগ করেছে। এই ঐতিহাসিক বন্ধনই দুই দেশের মধ্যের সম্পর্ককে এক বহুমাত্রিক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ভৌগোলিক স্তরে একে অপরের পাশে থাকার যে সুযোগ, তা দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকেও এক অন্যতর উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

১৭৪৭ সালে দেশভাগের পূর্বে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পণ্য পরিবহন ও বাণিজ্যে মূলত বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হত। রেলপথ ও নদী পথে পরিবহন ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস অবধি অক্ষুণ্ণ থেকেছে, যদিও উল্লিখিত বছরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে তা স্থগিত হয়ে যায়। দুই পক্ষের শাসকগণই এই পরিবহনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। ফলত ১৯৭২ সালে ঢাকা-নিউদিল্লি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্বসত্ত্ব হিসেবে দীর্ঘদিনের অসমাধিত সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ট্রানজিট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা যেমন তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনই এই সুবাদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার ভারতের সামনে মুক্ত হলে বাংলাদেশেরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে, কেননা বাংলাদেশই হবে এই অর্থনীতির প্রবেশদ্বার। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৫০ বছর উদযাপনের পূর্তিতে প্রজাতন্ত্র দিবসেও প্যারেডে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ১২২ জন সদস্যবিশিষ্ট যে টিম অংশগ্রহণ করে, তা দুই দেশের সম্পর্ককে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। এই পর্যায়ে ভারতরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে নিহত সমস্ত শহীদদের প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই পটভূমিতে দুই দেশের সম্পর্কের বিবর্তনকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তিস্তা চুক্তি, স্থল সীমান্ত সমস্যা এবং বাণিজ্য ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ যে বিষয়গুলি দাঁড়িয়ে আছে, বর্তমান গবেষণায় তা অনুপুঙ্খ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.১ তিস্তা চুক্তি

৩.১.১ তিস্তার উৎপত্তিস্থল

ভারতের উত্তর রাজ্য সিকিমের অন্তর্গত ৭০৬৮ মিটার উঁচু পর্বত শিখরের জোড়া হ্রদ থেকে তিস্তার উৎপত্তি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুলি জেলা হয়ে সেই মুখ বাংলাদেশের তিস্তামুখ ঘাটে মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র খাতে পড়েছে। তিস্তা নদী ভারতের সিকিম রাজ্যের উত্তরাংশের কানসি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন। তিস্তা নদী ছাঙ্গু, ইউমথাং ও ডোংকিয়া লা পর্বতশ্রেণি থেকে উৎপন্ন ছোটো ছোটো নদীর জলে পুষ্ট। সিকিমের রংপো ও পশ্চিমবঙ্গের তিস্তাবাজারের মাঝের অংশে তিস্তা উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করে। তিস্তা সেতুর ঠিক আগে তিস্তা তার প্রধান উপনদী রঙ্গিতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখান থেকে তিস্তার গতি দক্ষিণমুখী। সেবকের সেতু পেরিয়ে তিস্তা পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। তিস্তা প্রায় ১৫১ কিলোমিটার সিকিম, প্রায় ১৪২ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গ ও প্রায় ১২৪ কিলোমিটার বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুমারগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪১০ থেকে ৪৫০ কিলোমিটার। এই নদীর ঢাল প্রতি কিলোমিটারে ৪ থেকে ৩৫ মিটার। স্রোতের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৬ মিটার।

বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক এই নদীর বিচিত্র ও বহুবিধ স্থানীয় নাম। সিকিমের আদি জনজাতি ও লেপচারা একে ডাকে টি-সা-থা নামে। সমতলে আসার পর সংস্কৃতভাষায় এই তিস্তা হয়েছে ত্রী স্রোতা, যার অর্থ স্রোতের তিনটি ধারা— পূর্ণভবা, আত্রেয়ী এবং করতোয়া। ১৭৮৭ সালের ব্যাপক বন্যার আগে, যে বন্যা ধরে নেওয়া হয় ভূমিকম্পের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত হয়, তার ফলে এই তিনটি স্রোত ধারার সঙ্গে তিস্তা তার সম্পর্কের চ্যুতি ঘটায় ও নতুন গতিপথ গ্রহণ করে। পুরাণ-মহাভারত-রামচরিতমানস, এমনকী চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর জবানীতেও করতোয়ার উল্লেখ আছে। দাপুটে ও দূরতিক্রম্য নদী হিসেবে যার পরিচিতি ছিল।

যে ৫৪টি নদী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তৃত, তিস্তা হল তাদের মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ। তিস্তা অববাহিকার সর্বমোট দৈর্ঘ হল ১২১৫৯ কিলোমিটার, যা ভারতের গোয়া রাজ্যের আয়তনের তিন গুণ। এর মধ্যে ২০০৪ কিলোমিটার, অর্থাৎ প্রায় ১৭ শতাংশ বাংলাদেশে ও বাকি অংশ ভারতে। ভারতের মধ্যেও এই নদীজলধারা বেশিরভাগ সিকিম রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। সারাবছর জুড়ে তিস্তার জলপ্রবাহের গতি হল ৬০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার।

তিস্তা নদী অববাহিকার জনঘনত্ব অতিমাত্রায় বেশি। ভারত-বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় ৩ কোটি মানুষ এই অববাহিকায় বাস করে। এর মধ্যে ২ শতাংশ সিকিমে, ২৭ শতাংশ উত্তরবঙ্গে এবং ৭১ শতাংশ উত্তর বাংলাদেশের জেলাগুলিতে বাস করে। এই ৩ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় ৭৮ শতাংশ বাস করেন গ্রামীণ এলাকায়। এই গ্রামীণ জনতা দারিদ্র্য, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও মানবসম্পদ উন্নয়নের যেসকল মাপকাঠি রয়েছে, তার সবকটিরই নিম্নভাগে বাস করে। ফলত নদীকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন-জীবিকা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য আবর্তিত হয়। তিস্তা এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আশা ও ভরসার প্রতীক।

৩.১.২ তিস্তা— উৎপত্তি, উৎস, বিতর্ক

তিস্তা অববাহিকায় ৯০ শতাংশ জনগণ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং কৃষিই অর্থনীতির অন্যতম নির্ধারক। যদিও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া এই এলাকায় গতি পায়নি, কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহারও অপ্রতুল এবং অভাবী বিক্রিই প্রধান। কৃষিকাজে নিযুক্ত মূলত প্রান্তিক এলাকার আদিবাসী জনজাতিসমূহ। কেন্দ্র ও নিম্ন অববাহিকায় এই নদীসংলগ্ন ভূভাগে দেড়ফসলি ও কোথাও কোথাও দুই ফসলি জমিও লক্ষ্য করা যায়। রাসায়নিক সার, পাম্পসেট, পাওয়ার টিলার ও কীটনাশকের ব্যবহার জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুরু হলেও জমির উর্বরতা হারানোর পরিমাণটিও সেইসকল এলাকায় লক্ষণীয়।

যে রাজ্য থেকে তিস্তার উৎপত্তি, সেই সিকিম রাজ্যে ২০১১ সালে সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে কৃষিকার্যে রাজ্যের GDP-র ৮ শতাংশ এবং সামগ্রিক শ্রমশক্তির ৬৯ শতাংশ নিয়োজিত। সিকিম সারা দেশের সর্বোচ্চ এলাচ উৎপাদক রাজ্য হিসেবে বিখ্যাত। এছাড়া এই রাজ্যে আদা, কমলালেবু, আলু ও বিভিন্ন প্রজাতির ফুল ও সবজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে উত্তরবঙ্গ দিয়ে তিস্তা প্রবাহিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১০ সালের Planning Commission-এর সমীক্ষা অনুসারে, এই বঙ্গের ৪৩ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। ধান, পাট, আলু ও চা এই এলাকার প্রধান উৎপাদন। এর মধ্যে বিশেষভাবে চা-এর প্রশ্ন আসবে, কারণ উত্তরবঙ্গের শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক চা-শিল্পে নিয়োজিত দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন চা বাগানে। বাংলাদেশের উত্তরভাগে, যেখানে তিস্তা প্রবাহিত হয়েছে, সেই এলাকার ২০১৬ সালের Asian Development Bank-এর সমীক্ষা অনুসারে ৪৫ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত এবং উৎপন্ন ফসলের চরিত্র উত্তরবঙ্গের মতোই। রংপুর জেলা ঐতিহাসিকভাবে তামাক উৎপাদনের জন্য খ্যাত। যদিও দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক NGO ও স্থানীয় ও রাজ্যস্তরের কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক প্রচারের ফলে তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ও ভুট্টা চাষ ও তাকে কেন্দ্র করে অনুসারী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিস্তা অববাহিকায় বহুল সম্ভাবনা রয়েছে মাছ চাষ ও তাকে কেন্দ্র করে রপ্তানি বাণিজ্যের বিকাশ ঘটানোর। যদিও উত্তর সিকিমে কিছু পরিমাণ স্থানীয় স্তরে ভেড়ি ও মাছ চাষের কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু পরিবহনের সমস্যার কারণে তার যথেষ্ট পরিমাণ বাণিজ্যিকীকরণ হয়নি। যদিও উত্তরবঙ্গে মাছের যথেষ্ট বাজার রয়েছে। কারণ এলাকার প্রায় ৪০ শতাংশ মাছ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসে। কিন্তু তবুও ভেড়ি ও মাছ উৎপাদন পরিকাঠামোর উপযুক্ত বিকাশ ঘটেনি। বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনেও মাছের উৎপাদন যথেষ্ট এবং ৯০ শতাংশ গ্রামীণ প্রান্তিক বিকল্প জীবিকার জন্য মৎস্যচাষের উপর নির্ভরশীল। লালমণির হাট জেলার তিস্তাবাজার একদা গুরুত্বপূর্ণ মাছের বাজার হিসেবে চিহ্নিত হত। বহু মৎস্যজীবী এই বাজারে সমবেত হতেন। যদিও কালক্রমে তিস্তার জল শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাষের পুরোনো কেন্দ্র হিসেবে রংপুর তার গৌরব হারিয়েছে।

তিস্তা অববাহিকায় কোনো ভারী শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। যদিও বাংলাদেশের রংপুর উত্তরবঙ্গের তুলনায় সিকিম অপেক্ষাকৃত শিল্প উন্নত এবং সেই রাজ্যের GDP-র ৫৫ শতাংশ শিল্পজাত

উৎপাদনের আয় থেকে আসে। যদিও এই শিল্প মূলত কৃষিভিত্তিক শিল্প ও হস্তশিল্প জাত উৎপাদন, যা ২০১৪ সালের ভারত সরকারের Planning Commission-এর তথ্য অনুসারে ভারতের সামগ্রিক GDP-র ০.২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কারখানার বেশিরভাগটি দক্ষিণবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট শিল্প উৎপাদন ইউনিটই মাত্র রয়েছে। একই অবস্থা লক্ষ করা যায় বাংলাদেশেও, যেখানে শিল্প, যোগাযোগ ও পরিবহনে বেশিরভাগ উন্নয়ন মূলত ঢাকা ডিভিশনকে কেন্দ্র করে এবং বঞ্চিত রংপুর সহ উত্তর বাংলাদেশ।

পরিষেবা ক্ষেত্রে বিকাশও তিস্তা অববাহিকাকে কেন্দ্র করে অনুকূল নয়। একদা সিকিমের GDP-র ৩৭ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের GDP-র ৫৮ শতাংশ এবং উত্তর বাংলাদেশের GDP-র ৪৯.৩৩ শতাংশ ছিল তিস্তাকে কেন্দ্র করে নৌবাণিজ্যের ফসল। গুরুত্বপূর্ণ এই নদীকে কেন্দ্র করে নৌ-পরিবহন ঐতিহাসিক কাল ধরে অর্থনীতির উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও জলধারার স্রোত শুকিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনাও বিলুপ্ত প্রায়। একই কারণে পর্যটন শিল্পের বিকাশও স্তিমিত। একমাত্র সিকিম ও দার্জিলিং পার্বত্য উপত্যকাকে কেন্দ্র করে পর্যটনে বিকাশ ঘটেছে, যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ পর্যটকের আগমন ঘটে সিকিম রাজ্য সরকারের তথ্য অনুসারে। উত্তর বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সীমান্তের দুই পারে এই অববাহিকাকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুবিপুল এবং এক শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন বাস্তুতন্ত্রের উপস্থিতি রয়েছে। মাটি ও বালি মাফিয়াদের দাপট তিস্তার অবনতির আরও একটি বড়ো কারণ। বালি ও মাটির বেআইনি খনন রোধ করে যদি তিস্তার জলধারার অবাধ প্রবাহকে সুনিশ্চিত করা যায় এবং সারাবছর ধরে এই নদী তীরবর্তী পরিবেশ ও প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করা যায়, তবে নিশ্চিতভাবে পর্যটন সহ অর্থনীতির বিকাশে তিস্তা নদী একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

৩.১.৩ তিস্তার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

পূর্বতন UPA সরকার ও বর্তমান NDA সরকার— দু-পক্ষই তিস্তা জলবণ্টন চুক্তিকে কেন্দ্র করে নিজস্ব সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছে। বিবাদমান দুই পক্ষ হিসেবে এখানে থেকেছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহবস্থান ও সমন্বয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার মধ্যে দিয়েই এই দুই শিবিরের মধ্যে বিনিময়ের দরজা খুলতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের সংহিতা অনুসারে নদী ও জলের প্রশ্নটি রাজ্য তালিকাভুক্ত। আবার কেন্দ্রীয় তালিকার ৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে জনস্বার্থে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তালিকার ১০ ও ১৪ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বৈদেশিক বিষয়ক ক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পূর্ণ করা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলত, সাংবিধানিকভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজন পড়ে না রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রার্থনা করার।

বাস্তবতা যদিও সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। UPA সরকারের বাধ্যবাধকতা ছিল মমতা ব্যানার্জি পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস দল। কারণ সেই দল ছিল ক্ষমতার শরিক। অপরদিকে BJP-শাসিত NDA সরকারের সেই বাধ্যবাধকতা না থাকলেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে আদর্শগত ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিয়ে এত বেশি মাত্রায় সচেতন যে, বহু ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও চৈনিক আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত বাংলাদেশকে এক বিশ্বস্ত মিত্র শক্তি হিসেবে দেখে। বাংলাদেশের সঙ্গে সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন, বিশেষত শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামি লিগের সঙ্গে মিত্রতা এই বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঢাকার অবস্থান ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা উত্তর-পূর্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগকারী ও পূর্ব দুনিয়ায় ভারতের প্রবেশদ্বার। বাংলাদেশের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে তাই কোনোভাবে বাংলাদেশের দাবিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, বিশেষত তিস্তা জলবণ্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে ফেলে রাখা।

বাংলাদেশের সঙ্গে এক সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জির সরকার জোরালোভাবে তিস্তা চুক্তির বিরোধিতা করেছে। প্রথম পর্যায়ে ৭০:৩০ অনুপাতে স্বীকৃত হলেও অর্থাৎ ৭০ ভাগ ভারতের আর ৩০ ভাগ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের, পরবর্তী পর্যায়ে ৪০:৪০:২০ (সিকিম-পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ) অনুপাতকে মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্পষ্ট যুক্তি হল, তিস্তার জল তাদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন এবং ব্যাপক প্রান্তিক চাষির জীবিকা ও সুরক্ষার সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত। এছাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সিকিম জল আটকে রাখায় বিশেষ বিশেষ ঋতুতে জলের স্রোত স্বাভাবিকভাবে কম থাকে। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং-এ প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিতে জলসেচের সঙ্গে তিস্তা যুক্ত। পূর্বে উল্লিখিত খসড়া চুক্তি অনুসারে জলবণ্টন কৃষিকার্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, বিশেষত উত্তরবঙ্গে বোরোধানের চাষ সমস্যার মুখে পড়বে, যে চাষে প্রভূত জলের ব্যবহার হয়।

যদিও এক্ষেত্রে অন্য কারণও বিদ্যমান। তিস্তার জল যদি বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে পায়, তবে তা মমতা ব্যানার্জির এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী রাজনীতিতে সুখকর হবে না। কারণ, উত্তরবঙ্গে এই সকল জেলাগুলির প্রায় ৩০ শতাংশ আদিবাসী ও সংখ্যালঘু কৃষক। আবার অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা এক বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু ঠাঁই করে নিয়েছে উত্তরবঙ্গে। এই এলাকায় এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাড়োয়ারি, নেপালি ও গোর্খা জনজাতির বাস, ব্যবসা ও জীবিকার স্বার্থে যারা উত্তরবঙ্গে বসতি তৈরি করেছে। ঐতিহাসিকভাবে বাম দুর্গ পরবর্তীকালে BJP-র শক্ত ঘাঁটি হওয়ার ফলে এই এলাকা তৃণমূল দলের রাজনৈতিক প্রভাবে সেভাবে থাকেনি। ২০১৭ সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেপালি ও গোর্খাদের সমর্থন নিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। উল্লেখিত জনজাতির বেশিরভাগ অংশ মমতা ব্যানার্জির তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণ নীতির বিরোধী। মুসলিম পরচিতি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহযোগিতার নীতি এই সকল

জনজাতির ক্ষেত্রে কীরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, এই রাজনৈতিক সমীকরণই তৃণমূল কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বকে তিস্তার জলবণ্টন ও তিস্তা চুক্তি রূপায়ণে সুদৃঢ় অবস্থান নিতে দেয়নি।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে BJP-শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারও সাংবিধানিক বৈধতা থাকা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার কারণে এই চুক্তি রূপায়ণে সক্ষম হয়নি ও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধিতাকে বলপূর্বক সমাধান করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের এক দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে এবং একইসঙ্গে শিলিগুড়ি করিডরকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই এলাকার সঙ্গে নেপাল, বাংলাদেশ ও ভূটানের সীমান্ত রয়েছে এবং অনতিদূরত্বে অবস্থান করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। দ্বিতীয়ত, যে রেলপথ এই শিলিগুড়ি করিডরকে ছুঁয়ে বিস্তৃত, তা উত্তর-পূর্ব ভারতের সামরিক রসদ সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম। তৃতীয়ত, এই এলাকা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল বৈচিত্র্যসম্পন্ন জনজাতি সমূহের বাস এবং ঐতিহাসিক নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান। চতুর্থত, এক বিপুল পরিমাণ নেপালি ও বাংলাদেশি মানুষের স্রোত জীবন ও জীবিকার কারণে এই এলাকাকে ভিত্তি করে প্রতিদিন আসাযাওয়া করে। পঞ্চমত, পরিবেশগত কারণে এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ— অতিমাত্রায় বন্যা ও খরা দুইয়ের প্রভাব এই এলাকায় দেখা যায়, যা তিস্তার জলধারাকে প্রভাবিত করে থাকে।

বহুবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে বর্তমান রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বাংলাদেশি হিন্দুদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন, যাকে কেন্দ্র করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করেছে (CAA)। একে কেন্দ্র করে এক মেরুকরণের পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়, যার রাজনৈতিক উষ্ণতা বর্তমান সময়েও বিদ্যমান। BJP-র অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের এবং এই অভিযোগের বিরোধিতা করতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি যেহেতু এক সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী ভাবমূর্তি নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন, তেমনই উদ্যোগী হয়েছেন অন্য সমস্ত নিপীড়িত জনজাতি সমূহের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করার। তিস্তার জলবণ্টনের প্রশ্ন যেহেতু উত্তরবঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক ভূমিপুত্রদের অগ্রাধিকারের সঙ্গে যুক্ত, সেহেতু তাকে উপেক্ষা করা নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে এই দাবির শরিক যে, তারা তিস্তার জল উপযুক্ত পরিমাণে পাবার অধিকারী। বছর বছর খরা ও বন্যা এবং তিস্তার উৎসমুখে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যথেচ্ছ পরিমাণে বাঁধ নির্মাণ এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়েছে। নদীগুলিকে যুক্ত করার ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা, তার ফলে তিস্তার জলধারা পশ্চিমে মহানন্দায় প্রবাহিত হতে পারে, বাংলাদেশ এর বিরোধী। ৪০:৪০:২০ অনুপাতে জলবণ্টনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ বার বার প্রতিশ্রুত দাবি আদায় করতে চেয়েছে।

বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনে তিস্তা প্রধানতম নদী। রংপুর বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা, যেখানে দারিদ্র্যের হার ৪২.৩ শতাংশ, World Food Programme Bangladesh Burean of Statistics-এর তথ্য অনুসারে। বৃহত্তর রংপুর ঐতিহাসিকভাবে খরাপ্রবণ এলাকা এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ যে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়, তার প্রভাব পড়েছিল এই জেলাতেও। এর সঙ্গে রাজনৈতিক অবহেলা, যোগাযোগের অপ্রতুলতা ও বাজারের সঙ্গে দূরত্ব এই জেলার মানুষের দুর্দশাকে আরও বাড়িয়েছে।

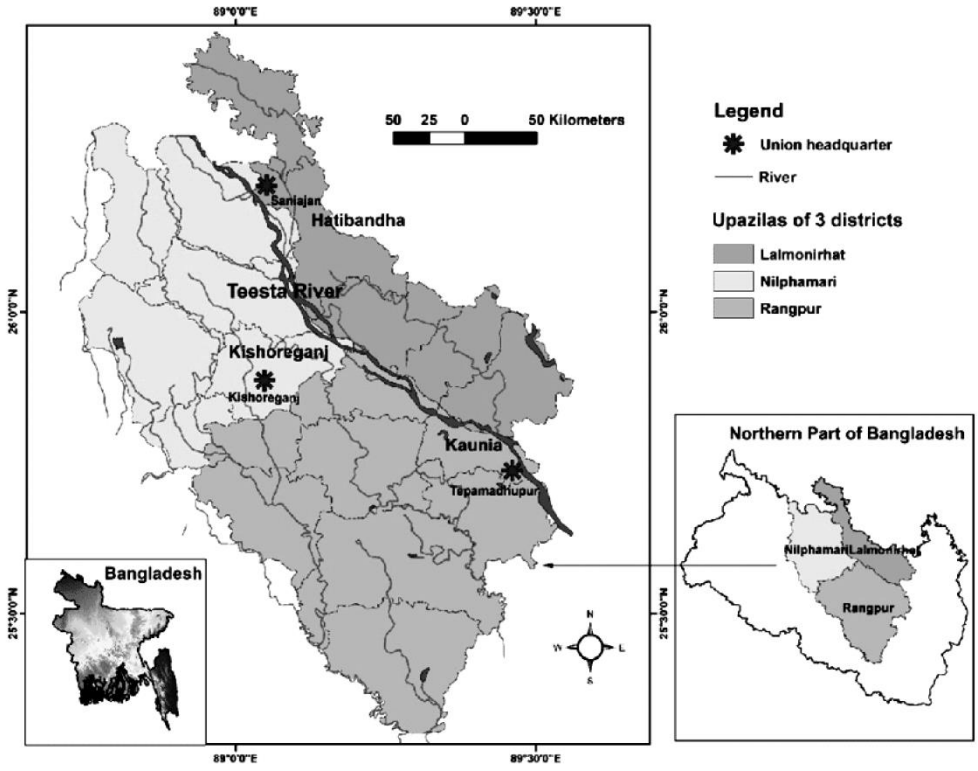

বাংলাদেশে তিস্তা অববাহিকা (রংপুর ডিভিশন)

এই দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থা সত্ত্বেও রংপুর ডিভিশন বাংলাদেশের শস্যাগার হিসেবে চিহ্নিত। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে ধান, পাট, আলু, ভুট্টা ও বিবিধ সবজি উৎপন্ন হয়। বৃহত্তর বাংলাদেশে যেখানে ধানই অর্থনীতির প্রধান উৎপাদন, সেখানে রংপুর ডিভিশনে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য রয়েছে। বাকি বাংলাদেশের অন্য এলাকার তুলনায় এই এলাকা মোটেই আর্সেনিক প্রবণ নয়, ফলত, তিস্তার জলের এক বিপুল চাহিদা রয়েছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের তুলনায় রংপুর ডিভিশন যেহেতু দীর্ঘ অবহেলার স্বীকার, ফলত সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানো, মজবুত শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং বাজারের বিস্তার—সবক্ষেত্রেই অবহেলা রয়েছে ও সরকারি দায়বদ্ধতার অভাব স্পষ্ট। এই শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা বিবিধ অসামাজিক কার্যকলাপের জন্ম দিয়েছে। চোরাকারবারের বিকাশ ঘটেছে এবং সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই ডিভিশন। জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (JMJB) এবং হরকত-ই-উল জেহাদ আল ইসলামি বাংলাদেশ (HUJI-B)-এর কার্যকলাপ বহুক্ষেত্রে রংপুরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

অর্থনীতির এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ যাতে গড়ে উঠতে পারে এবং উত্তর বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব হয়, সামাজিক স্থিতি ও সংহতি রক্ষা করা যাতে সম্ভবপর হয়, তার জন্য বাংলাদেশ চেয়েছে তিস্তার জলের স্রোতকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের পক্ষপাতমূলক অবস্থান ও সংকীর্ণ চিন্তার বিরুদ্ধে তিস্তার জলের প্রশ্ন বাংলাদেশের মানুষের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ আবেগ ও সংবেদনশীলতার প্রশ্ন। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সরকারের থেকে প্রতিশ্রুত দাবি আদায় করতে অক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশে সমস্ত স্তর ও শ্রেণির মানুষের কাছে সমালোচনার সম্মুখীন হন। বাংলাদেশের নির্বাচনে তিস্তা ইস্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু হিসেবে চর্চিত হয় এবং মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আওয়ামি লিগের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজনে তিস্তা ইস্যুর স্থায়ী সমাধান জরুরি।

ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ও আয়তনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, তিস্তায় উপযুক্ত জলপ্রবাহ বোধহয় একমাত্র বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য একান্ত জরুরি। যদিও বাস্তবতা এটাই যে, বাংলাদেশের উপর ভারতরাষ্ট্র বিবিধ কারণে নির্ভরশীল, এমনকী তার জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি বাংলাদেশের সুরক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুটি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে দিয়ে ভারতরাষ্ট্রের ভৌগোলিক যোগাযোগ। এই ভৌগোলিক দুর্গমতাই উত্তর-পূর্বকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক সংহতির চেহারা, রাজনীতির ভাষ্য— সবটাই অনেক আলাদা। মূলধারার রাজনীতি এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে উত্তর-পূর্বকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া বেশ কিছু বছর ধরে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী এবং বাংলাদেশের বন্দরগুলির মাধ্যমে উত্তর পূর্বের সমুদ্র ও নৌবাণিজ্য সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই জন্যই সীমান্ত এলাকা জুড়ে বহুবিধ Transit Point তৈরি করেছে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে চট্টগ্রাম-মংলা-পায়রা বন্দরকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হচ্ছে বেশিরভাগ ধর্মীয় মৌলবাদী ও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বিভিন্ন গ্রুপ ও শাখার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা। ভারতের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে এই উদ্যোগ শক্তিশালী করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ ভারতের মূল ভূখণ্ডে যে সকল শক্তিগুলি সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করার প্রয়াসকারী সেই সমস্ত দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও ড্রাগ সহ অন্য চোরাচালানকে প্রতিহত করেছে বাংলাদেশ সরকার। একইসঙ্গে দুই দেশে সীমান্তরক্ষীবাহিনী যৌথভাবে কাজ করে নিয়ন্ত্রণ করছে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি।

অস্থিতিশীল দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিতে বাংলাদেশ সরকার ভারতের এক বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে কাজ করছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের Act East নীতির রণনৈতিক মিত্র হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশি বন্দরসমূহের মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারে

ভারতের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নিকটবর্তী সময়ে রোহিঙ্গা সমস্যা যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, তখন বাংলাদেশ তার সমস্ত উদ্যোগসহ এই সমস্যা সমাধানে পাশে থেকেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় চৈনিক অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশের মিত্রতা ভারতের কাছে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে সহযোগী করে চীন China-Pakistan Economic Corridor গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথচুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ তার সামরিক যুদ্ধাস্ত্রের এক বড়ো অংশ চীনের থেকে আমদানি করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ মিত্রতার গুরুত্ব যে আরও বৃদ্ধি পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের অনুপ্রবেশ এই এলাকার সামাজিক স্থিতিকে বিপন্ন করে তুলতে পারে এবং সেই স্বার্থে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী মিত্রতা জরুরি, যা ঐতিহাসিক বন্ধনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর এই মিত্রতাকে যদি সুনিশ্চিত ও দৃঢ় করতে হয়, তবে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা পার করে তিস্তার জলবণ্টনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান জরুরি।

৩.১.৪ তিস্তা ইস্যুতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব : আন্তর্দেশীয় বিতর্কসমূহ

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিস্তা সম্পর্কিত বিতর্ক শুধুমাত্র ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন এই বিতর্কের অন্যতম ভাগীদার, তেমনই সিকিম রাজ্যের স্বার্থ ও উত্তর বাংলাদেশ, বিশেষত রংপুরের স্বার্থ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কোনো সরল সমীকরণ দ্বারা তাই তিস্তাকে কেন্দ্র করে স্বার্থের সংঘাতকে দুই রাষ্ট্রের সংঘাত বলে তকমা দেওয়া কখনোই বাস্তবসম্মত নয়। কারণ একাধিক কায়েমি স্বার্থ ও জটিলতা ও পরস্পর বিরোধিতা এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই দেশকেই ঘিরে রয়েছে।

২০১১ সালে এই চুক্তি রূপায়ণে ব্যর্থতার পর এমন নয় যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোনাপ্রকার টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। চুক্তি রূপায়িত না হবার কারণ হিসেবে কিছু বিবাদের ক্ষেত্র নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তা ছিল সাময়িক। বৈদেশিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে তার নিজের গতিতে অব্যাহত থাকে। কারণ এই সময়ে জমির সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, পরিবহন, নৌ-পথ, শিক্ষা সহ বিবিধ ক্ষেত্রে বহুবিধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটা মনে করা হতে থাকে যে, তিস্তা চুক্তি সম্পূর্ণ না হবার প্রশ্নটি অনেকটাই একটা 'স্পিডব্রেকার'-এর মতো, যা ছাড়া বাকি সমস্ত কিছু সুষ্ঠ গতিতে চলেছে। সর্বোপরি দুই দেশের কেন্দ্রীয় সরকারই তাদের বৈদেশিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের সুস্বাস্থ্যের কারণে ও দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তীব্র বিরোধিতার কারণে ভারত সরকারের পক্ষে তিস্তা চুক্তির সম্পাদনা সম্ভব হয়নি। যদি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সাংবিধানিক অনুমোদন রয়েছে রাজ্যকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের কারণে তা সম্ভব হয়নি। চুক্তি সম্পাদন না

হওয়ার ফলে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হলেও একাধিক কারণে ভারত সরকার বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। এর কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তিস্তার উচ্চ অববাহিকায় এবং একইসঙ্গে ভারত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে বাংলাদেশের তুলনায় অনেক শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘসূত্রীতার পরিবেশ তৈরি করা ভারতের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক। বাংলাদেশ যেহেতু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সীমান্তের অংশীদারিত্ব ভোগ করে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যেহেতু ভারতের প্রয়োজন বাংলাদেশের সহযোগিতা; তাই বাংলাদেশ বহুক্ষেত্রে কালবিলম্ব করে অন্যান্য চুক্তি রূপায়ণ পিছিয়ে দিতে চেয়েছে চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। যদিও দীর্ঘকাল ধরে এই দীর্ঘসূত্রীতার পরিবেশ তৈরি করা ও চাপ বজায় রাখা ছোটো রাষ্ট্র হবার কারণে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্র— ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ২০টির বেশি অধিক বিষয়ে চুক্তি হয়েছে— এই সকল চুক্তিতে সাহায্য, ঋণ ও অনুদানের প্রশ্ন যুক্ত, যা উপেক্ষা করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

চতুর্থত, তিস্তা চুক্তিকে কেন্দ্র করে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধিতা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রশ্নে সমস্ত রাজনৈতিক পক্ষ একই সমসত্ত্বে অবস্থান করে। ভারত তার ভূ-রাজনৈতিক শক্তির কারণে নিজস্ব বাধ্যবাধকার দ্বারা বাংলাদেশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে।

যদিও এইসকল যুক্তিকাঠামো সত্ত্বেও এই নিয়ে সমস্যার কোনো অবকাশ নেই যে দক্ষিণ এশিয়ায় দুই দেশের মজবুত সম্পর্কের জন্য এই চুক্তির রূপায়ণ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত এবং তার জন্য দুই দেশকেই এই চুক্তি রূপায়ণের পথে যেসকল রণনীতিগত ও রণকৌশলগত বাধা রয়েছে তাকে দূর করতে হবে। ভারত সরকারকে শুধু মৌখিকভাবে নয়, কাজেও নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে এবং তার জন্যে বিবদমান সবকটি পক্ষকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিকিম সহ বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নিয়ে আসতে হবে আলোচনার টেবিলে। বাংলাদেশের কাছেও এই চুক্তি রূপায়ণ জীবনমরণের প্রশ্ন, কারণ এর রূপায়ণ না হলে বাংলাদেশের এক অঞ্চল উষর মরুভূমিতে পরিণত হবে। জমি হবে বন্ধ্যা, কৃষি অর্থনীতি হবে বিপর্যস্ত।

প্রকৃতি তার নিজের খেয়ালে যে ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে এবং তার জমিতে রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ দেশে যে সীমানা নির্ধারণ করেছে, তাতে এটা খুব স্বাভাবিক যে, কোনো দেশ নদীর উচ্চ অববাহিকায় তার ভূখণ্ড লাভ করবে ও কোনো দেশ নদীর সমতলে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক হবে, যদি ভৌগোলিকভাবে উচ্চ ভূখণ্ডে নিজ সীমানা লাভ করার ফলে নদীর জলধারাকে কেউ প্রভাবিত করে ও বঞ্চিত করে অন্যকে। বাংলাদেশের দিক থেকে বলা যায়, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ভারতকে প্রভাবিত করার তারও কতকগুলি শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে,

যা সে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, ভারতের উপর বাধ্যবাধকতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে এবং অন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের সূচনার মধ্যে দিয়ে ভারতকে চুক্তি রূপায়ণে বাধ্য করতে পারে।

অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক ও দ্বিপাক্ষিক স্তরে যে সকল অংশীদার তিস্তা চুক্তির রূপায়ণ করতে পারে, সেগুলি ছাড়াও যে এক গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় পক্ষ এই চুক্তি সম্পাদনে ভূমিকা নিতে পারে, তা হল নাগরিক সমাজ, পরিবেশবিদ, শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষজন, প্রযুক্তিবিদ, কর্পোরেট ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীরা। যদিও এযাবৎকাল দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এদের অংশগ্রহণ স্তিমিতই থেকেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের শক্তিশালী ক্ষমতা নেই। Warner and Zawahri মনে করেন, এই সকল অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষগুলি যেকোনো রাজনৈতিক খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং তাদের বিশেষ জ্ঞান যোগাযোগ দক্ষতা ও অ-রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শক্তির ভারসাম্যকে বদলে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় অধিবাসী ও বাঁধবিরোধী আন্দোলনকারীদের চাপের ফলে বাতিল হওয়া বেশ কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা। যদিও তিস্তা চুক্তিতে এই সকল অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ এখনও ঘটেনি, কিন্ত নদীর স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে তাদের অংশগ্রহণ হয়তো আগামী দিনে জরুরি হয়ে পড়বে। ভারতের দিক থেকে বলা যায়, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রূপায়ণে এই দেশে বিভিন্ন পক্ষে যে অ-সমসত্ত্ব অবস্থান রয়েছে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে এই অ-সরকারি সংস্থাগুলিই।

৩.১.৫ জীববৈচিত্র্য ও জনজাতিসমূহ

তিস্তার অববাহিকা জুড়ে এক বৈচিত্রপূর্ণ জনজাতি সমষ্টির অবস্থান, অতিমাত্রায় প্রান্তিক ও গ্রামীণ এই কৃষিভিত্তিক জনজাতিসমূহ অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মধ্যে দিয়ে জীবিকা সংগ্রহ করে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের অফুরন্ত উৎস থাকা সত্ত্বেও বাজারের উপযোগী হিসেবে তার ব্যবহারযোগ্যতা নেই। ফলত নদীমাতৃক জীবনের উপর এখানকার মানুষের অস্তিত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রায় ১২,০০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি দীর্ঘ এই অববাহিকা জুড়ে বিবিধ ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। ধীরে ধীরে ফল্গু ধারার মতো একটি শিক্ষিত নাগরিক সমাজ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে গড়ে উঠেছে, যার ফলে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত কী ও এখানকার মানুষের দাবিসমূহই বা কী, তা স্পষ্ট ও লিখিত আকারে সামনে আসছে। আমার গবেষণায় আমি চেষ্টা করেছি এইগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে গ্রন্থিত করার।

উত্তর সিকিম থেকে কুঁড়িগ্রাম পর্যন্ত স্থানীয় মানুষজন অত্যন্ত সংশয়ী বড়ো বাঁধ ও ব্যারেজের প্রভাব নিয়ে এবং একইসঙ্গে ভীত, কারণ তারা জানে না এই বাঁধ ও জলাধার নদীর স্বাস্থ্য ও বাস্তুতন্ত্রের প্রশ্নকে উপেক্ষা করেই গড়ে উঠেছে। বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন উত্তর সিকিমে অত্যন্ত শক্তিশালী, কারণ বেশিরভাগ বাঁধ সেখানেই তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত উপেক্ষা করে। নিম্ন অববাহিকার লোকজন গাজলডোবা ও ডালিয়া জলাধার সম্পর্কে সমালোচনায় অত্যন্ত মুখর। বাঁধের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ

সম্ভব হবে বলে যারা মনে করেছিলেন, তাদের বেশিরভাগই এখন নদীর স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সমস্যা নিয়েই অধিক ভাবিত।

বেশ কিছু সময় ধরে বলা যায়, আগের দশকগুলিতে স্থানীয় মানুষজন নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন আবহাওয়ার দ্রুতগতির পরিবর্তন। উষ্ণতাবৃদ্ধি পাওয়া, ঋতুর সময় পরিবর্তন, নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও বর্ষার উপস্থিতি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি তিস্তা অববাহিকায় এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছ বাঁধ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন আরও গতি পেয়েছে। স্থানীয় মানুষজন যেহেতু বেশিরভাগই কৃষিজীবী, ফলে কৃষি নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং উন্নত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এই আবহাওয়ার মধ্যে স্থানীয় মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। যদিও স্থানীয় আদিবাসী ও নদীকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা জনজাতিসমূহ বহুক্ষেত্রে তাদের সহজাত জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেন, তাদের চারপাশে কী কী পরিবর্তন হয়ে চলেছে— জলস্রোতের গতি, বনজ পশুদের আচরণ, বাতাসের গতি— এগুলি তাদের বুঝতে সাহায্য করলেও দিনের পর দিন পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এই বিধ্বংসী পরিবশকে কীভাবে রোধ করবেন তার কোনো সহজ উপায় তাদের জানা নেই। কৃষক-মৎস্যজীবী ও নদীকেন্দ্রিক জঙ্গলের উপর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা মানুষজন দিনে দিনে আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে চলেছেন।

এই অঞ্চল জুড়ে এক বৈচিত্র্যসম্পন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণ হয়েছে বহু শতাব্দী জুড়ে, যদিও এই সমাজ ও সংস্কৃতি বার বার খণ্ডিত হয়েছে রাজনীতির বিচিত্র গতির পরিবর্তনের নিরিখে। দেশভাগ ও বিভাজন ৭০-এর দশকে তরাই ও নকশাল আন্দোলন এই অঞ্চলে এক উত্তেজক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল, যার ফলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও প্ররোচনা বাড়তে থাকে। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হওয়ায় রাষ্ট্রের পক্ষে এই অঞ্চলকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, যদিও এর ফলে স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অসম বিকাশ ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণে এক বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ও পরিযায়ী মানুষের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে সীমান্ত পেরিয়ে অনিশ্চয়তার সন্ধানে যাত্রা। এর ফলে এক মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থানে। ২০০৪ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২০ লক্ষ ও ৫০ লক্ষ। ২০১৭ সালের হিসাব অনুসারে এই সংখ্যা সারা দেশে ছিল প্রায় ২ কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যা খুব স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চলতি জনবিন্যাসকে পরিবর্তন করেছে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, তিস্তাকে কেন্দ্র করে যদি স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটত এবং পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে যদি উন্নয়নের রথে সওয়ার না হত আধুনিক রাষ্ট্র, তবে এই অনুপ্রবেশের গতি বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব ছিল।

তিস্তা অববাহিকায় বহু স্থানীয় অধিবাসী মনে করেন যে, তিস্তাকে কেন্দ্র করে যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, তাতে এবং মূলধারার গণমাধ্যমে তাদের স্বার্থ ও চুক্তির দাবিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। স্থানীয় নাগরিক

সমাজ থেকে গড়ে ওঠা বহু সংগঠন তিস্তা অববাহিককার জীববৈচিত্র্যর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুবিধ প্রশ্ন সচেতনতামূলক প্রচার রূপে বার বার হাজির করেছেন কিন্তু তিস্তা সম্পর্কিত চুক্তির খসড়ায় তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। ২০১৩ সালে Asia Foundation এই বিষয়ে একটি সমীক্ষা করে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে, স্থানীয় মানুষজনের পরামর্শ গ্রহণের উদাসীনতা ও সমস্যা সম্পর্কিত স্থানীয় মতামতকে উপেক্ষার ফলে তিস্তা চুক্তির খসড়া বহুল অংশে অসম্পূর্ণ।

এর ফলস্বরূপ দুই পারের সাধারণ মানুষই মূলধারার মিডিয়ার দ্বারা প্রচারিত যে রাজনৈতিক ভাষ্য তার দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবিত হন এবং এই অসন্তোষের জমিতে নিশ্চিত হয়ে চলেছে তিস্তার স্বাভাবিক মৃত্যু। এটা সর্বৈব সত্য যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তিস্তার জীববৈচিত্র্য ও সামাজিক, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক প্রশ্নগুলি কখনোই আলোচনায় আসে না। যা সম্ভব হলে একাডেমিক চর্চার বাইরে গিয়ে তিস্তা ইস্যু ও তার সমাধান প্রকল্প একটি জীবন্ত রূপ নিতে পারত।

৩.১.৬ তিস্তা ও ভূ-গর্ভস্থ জলের প্রশ্ন

তিস্তা অববাহিকায় ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ ও সামগ্রিক রেখা চিত্রটির ছবি এখন পর্যন্ত স্পষ্ট আকারে সরকারি বা বেসরকারি তথ্যভাণ্ডারে নেই। এমনকী তিস্তার খসড়া চুক্তিতেও এই ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ ও তার ব্যবহারযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো আলোচনা লক্ষ করা যায় না। তিস্তার উৎপত্তি সিকিম রাজ্যে, যেখানে তিস্তার উপরিত্বক পার্বত্য; আবার উত্তরবঙ্গ ও উত্তর বাংলাদেশে এই ত্বক পলিমাটির, যার সঙ্গে গাঙ্গেয় সমতলভূমির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পার্বত্য ভূ-ত্বক থেকে জল সংগ্রহ যথেষ্ট কঠিন, যদিও পলি মাটি যুক্ত সমতলভূমির তুলনায় এই এলাকায় জলের পুনঃনবীকরণ প্রক্রিয়া সহজ। যদিও এই সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা এখনও সম্ভব হয়নি।

তিস্তার মধ্য ও নিম্ন অববাহিকায় ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার বহুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়। সেবক থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত এলাকায় কূপ খননই হল পানীয় জল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র ভরসা। বোল্ডার ও নুড়ি-পাথরের প্রাধান্যের কারণে নলকূপ খনন বহুক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, যদিও এই এলাকার জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে তিস্তা যে এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেই এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার বেশি, যার ফলে জলস্তর অতি দ্রুত কমছে। টিউবওয়েলের ব্যাপক ব্যবহার ও বোরো চাষ এই ব্যবহারকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে দিনকে দিন। ২০০৪ সালের একটি সমীক্ষা এই এলাকার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং ঘরোয়া ও চাষের কাজে তার ব্যবহারযোগ্যতা কীভাবে সুনিশ্চিত করা যায়, তা নিয়ে সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও নীতি প্রয়োজন। অনিয়ন্ত্রিত জলের ব্যবহারের কারণে

পলিমাটির পরিমাণও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে চলেছে, যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক, কারণ এই পলিমাটির সঞ্চয় গড়ে উঠেছে শত শত বছরের প্রাকৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে। ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমে যাবার বিষয়টি যেহেতু আমাদের চোখের আড়ালে সংঘটিত হয়, তাই এ সম্পর্কে সচেতনতাও নিম্নমানের, যা আগামী দিনে এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটকে ডেকে আনতে পারে। নদী শুকিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কত দ্রুত তা মেরামত করে তাকে পূর্বের অবস্থায় আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব, তাই এখন দেখার। আর তা যদি করতে হয়, তবে সংকীর্ণ রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত আমাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনে।

৩.১.৭ তিস্তা অববাহিকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন

সামগ্রিকভাবে এই এলাকা যেমন একদিকে অসম্ভব জীববৈচিত্র্যসম্পন্ন, তেমনি অন্যদিকে ভূমিকম্পন, খরা ও বন্যার প্রাদুর্ভাব এই এলাকায় প্রায়শ ঘটে থাকে, বিগত দশকগুলিতে যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল নদীর জলস্রোতের উপরিভাগে বড়ো বাঁধ নির্মাণ।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী সময় ধরে হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকা ও 'তিব্বতায়ন প্লেট' সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অর্থাৎ ১৯৭০-১৯৯০ দশকের মধ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর ফলে পার্বত্য হিমবাহগুলি গলতে শুরু করেছে, যা বার বার অতিমাত্রায় বন্যার জন্ম দিয়ে চলেছে। হিমবাহ গলনের ফলে নতুন নতুন পার্বত্য হ্রদ তৈরি হয়েছে। এই হ্রদগুলি অতি দ্রুত জমে যায়, গলতেও শুরু করে অতি দ্রুত। যার ফলে নদীর নিম্ন অববাহিকায় বার বার বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিস্তার ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ তিস্তার উৎপত্তি হিমবাহ থেকেই। তাপমাত্রার বৃদ্ধি যেমন গোটা অববাহিকতার সামগ্রিক এলাকা জুড়ে লক্ষ করা যায়, তেমনই লক্ষণীয় বৃষ্টিপাতের তারতম্যের পরিমাণও। অতিমাত্রায় বৃষ্টি যেমন ভূমিক্ষয়ের জন্ম দিচ্ছে, তেমনই নদীর উচ্চ অববাহিকায় বার বার তৈরি হচ্ছে পার্বত্য ধ্বস। যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে, তবে খুব স্বাভাবিক নিয়মে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ, কারণ এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে একদিন হিমবাহগুলি বিলুপ্ত হবে। এই বিলুপ্তির যে প্রভাব মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পড়বে তা কল্পনাও করা যায় না।

যা সব থেকে চিন্তার তা হল ভূমিক্ষয়, হিমবাহ গলন, পার্বত্য ধ্বস, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অতিমাত্রায় বৃষ্টি ও খরা সম্পর্কে সামগ্রিক বহুবিধ গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ ও প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কিত কোনো আলোচনা তিস্তার জলবণ্টন সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির খসড়ায় লক্ষ করা যায় না। যা লক্ষণীয়, তা হল এর পরও অনিয়ন্ত্রিত আকারে বাঁধের নির্মাণ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির এই প্রশ্নে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে, দুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থান পৃথক হতে পারে, কিন্তু জীবন, পরিবেশ, প্রকৃতি সহ জীববৈচিত্র্যে যে বিপুল ক্ষয় এই পুরো সময় জুড়ে হয়েছে, তা রোধ করতে না পারলে প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী।

৩.১.৮ ২০১১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে চুক্তি কার্যকর না হওয়া

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আসেন। শেখ হাসিনা ভারত সরকারের কাছে ছয় দফা দাবিপত্র পেশ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের দাবি, তিস্তা নদীর জলের সুষ্ঠ বণ্টন। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের তিনটি জেলা রংপুর, লালমণির হাট এবং গাইবান্ধা হল বাংলাদেশের প্রধান শস্য ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য স্থান। এই তিন জেলা বাংলাদেশের ৬৩ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন করে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে দুই দিন ব্যাপী ৩৭তম মন্ত্রীপর্যায়ে যৌথ নদী কমিশনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বরে। যৌথ নদী কমিশনের আলোচনা ফলপ্রসূও হয়, যার প্রেক্ষিতে ঠিক হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের বাংলাদেশ সফরে ভারত-বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সীমান্ত বিরোধ এবং তিস্তার জলবণ্টনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে চুক্তি সম্পূর্ণ হবে। কারণ হাসিনা সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সে দেশে ভারতবিরোধী শক্তিগুলির উপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছিল বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের জোট সরকার। এই তিস্তার জলবণ্টন চুক্তির খসড়াও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১-য় ঢাকায় গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তিস্তার জলবণ্টন চুক্তিতে সিলমোহর লাগাতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছিল দুই দেশের রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে কূটনৈতিক মহল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে চুক্তি করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে ভারত সরকারের বিদেশ নীতি সংকটের মুখে পড়ে। এই সংকটকে এড়ানোর জন্য তৎকালীন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন সহ কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ২০১১ সালের ১ সেপ্টেম্বর মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। মমতা-শিবশঙ্কর মেনন বৈঠকেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় উদ্বেগের মীমাংসা হয় এবং অবশেষে তিনি খসড়া চুক্তিকে অনুমোদন দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে মমতাদেবীর উদ্বেগের বিষয়টি ৩১ আগস্ট ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী দীনেশ ত্রিবেদী আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিস্তা চুক্তির বিরুদ্ধে নন। কিন্তু এই চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গে যাতে জলের সংকট দেখা না দেয়, সে বিষয়টি কেন্দ্রকে নিশ্চিত করতে হবে। তখনই ঠিক হয়, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন কলকাতাতে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর ৩ সেপ্টেম্বর শ্রী পবনকুমার বনশল ঢাকা যাবেন। সেখানে দুই দেশের যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে এই চুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং ৬ সেপ্টেম্বর মনমোহন সিং মমতা ব্যানার্জিকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করবেন। চুক্তির খসড়া অনুযায়ী বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ভারতের গাজলডোবায় তিস্তার প্রবাহিত জলের পরিমাণ হিসাব করে দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টন করা হবে। ৪৬০ কিউসেক হারে জলের

সঞ্চয় রেখে বাকি জলের ৫২ শতাংশ নেবে ভারত এবং ৪৮ শতাংশ বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ দাবি জানায় তিস্তার জল সমানভাবে ভাগ করার জন্য। তবে ৫২-৪৮ শতাংশ জলবণ্টনের ভিত্তিতেই ১৫ বছর মেয়াদি একটি অন্তবর্তীকালীন চুক্তির কথা বলা হলেও পরবর্তী সময়ে তিস্তার জলের প্রবহমানতা পর্যবেক্ষণ করে একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা হবে স্থির করা হয়।

দীর্ঘ ১২ বছর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন। তার ফলে বাংলাদেশ তার অন্যতম প্রধান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের শাসনের পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের প্রধান আসছে বলে রেড কার্পেট সাজিয়ে প্রস্তুতির আয়োজন করে। ঠিক এই সময়ে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বাংলাদেশ সফরে যাবেন না বলে উল্লেখ করেন। পরে জানা যায়, রাজ্যের মুখ্যসচিব সমর ঘোষ মারফত প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি প্রস্তাবিত ভারত-বাংলাদেশ তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি করতে সম্মত নন। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি বাংলাদেশ বিরোধী নন, কিন্তু রাজ্যবাসীর স্বার্থ তার কাছে অগ্রাধিকার। তিনি আরও জানান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেননের সঙ্গে বৈঠকে ঠিক হয় তিস্তা থেকে বাংলাদেশকে ২৫,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হবে, কিন্তু চুক্তির চূড়ান্ত খসড়াতে ৩৩,০০০ কিউসেক জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষে দাবি করা হয়— রাজ্য যে পরিমাণ জল দিতে চেয়েছিল মেননের সঙ্গে বৈঠকের পর, রাজ্য সেই পরিমাণ জল দেওয়ার ব্যাপারে সহমত পোষণ করে। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়াতে তার থেকে বেশি পরিমাণ জল বাংলাদেশকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে তিনি তিস্তা চুক্তিতে তার অসম্মতি জানান। রাজ্যের তরফ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে লঙ্ঘন করেছে। রাজ্যের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই চুক্তির চূড়ান্ত খসড়াকে অনুমোদন দিয়ে তারপর রাজ্যকে জানানো হয়েছে।

২০১১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিস্তাচুক্তি করতে অসম্মতি জানান। এই অবস্থায় ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে শিবশঙ্কর মেনন আবার মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মেনন মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝান, 'আগে চুক্তিটা হয়ে যাক, তারপর আপনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে আপনার আপত্তির কথা জানাবেন। বলবেন এতটা জল দেওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রীও আপনাকে চিঠি দেবেন। গোটা বিষয়টি তখন ঠিক হবে।' কিন্তু মমতা ব্যানার্জি রাজি হননি। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির সময় বলা ছিল না, কত পরিমাণ জল দেওয়া হবে বাংলাদেশকে। আগে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি সম্পূর্ণ হয়, তারপর জলের পরিমাণ ঠিক হয়। এতে রাজ্য সরকার কোনোরূপ বিরোধিতা করেনি। উলটে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। এরপর তৎকালীন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়রাম রমেশের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার অবস্থানে অনড় থাকায় জটিলতা কাটেনি।

এই ঘটনা যতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কে কোনো ফাটল না ধরায়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়। এরপর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চেষ্টা শুরু হয়, দ্রুত ভুল সংশোধন করে মমতা ব্যানার্জিকে আবার ঢাকায় পাঠানো, যে সফরে তিনি তিস্তাচুক্তিতে সম্মতি দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে

কোনোরূপ সংঘাতে যেতে আগ্রহী ছিল না। কারণ ইউপিএ-২ সরকারে সব থেকে বড়ো শরিক ছিল তৃণমূল। লোকসভাতে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের ক্ষেত্রে তৃণমূলের ১৯ জন সাংসদ ছিল। তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাধ্যবাধকতায় তিস্তা চুক্তি আটকে যায়। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এই পিছুটান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশ দপ্তরকে যে এক কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয়, যার ফলে বিরোধী দলগুলি, এমনকী বাংলাদেশও সমালোচনায় ভরিয়ে দেয়। যার ফলে বিদেশ দপ্তরের আমলা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মহল দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষের মত ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি অগ্রাহ্য করেই তিস্তাচুক্তি করা হোক। তাদের মতে, এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সম্মান কলুষিত হবে। বিভিন্ন মহল থেকে বলা হতে থাকে, আঞ্চলিক দলগুলি নিজের স্বার্থের কারণে দেশের সম্মান বিসর্জন দিচ্ছে। কারণ আঞ্চলিক দলগুলির কোনোরূপ বিদেশনীতিই নেই। তারা কেন্দ্রীয় সরকারেরও মুণ্ডপাত করতে ছাড়েনি। এই গোষ্ঠীর মত ছিল, রাজ্যের আপত্তি অগ্রাহ্য করে চুক্তি সম্পূর্ণ করলে ঢাকাকে বোঝানো যাবে যে, আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে দিল্লি অভ্যন্তরীণ আপত্তি অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এতে রাজি ছিল না। কেন্দ্রের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অঙ্গরাজ্যের অসম্মতিতে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতে পারে না। ভারতীয় কূটনীতিকদের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি জানানো হলে তারাও বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করবে। বিদেশসচিব রঞ্জন মাথাই আরও জানান, তিস্তার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলবে। তার বক্তব্য, 'জল একটি স্পর্শকাতর বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এমন কিছু করা হবে না, যাতে রাজ্য সরকারের আপত্তি রয়েছে। আমরা যে চুক্তিই করি, তা যেমন রাজ্য সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তেমনই বাংলাদেশের কাছেও।'

৩.১.৯ উত্তরবঙ্গের সমস্যা

২০১১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের পক্ষে বিদেশসচিব শ্রী রঞ্জন মাথাই জানান যে, তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি, যা ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, তা আপাতত বাতিল করা হল। তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণ দর্শাতে গিয়ে শ্রী মাথাই জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিস্তা জলবণ্টনের আংশিক হার নিয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করে ওই চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার তিস্তা চুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে তার প্রাপ্ত সম্মান প্রদর্শন করেনি। ঘটনা প্রবাহ হল, বিগত কিছু মাস ধরে উত্তরবঙ্গের কিছু রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজসেবী সংগঠন তিস্তা চুক্তি নিয়ে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে। বালুরঘাটের আরএসপি সাংসদ প্রশান্ত মজুমদার আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি লেখেন। তিনি উল্লেখ করেন, ৫০-৫০ হারে তিস্তার জলবণ্টনের ফলে উত্তরবঙ্গ চূড়ান্ত সমস্যার সম্মুখীন হবে। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন চুক্তি সম্পাদনের আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রাজ্য সরকার তিস্তা চুক্তির ক্ষেত্রে যে অবহেলার অভিযোগ এনেছে, তার প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়, অতীতে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সাত রাউন্ড আলোচনায় মিলিত হয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুর সঙ্গে। রাজ্য সরকার তিস্তার জলবণ্টনের ক্ষেত্রে ৫০-৫০ হারে জল বণ্টিত হলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হবে এই দাবি জানিয়ে ৭৫-২৫ হারে জলবণ্টনের কথা উল্লেখ করে। নীচে উত্তরবঙ্গের সমস্যা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

তিস্তাচুক্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাবকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগ সমর্থন জানায়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে আবহাওয়া বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উত্তরবঙ্গের নদীপ্রকৃতিই এমন, বর্ষায় প্রচুর জল বহন করলেও শুখা মরশুমে শুকিয়ে যায়। তার ফলে সেচের জল হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ জল কিংবা তিস্তার জলই প্রধান ভরসা। তিস্তা আন্তর্জাতিক নদী হলেও, তিস্তা যেহেতু উত্তরবঙ্গের লাইফ লাইন, তাই জলচুক্তি করার আগে তিস্তার বর্তমান জলপ্রবাহ সম্পর্কে জানা খুব দরকার। সিকিম ও দার্জিলিং হিমালয়ে জলবায়ুর বিচিত্র পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে তিস্তার জলপ্রবাহ আগের তুলনায় অনেকটা কমে গিয়েছে। তিস্তা জলবণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। সেচ দফতর সূত্রে জানা যায় যে, বর্ষায় তিস্তায় যে পরিমাণ জল মেলে তার মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পাওয়া যায় শুখা মরশুমে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, শুখা মরশুমে ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে চাষের জন্য জল পাঠানো গিয়েছে। ভৌগোলিক সুবিধার দিকে তাকিয়ে ন্যাশনাল হাইড্রোপাওয়ার কর্পোরেশন তিস্তার জল কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনা করে। উত্তর সিকিমের লাচুং-লাচেন থেকে দক্ষিণ সিকিমের রংপো পর্যন্ত ২১টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রস্তাবিত হয়েছে ও কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের আপত্তি সত্ত্বেও অন্তত ৬ থেকে ৮টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। সেবকের কাছে সিকিমের ৬টি (ওই প্রস্তাবিত ২১টির মধ্যে) ও পশ্চিমবঙ্গের ২টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ১৫ মিটারের ২টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ১৫ মিটারের চাইতে উঁচু বাঁধ তৈরি হচ্ছে। ফলে গাজলডোবার আগেই তিস্তার জল তুলে নেওয়া হচ্ছে। এতে তিস্তার জলের পরিমাণ কমছে। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ির কাছে ফাঁসিদেওয়ায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের তিনটি ইউনিট চালাতে পারলে ৬৭.০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা। শুখা মরশুমে জলের অভাবে গড়ে তিন মাস ইউনিটগুলি বন্ধ থাকে। তিস্তার নিম্ন-অববাহিকাতেই জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জের মতো শহর রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৫-২০ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন সেখানে। ফলে জলবণ্টন হলে উত্তরবঙ্গের অভয়রাণ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সিংহভাগ প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হবে। নদী বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রেরণ করেছেন যে, তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি সম্পূর্ণ হলে উত্তরবঙ্গ শুখা মরশুমে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। আর এই সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রকে দিয়ে তিস্তার জলপ্রবাহের দিক বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট করতে বলে। কল্যাণ রুদ্র মহাশয়কে নিয়ে রুদ্র কমিশন গঠন করে।

৩.১.১০ বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করলে তিস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আসে। ভারত, বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নতুন সরকার গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী দেশ হিসেবে তার ভূমিকা পালন করেছে। সেই সহযোগিতার ফলস্বরূপ— তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাতে যে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, তা সম্পূর্ণ হয়নি। ওই বিষয়ে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল খান আবদুল মুহিদ বলেন যে, আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর সঙ্গে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে ড. মনমোহন সিং জানান, আমরা আগামী শীতের মরশুমে এই চুক্তি সম্পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর।

আওয়ামি লিগ সরকারের কাছে তিস্তার জলবণ্টন চুক্তির গুরুত্ব রাজনৈতিক ও বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিস্তা নদীর চুক্তির ফলে বৃহৎ রংপুর বিভাগ উপকৃত হবে। এই বৃহৎ রংপুর বিভাগে আওয়ামি লিগের জোটসঙ্গী মো. এরশাদের দল জাতীয় পার্টির প্রভাব বেশি। ফলে রাজনৈতিক সহানুভূতিকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কাজে লাগাতে পারবে হাসিনা সরকার। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির উন্নতির জন্যই বাংলাদেশ সরকার তিস্তা নদীর জলবণ্টনের ক্ষেত্রে এতটা ব্যাকুল। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যাগার বলা হয়। দেশের মধ্যে ১৪ শতংশ শস্য এই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মোট কৃষি জমির ৪২ শতাংশ সেচ প্লাবিত। সেই জমির ৬৩ শতাংশ আবার তিস্তার প্লাবনভূমিতে অবস্থিত। ফলে তিস্তার জলেই বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকাজ হয়। ফলে বাংলাদেশকে জল না দিয়ে গাজলডোবা ব্যারেজ থেকেই যদি সমস্ত জল তুলে নেওয়া হয়, তাহলে সে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা ব্যাহত হবে। নষ্ট হবে নদী ও তার প্রবহমানতাও। তিস্তা চুক্তি না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের তরফ থেকে ফেণী, ইছামতী প্রভৃতি সমস্ত নদীর জলবণ্টন চুক্তি আটকে দেওয়া হয়েছে।

৩.১.১১ রুদ্র কমিশন গঠন ও রিপোর্ট পেশ

২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এক দূত মারফত প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তিস্তার কতটা জল বাংলাদেশকে দেওয়া যাবে, বা আদৌ দেওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এক সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, তিস্তায় জলের পরিমাণ এবং তা বণ্টনের পর রাজ্যে সেচের উপর প্রভাব খতিয়ে দেখবেন নদী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র। অধ্যাপক রুদ্র কমিটির রিপোর্ট হাতে এলে তবেই তিস্তা চুক্তি নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানাবে রাজ্য।

কেন্দ্রীয় জল কমিশনারের কাছ থেকে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান না পাওয়ায় রাজ্য সরকারকে দেওয়া রিপোর্টে তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশই করতে পারেনি কল্যাণ রুদ্র কমিটি। বদলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

দেখা করে অসম্পূর্ণ রিপোর্ট ও নিজের কিছু মতামত জানিয়েছেন নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র। অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র কমিটির অসম্পূর্ণ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে কতটা জল দেওয়া যায়, তা নির্ধারণ করার আগে প্রবাহমানতা, তিস্তার জলের সঠিক পরিমাণ ও এ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের বিষয়গুলি জানাটা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কেন্দ্রীয় জল কমিশন থেকে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে কমিটি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি। সুতরাং রুদ্র কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট যেমন সরকারের হাতে জমা পড়েনি, তেমনই রাজ্য সরকারও বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, এমনটাই মহাকরণ সূত্রে জানানো হচ্ছে।

অধ্যাপক রুদ্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অবগত করেছেন কেন্দ্রীয় জল কমিশনের অসহযোগিতার কথা। সরকারের এক মুখপাত্র জানান, মূলত বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য পরিসংখ্যান নিয়েই গবেষণা শুরু করেছিল কমিটি। সারা বছর নদীর জলপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার বাসনা থাকলেও সময় ও পরিকাঠামোর অভাবে তা করা যায়নি। ফলে কেন্দ্রীয় জল কমিশন ও রাজ্য সেচ দপ্তরের দেওয়া তথ্যের উপরই ভরসা করতে হয়েছে রুদ্র কমিটিকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিশনটি পূর্ণাঙ্গ ও সাম্প্রতিক তথ্য দেয়নি। অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে কোনো সুপারিশ কমিটি করতে চায়নি। তবে গবেষণাপ্রাপ্ত মতামত জানিয়েছেন অধ্যাপক রুদ্র।

সরকারি সূত্রের খবর, রুদ্র কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছে, তিস্তার সেতু রয়েছে গজলডোবায়। এখান থেকে ভাটিতে আরও ৭২ কিলোমিটার এগিয়ে বুড়িগ্রামে বাংলাদেশে ঢুকেছে নদীটি। তিস্তার ভাটিতে জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ির মতো শহর রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ বসবাস করে। ফলে বাংলাদেশকে জল না দিয়ে গজলডোবা ব্যারেজ থেকেই যদি সব সেচের কাজে তুলে নেওয়া হয়, তা হলে এ রাজ্যেরও ১৫ লক্ষ বাসিন্দার জীবন-জীবিকা নষ্ট হবে। তাছাড়া বাস্তুতন্ত্রের নির্যাস নদীর জীবনই তার প্রবহমানতা। নদীর জল আটকে সেচের জন্য তুলে নিলে তিস্তাই শুকিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এ পারে তিস্তার গতি অব্যাহত রাখতেই বাংলাদেশকে জল দেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইনও বলছে একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা একটি নদীর জল সকলে মিলেই ভাগ করে নিতে হবে।

কমিটি অবশ্য সতর্কবাণী শুনিয়ে বলেছে, বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী অত বেশি জল তাদের দিতে চাইলেও সমস্যা হবে। সেক্ষেত্রে টান পড়বে গজলডোবার উচ্চ অববাহিকায় ভূ-গর্ভস্থ জলে। কিন্তু সিকিমে তিস্তায় কতটা জল প্রবাহিত হয়, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পায়নি কমিটি। উত্তর সিকিমের লাচুং, লাচেন থেকে নীচের রংপো পর্যন্ত ২১টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তিস্তার উপর এ রাজ্যেও দুটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে। সেগুলি চালু হলে ঠিক কত জল দু-রাজ্যের লাগবে, তিস্তার জল ঠিক কতটা কমবে, তারও নির্দিষ্ট তথ্য পায়নি রুদ্র কমিটি। অধ্যাপক রুদ্র কমিটির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ধারাবাহিক ও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান না পাওয়ার কারণেই চূড়ান্ত সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কল্যাণবাবুকে 'আর কিছু না করার' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে, যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাহলে

কি রাজ্য এ বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নাকি আপাতত ঝুলেই রইল দু-দেশের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই চুক্তিটির ভবিষ্যৎ।

৩.১.১২ তিস্তা জলবণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ

২০১১ সালে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার পরেও ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য দুই দেশের কূটনীতিক মহল বার বার মিলিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণিই শুধুমাত্র নয়, শেখ পরিবার ও গান্ধী পরিবারের সুসম্পর্কের সূত্র ধরে ইউপিএ চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীও বাংলাদেশ সফর করেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করেন— তিস্ত জলবণ্টন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। অপরদিকে শেখ পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লিতে মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বার্তা নিয়ে যান শেখ হাসিনার কন্যা পুতুল। শেখ হাসিনা কন্যা পুতুলের মাধ্যমে মিসেস গান্ধী বার্তা প্রদান করেন যে, ভারত সরকার যেকোনো উপায়ে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর।

এখন প্রশ্ন হল, কবে হতে চলেছে সেই দীর্ঘায়িত চুক্তি। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, সোমবার ঢাকাতে এই বিষয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ও বিদেশসচিবু শহিদুল হকের সঙ্গে বৈঠকের পর ভারতের বিদেশ সচিব রঞ্জন মাথাই যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এই আশ্বাস দেন। শহিদুল জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ ও আগামী মার্চে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় আসবেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ভারতের নব বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ ঢাকাতে এসে তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে বাংলাদেশকে চূড়ান্ত আশ্বাস প্রদান করে। খুরশিদ জানান, তিস্তা চুক্তি নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। তিনি আরও বলেন, চুক্তি না হওয়া নিয়ে মমতাকে দোষারোপ করে লাভ নেই। বলেন, ‘‘মমতা বাংলাদেশের বন্ধু। তার আপত্তির অনেক কারণ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে আলাপ-আলোচনা করে আমরা তা নিষ্পত্তির চেষ্টা করছি।’’ পাশাপাশি স্থল সীমান্ত চুক্তি নিয়ে বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, আসন্ন বাজেট অধিবেশনে এ বিষয়ে সংসদে বিল আনা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ওই বিলে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিয়েছে। এমনকী বিজেপিও ওই বিলটির বিরোধিতা করবে না বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণিকে বৈঠকের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ২০১৩ সালেই তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করতে ভারত বদ্ধপরিকর। সে কথাটি আগামীকাল ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাতে চলেছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় ভারত সফরে এসেছিলেন ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তার এই সফরেই তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে দু-দেশের মধ্যে চুক্তি হতে চলেছে বলে সে সময় মনে করা হয়ে— যে চুক্তি দু-বছর আগেই সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের পরেই সেপ্টেম্বরে শেখ হাসিনার ভারত সফরের ঘোষণাটি করেছিলেন। খুরশিদ বলেন,

তিস্তা ও স্থল-সীমান্ত চুক্তি নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সূত্র জানায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির বিষয়টি বিবেচনায় রেখেও তিস্তা চুক্তিটি করে ফেলার বিষয়ে দুই দেশ ঐক্যমতে পৌঁছেছে।

খুরশিদের ঘোষণার পরেই বাংলাদশের কূটনৈতিক মহলে স্বস্তির আবহ দেখা যায়। সেই বছরের শেষেই বাংলাদেশে ভোট। তার আগে শেখ হাসিনা তার ভারত সফরে তিস্তার জলের ভাগ নিয়ে বাংলাদেশ জুড়ে যে আরও এক দফা আশার সঞ্চার হবে, তা বিলক্ষণ জানতেন। সুতরাং তিস্তা চুক্তি নিয়ে একেবারে চূড়ান্ত আশ্বাস না পেলে হাসিনা ভারত সফরের কর্মসূচি নিতেন না। এদিন খুরশিদ আরও জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ বিরোধী নন, জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে তার আপত্তি নেই, আপত্তি কিছু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে। আলোচনার মাধ্যমে সেই আপত্তি দূর করতে ভারত সরকার এখনও সচেষ্ট। বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, সেইসব খুঁটিনাটি বিষয়কে আপাতত রেখে তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে চুক্তি সই করতে রাজি হয়েছে দুই দেশ। ভারতের কূটনীতিকরা এদিন শেখ হাসিনাকে বলেন, অতীতে প্রায় সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তিই আগে স্বাক্ষর হয়েছে, তারপর আলোচনার মাধ্যমে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে। গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে দু-দেশের চুক্তিও আগে স্বাক্ষর হয়, তারপরে আলোচনার মাধ্যমে জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে। বিদেশমন্ত্রকের এক অফিসার বলেন, বৈঠকে ভারতের প্রস্তাবে সায় দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ''খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা চলুক, আগে চুক্তিটি করে নিই আমরা।'' সূত্রের খবর, মমতা ব্যানার্জি ও শেখ হাসিনা যৌথভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

২০১৪ সালে ভারতে কেন্দ্রীয় স্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসীন হয়। দুটি পর্বের শাসনকালে শেখ হাসিনা যদিও দু-বার ভারত সফরে এসেছেন এবং সেই দুই পর্যায়ে অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটলেও তিস্তার জলবণ্টন সম্পর্কিত তিস্তা চুক্তি রূপায়নের প্রশ্নটি এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা আশা রাখি, কেন্দ্রীয় সরকার-রাজ্য সরকার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যৌথ ঐক্যমতের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে এই চুক্তিটি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হবে।

৩.২ স্থলসীমান্ত সমস্যা

৩.২.১ ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমান্ত সমস্যা

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন সময়ে Radcliff Line-ই ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সীমান্ত বিভাজনকারী বিন্দু। যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরেও আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে এবং আজও বিদ্যমান। যদিও দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার গতি ছিল যথেষ্ট ধীর। ১৯৫৮ সালে Nehru-Noon Agreement-এর মধ্য দিয়ে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির প্রয়াস নেওয়া হলেও বহু কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা এক

বেদনাবিধুর যাত্রাপথে খণ্ড রাজনীতি এবং অদূরদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলশ্রুতিতে যার মূল্য দিয়ে চলেছেন আজও সীমান্তের মানুষ। কাঁটাতারে বিদ্ধ ফেলানীর ক্ষতবিক্ষত দেহ এই সমস্যারই এক জীবন্ত প্রতিরূপ।

দুই দেশের শাসকবর্গই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থলসীমান্ত চুক্তিতে পরস্পর সম্মত হয়েছিলেন। যদিও এই পর্যায়েও তিনটি বিষয় চুক্তি ও সম্মতির বাইরে থেকে যায়। তার মধ্যে প্রথমটি হল পশ্চিমবঙ্গের দাইহাটা এলাকার ৬.১ কিলোমিটার সংশ্লিষ্ট ভূভাগ। দ্বিতীয়টি হল ত্রিপুরার বেলেনিয়া এলাকায় মুহুরি নদী সংলগ্ন ভূভাগ এবং তৃতীয়টি অসমের নাথিটিলা দুমাবড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকা। এছাড়া বিতর্কের অন্য বিন্দুগুলি ছিল ছিটমহল হস্তান্তর ও জরুরিকালীন প্রয়োজনে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অতিরিক্ত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে যেসকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও এই চুক্তি ভারতের দ্বারা পুনঃসংশোধিত হয়নি, কিন্তু চলমান সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তি দুই দেশের পক্ষেই ছিল এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ— যে দুই দেশ প্রায় ৪০৯৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের অংশীদারিত্ব ভোগ করে।

ছিটমহলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল 'তিন বিঘা সমস্যা'। 'তিন বিঘা সমস্যা' ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম দীর্ঘকালীন বিতর্কিত বিষয়, যা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বহু মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। এই বিবাদের সূচনা হল দুই দেশের মধ্যে তিন বিঘার কাছাকাছি কিছু পরিমাণ এলাকা নিয়ে, যা করিডর হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এই এলাকার দৈর্ঘ্য হল ১৭৮ মিটার এবং প্রস্থ ৮৫ মিটার, যা বাংলাদেশের দহগ্রাম ও পানবারি মৌজার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যত শীঘ্র সম্ভব ছিটমহল বিনিময় কার্যকর করা হবে এবং তিন বিঘা চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিট-কে তিন বিঘা করিডরের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। এ ব্যাপারে তৎকালীন উত্তরবঙ্গের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সাংসদ অমর রায় প্রধান ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিল্লিতে জমা দেন। তার পরিকল্পনায় বলা হয়, জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির দইখাতা সীমান্ত দিয়ে একটি করিডর তৈরি করা হবে, যা বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ডের ১৭ বর্গমাইল এলাকাকে যুক্ত করবে।

১৯৭৯ সালে ভারতের BSF (Border Security Force) এবং বাংলাদেশের BDR-এর মধ্যে ত্রিপুরার মুহুরি নদী তীরবর্তী এলাকায় সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে একটি সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সেই পর্যায়ে যদিও এটিকে একটি সামান্য সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছিল, কিন্তু তৎকালীন জিয়াউর রহমানের সরকার এই ঘটনাকে ভারতের দিক থেকে একটি প্ররোচনা বলে মনে করেন। একই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে বাংলাদেশের দক্ষিণ তালপাটি যা পূর্বাশা নামেও পরিচিত, সেখানের নিউমুর আইল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে।

১৯৭৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর এবং জিয়াউর রহমানের হত্যার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। ক্যাথলিন জ্যাক মনে করেন, ১৯৮২ সাল থেকে এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে, বিশেষত ১৯৮২ সালের অক্টোবর-এ, মাননীয় এরশাদ যখন ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দুই দিনের বৈঠক

করেন, সেই পর্যায়েই বিতর্কিত বিষয়গুলি নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। উঠে আসে তিন বিঘা করিডর সম্পর্কিত সমস্যাও।

১৯৮৩ সালে একদিকে যখন সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বিবাদমান বিষয়গুলিকে কূটনৈতিক স্তরে সমাধান করে একটি আঞ্চলিক জোট গঠন করার লক্ষ্যে, ঠিক সেই সময়েই ভারত সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের ৩৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় কাঁটাতার দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসী মানুষের স্রোতকে আটকানো, মূলত মুসলিম জনগণের আসাকে প্রতিহত করা। বাংলাদেশ থেকে আসা জনস্রোত অসমের জনবিন্যাসকে পরিবর্তন করছে এই অভিযোগের তীরে বিদ্ধ হওয়ার পরেই ভারত সরকার এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এই একতরফা উদ্যোগকে কখনোই ভালোভাবে নেয়নি।

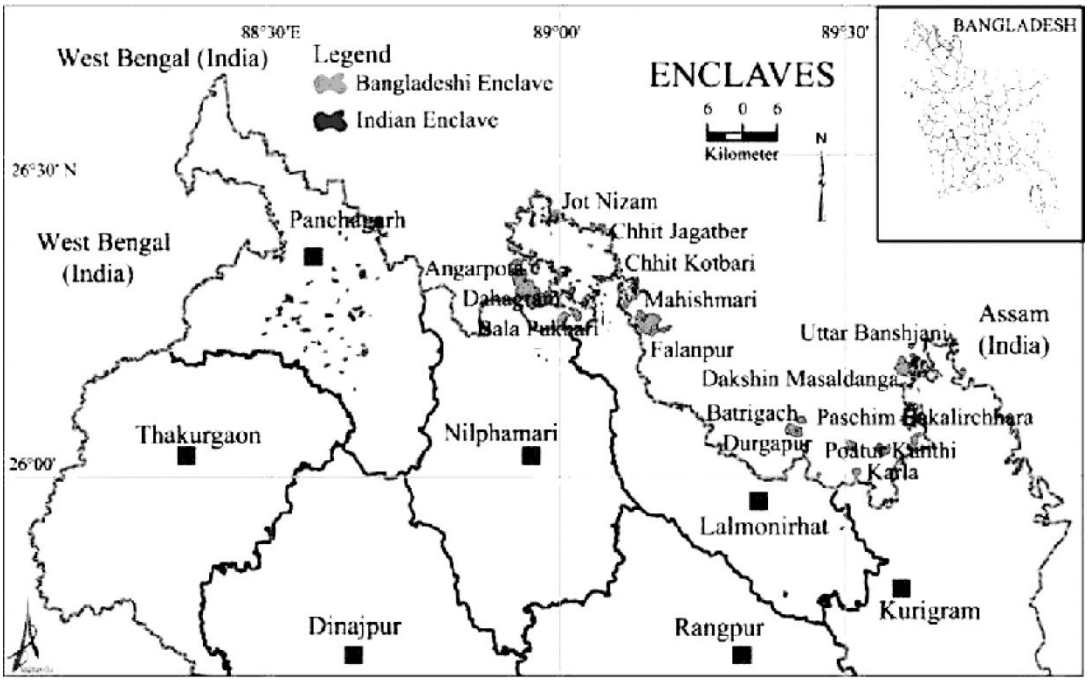

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল

অনেক প্রতিকূলতার পথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত ২০১০ সালে শেখ হাসিনা ও ড. মনমোহন সিংহের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে স্থল-সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় এবং অবাধ স্থল-বাণিজ্যের পথে যে সকল বাধা রয়েছে, তা দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক ঐতিহাসিক বোঝাপড়া অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৩ সালের ৬ মে সংসদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ছিটমহল হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থল-সীমান্ত চুক্তি রূপায়নে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় মনমোহন সিং সরকারের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করতে গেলে তুলকালামের ফলে তা আলোচনা করা যায়নি। অসম গণ পরিষদের মাত্র ২ জন সাংসদ মিলে ট্রেজারি বেঞ্চে বিদেশমন্ত্রী সলমন

খুরশিদের হাত থেকে সংবিধান সংশোধন বিলটি ছিনিয়ে নিতে যান। যার ফলে স্থল-সীমান্ত চুক্তি সংশোধনী বিল পাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই পর্যায়ে সম্ভব না হলেও ২০১৫ সালের ৭ মে ভারতীয় সংবিধানের ১০০তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থল-সীমান্ত সমঝোতা চুক্তিপত্রটি (Land Boundary Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ওই একই বছরে আরও কিছুটা সংশোধিত হয়েছিল। এই চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল, যার আয়তন প্রায় ৭১১০ একর এবং বাংলাদেশ ১১১টি ছিটমহল, যার আয়তন ১৭১৬০ একর লাভ করে। ছিটমহলের বাসিন্দাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তারা যে এলাকায় বাস করছেন, সেখানেই বাস করার বা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে দেশ বেছে নেওয়ার। ৩১ জুলাই ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি চলে। এই চুক্তির ফলে ভারত বাংলাদেশের কাছে ৪০ বর্গকিলোমিটার ভূমিখণ্ড হারায়।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই স্থল-সীমান্ত প্রশ্নে একটি ঐক্যমতে আসা কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ২০১৫ সালের ৬ জুন নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরকালে মোদি ও শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ও দুই দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ে বৈঠকের মধ্যে দিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দুই দেশের অফিসারদের সংযুক্ত করে সমীক্ষক টিম গড়ে তোলা হয়। এমন প্রায় ৭৫টি টিম, যা একজন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশি অফিসারকে যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল, তারা এই জটিল সমীক্ষার কাজ ও এই এলাকার মানবসম্পদের সামগ্রিক দাবিগুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই ভারতীয় ছিটমহলে অবস্থিত ১০০টি পরিবার ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানায়। যদিও ভারতের কাছে হস্তান্তরিত বাংলাদেশি ছিটমহলে কেউই বাংলাদেশ ফিরে যাবার প্রার্থনা জানায়নি। এই পর্যায়ে ১৪,০০০ মানুষ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে এবং ৩৬,০০০ মানুষ বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিজেদের যুক্ত করেন।

৩.৩ বাণিজ্য ও পরিবহন

৩.৩.১ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য-পরিবহন (ট্রানজিট) চুক্তি

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগের ফলে বৃহৎ বাংলার বিভাজন ঘটে। পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান— বর্তমানে যা স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পরিচিত। দুই বাংলার বিভাজন ঘটলেও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে ১৯৬৫ সালে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে। শুধুমাত্র যে একটি রেললাইন ঢাকা-কলকাতাকে যুক্ত করত, তা এই যুদ্ধের ফলে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তার ফলে দুই বাংলা তথা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতি লাভ করতে থাকে। মাঝে একটা দীর্ঘ সময় ধরে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে ভাটা পড়ে। আবার ১৯৯০ দশকে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সু-যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। তার ফলে ১৯৯৯ সালে ঢাকা-কলকাতা বাস যোগাযোগ চালু করা হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আরেক বাঙালি প্রদেশ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার সঙ্গেও ঢাকার বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয় ২০০১ সাল নাগাদ। মৈত্রী ট্রেনের মাধ্যমে রেলপথ দ্বারা কলকাতার সঙ্গে ঢাকাকে যুক্ত করা হয় ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের সঙ্গে বাকি ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। তার কারণ ভারত সরকার বরাবর বাংলাদেশ সরকারের কাছে তার ভূমি ব্যবহারের জন্য অনুমোদন চেয়ে এসেছে। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ত্রিপুরার সরকার— দুই প্রদেশের মধ্যে বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, কলকাতা থেকে আগরতলার দূরত্ব ১৭০০ কিলোমিটার। কিন্তু সড়ক পথে কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে আগরতলা যাওয়া গেলে সেই দূরত্ব কমে মাত্র ৪০০ কিলোমিটার হবে। তার ফলে সময়, অর্থ সবকিছুই সাশ্রয় হবে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির অন্যতম বিষয় হল অর্থনৈতিক সম্পর্ক। ভূমি দ্বারা বেষ্টিত (land-locked) ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অংশের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি ততটা মজবুত নয়। এই অংশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতির আরও উন্নতির জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তি সম্পূর্ণ করতে প্রবলভাবে আগ্রহী। ট্রানজিট চুক্তির ফলে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাঠানো সামগ্রীর পরিবহন ব্যয় বর্তমানের তুলনায় অনেকটাই কমে যাবে। এই ব্যয়হ্রাসের সুবিধা একমাত্র ক্রেতা পাবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। ভারতীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বর্তমানে উক্ত অঞ্চলগুলিতে বিনিয়োগে উৎসাহী নয়।

ট্রানজিট চালু হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো সম্ভব হবে। দ্রুততার মাধ্যমে এই উন্নয়ন সম্ভব হবে। পরিকাঠামো গড়ে উঠলে পরিবহন খরচ কমে যাবে, কারণ ভারতবর্ষের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়ক হয়ে উঠবে বাংলাদেশের মধ্যেকার সড়ক।

বর্তমানে একটি ভারতীয় পরিবাহী ট্রাককে কলকাতা থেকে আগরতলা আসতে হলে প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু ট্রানজিট চুক্তির ফলে বাংলাদেশ হয়ে এই ট্রাক আগরতলায় পৌঁছোবে মাত্র ৪০০ কিলোমিটারের মতো দূরত্ব অতিক্রম করে। তার ফলে দূরত্ব কমার সঙ্গে সঙ্গে খরচও কমবে। ত্রিপুরা বণিকসভার সভাপতি ডি.এল. দেবনাথ (D.L. Debnath) বিবিসি-কে জানান, বর্তমানে একটি ট্রাক মাল নিয়ে কলকাতা থেকে আগরতলা আসতে গেলে তার পিছনে প্রায় ৮০ হাজার ভারতীয় টাকা খরচ হয় (মার্কিন প্রায় ১৬০০ ডলার)। ট্রাকটি বাংলাদেশ হয়ে আগরতলা পৌঁছোলে খরচ কমে দাঁড়াবে মাত্র ২০ হাজার ভারতীয় টাকা। এর

ফলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং পরিবহন ও ট্রানজিট চুক্তির নানা উপকারিতা লাভ করা যাবে। বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে বাংলাদেশের যোগাযোগ পরিকাঠামো উন্নতি লাভ করবে ও প্রচুর পরিমাণে শুল্ক আদায় করতে পারবে। ভূমিবেষ্টিত নেপাল ও ভূটান এই ট্রানজিটের অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে তারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে ব্যবহার করতে পারবে। বাংলাদেশ শুধুমাত্র ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুবিধা ভোগ করবে।

ভারত সরকার বাংলাদেশের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। সমালোচকদের মতে, বাংলাদেশর সড়ক ও বন্দরের পরিকাঠামো উন্নতিতে ভারতের সুবিধা হবে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি জানান, যদি বাংলাদেশর রেল পরিকাঠামো উন্নতি লাভ করে, তবে বাংলাদেশও সুবিধা ভোগ করবে। বাংলাদেশের ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মহঃ রুস্তম আলি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বন্দরের আধুনিকীকরণ ও পরিবহনযোগ্য আধুনিক সড়ক তৈরি করতে কমপক্ষে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। বর্তমানে যে সড়ক ও অন্যান্য পরিকাঠামো আছে, তাতে ভারতের সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সড়কগুলি চার লেনের না হলে ভারতীয় বড়ো ট্রাকগুলি যাতায়াত করাতে পারবে না। যদি ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা উৎসাহী হবে, যার ফলে বাংলাদেশ নতুন বিনিয়োগের পীঠস্থান হয়ে উঠবে। এর ফলে পরিকাঠামোর উন্নতি সম্ভব। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে নতুন চাকরির সংস্থান হবে এবং বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হবে।

Research and Information Sytem for Developing Countries (RIS)-এর প্রাক্তন প্রধান নাগেশকুমার বলেন, ট্রানজিট প্রদানের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। RIS ২০০৮ সালে তাদের পর্যবেক্ষণে দেখায় যে, ট্রানজিট চুক্তির ফলে বাংলাদেশ সরাসরি প্রায় এক বিলিয়ন ডলার আয় করবে শুধুমাত্র ভারতের কাছ থেকে প্রত্যেক আর্থিক বছরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপচে-পড়া জনসংখ্যা এই নতুন অর্থনৈতিক কার্যাবলির সরাসরি সুবিধা ভোগ করতে এবং প্রচুর সংখ্যায় নতুন চাকরির সুযোগ পাবে। নাগেশ কুমারের মতে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তি প্রদান করলে ভারত তা গ্রহণ করবে। এই ট্রানজিট চুক্তির ফলে ভারতের অর্থ সঞ্চয় হবে। এই ট্রানজিট প্রদানের ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে ২-৩ শতাংশ খরচ কমানো সম্ভব হবে। এটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিরাট সাশ্রয়।

৩.৩.১.১ বাণিজ্য ও পরিবহন (ট্রানজিট) চুক্তির ফলে বাংলাদেশের আশঙ্কা

ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে নির্বাচিত শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামি লিগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। ২০১০ সালে শেখ হাসিনার দিল্লি সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত করেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং দীর্ঘ ১২ বছর পর বাংলাদেশ সফর করেন।

শেখ হাসিনার ভারত সফরের পর দিল্লি বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আশাবাদী ছিল। কিন্তু ২০১১ সালে ড. মনমোহন সিং-এর বাংলাদেশ সফরে সেই ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি— কারণ হিসেবে বাংলাদেশের তরফে বলা হয়, তিস্তা চুক্তি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না।

ভারতকে ট্রানজিট প্রদানে শেখ হাসিনর যতটা স্বচ্ছতা আছে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি-র ততটাই প্রবল আপত্তি আছে। বাংলাদেশের কিছু ভাষ্যকারের মতে, ভারত ট্রানজিট প্রদানে সুবিধা নেবে, তার সেনা-অস্ত্র এই সড়ক পথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে, যা বাংলাদেশের কাছে এক অশনি সংকেত— যার ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আরেক মহলের দাবি, বাংলাদেশের সড়ক পরিকাঠামো এমনিতে দুর্বল। তার উপর ভারতীয় সামগ্রীবাহী বড়ো বড়ো পরিবহনগুলি চলাচল শুরু করলে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য তখন যদি ভারতীয় সরকার ও ভারতীয় কোম্পানিরা বাংলাদেশের পরিকাঠামো গড়ে তোলে, তাহলে তা উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে। ভৌগোলিক কৌশলগত দিক দিয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের ব্যবহার ভারতের কাছে লোভনীয়। আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব মাত্র ২৫৪ কিলোমিটার। এই চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর হয়ে উঠবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের Supply line। উন্নয়নের প্রধান সংযোগকারী সড়ক। সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চট্টগ্রামের সমুদ্রবন্দর, সড়ক ও রেলপথের উপর যে চাপ তৈরি হবে তা কল্পনাতীত। তার ফলে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে।

ট্রানজিট সুবিধা প্রদান হলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি আরও বেড়ে যাবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, শিল্পপতি এবং বাংলাদেশ বণিকসভার প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন যে, দিল্লি বরাবরই খুব কম দেয়, কিন্তু দাবি করে প্রচুর বাংলাদেশের কাছে। এই বক্তব্য প্রকাশ করেন মাহাবুর রহমান, প্রাক্তন সেনা প্রধান, বর্তমানে বিএনপি-র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। তার আরও ধারণা হল, আমরা ভারতকে বড়ো দাদা হিসেবে দেখতে চাই না, আমরা দিল্লিকে চাই ছোটোভাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সহকারী হিসেবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের অন্যতম অর্থ উপার্জনের জায়গা হল তার বস্ত্রশিল্প। বাংলাদেশ বরাবর তার বস্ত্রশিল্পকে ভারতের বৃহত্তর বাজারে ছড়িয়ে দিকে আগ্রহ জানানো সত্ত্বেও ভারতীয় কূটনৈতিকরা কোনোরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দিক থেকে বিএনপি ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের প্রবল বিরোধী। কিন্তু ২০১২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ৭ দিনের জন্য বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রী বিএনপি-র প্রধান বেগম খালেদা জিয়া তার দিল্লি সফরকালে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানে বিএনপি-র কোনোরকম আপত্তি নেই বলে দিল্লিতে উল্লেখ করেন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির দিক দিয়ে বিএনপি নেত্রীর এই বক্তব্য অতি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় কুটনৈতিক-রাজনৈতিক মহলে।

৩.৩.১.২ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও পরিবহন (ট্রানজিট) চুক্তির সুবিধা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে ট্রানজিট প্রদানের ফলে নানারকম সুবিধা পেতে পারে যা এই রাষ্ট্রের দুর্বল অর্থনীতিকে একটি স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ তার পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজাতে পারবে। সড়ক-রেলপথের মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশের মেলবন্ধন ঘটাতে পারবে।

রেলপথের মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশকে একসূত্রে গাঁথতে পারবে। বাংলাদেশ যদি ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করে, তাহলে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হবে, যা বাংলাদেশের উন্নতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভারত প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করবে বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নতিতে। ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের ফলে বাংলাদেশ সরাসরি আর্থিকভাবে প্রচুর লাভবান হতে পারবে। খুবই সংরক্ষণশীল অনুমান হল ট্রানজিট ফি বাবদ প্রাপ্য কর কমপক্ষে এক বছরে এক বিলিয়ন ডলারকে পার করে দিতে পারবে বলে আশা করা যায়, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে বিশ্বময় এক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। ইউরোপের দেশগুলি, আমেরিকা আরও বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হবে এই অঞ্চলের প্রতি। বাংলাদেশ যার সুফল ভোগ করবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা বন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ প্রয়োজন। ভারত তার নিজস্ব তাগিদে চট্টগ্রাম বন্দর ও মংলা বন্দরে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে বন্দর আধুনিকীকরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া মংলা বন্দরে রাতের বেলায় কোনো কাজ হয় না। রাতের বেলাতে কাজের জন্য যে প্রকার আধুনিক পরিকাঠামো দরকার, তা বিনিয়োগ করতেও ভারত উদ্যোগী। বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাজারে তার ব্যবসা বাড়াতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে নেপাল ও ভুটানেও ট্রানজিট ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে নেপাল ও ভুটানের ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা থাকছে।

অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার নিরিখে কাজের পরিমাণ অত্যন্ত কম। তার ফলে বেকার সমস্যা সরকারের কাছে মাথা ব্যথার কারণ। ট্রানজিট সুবিধার ফলে বেকার সমস্যার সমাধানের একটা রাস্তা খুলে যেতেই পারে। কারণ, এর ফলে প্রচুর চাকরির সম্ভাবনা থাকবে।

৩.৩.১.৩ পরিবহনের সম্ভাব্য পথ নির্দেশনা

২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ বিপুল জনমত নিয়ে ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে নয়াদিল্লি সফরে আসেন। শেখ হাসিনা ভারতের কাছে ছয় দফা দাবিপত্র পেশ করেন এবং দুটি মেমোরেন্ডামে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করবে। ভারতে সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থার সংস্কার এবং পরিবহন পরিষেবার পরিকাঠামো প্রদান করবে।

বাংলাদেশ এই ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থা অতি সরলীকৃত হবে। তার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নের ছবি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতের সামগ্রীবাহী পরিবহনগুলি বাংলাদেশের ভূমিকাকে ব্যবহার করতে পারবে-— রেল, সড়ক ও বিমান পরিষেবা। তার ফলে অতি দ্রুত সামগ্রীগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে যাবে। শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ভারত ব্যবহার করতে পারবে। ট্রানজিট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদেশনীতি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা জনাব গোহার রেজভি জানান, ট্রানজিটের ক্ষেত্রে আমাদের নতুন কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই, এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। কারণ হিসেবে জনাব গোহার রেজভি সাংবাদিকদের বলেন, ১৯৭৪ সালের ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

ট্রানজিট সংক্রান্ত বিষয় দিল্লির তরফ থেকে একটি প্রস্তাব ঢাকাকে প্রদান করা হয়েছে। আমদানি-রপ্তানির জন্য সড়ক-রেল সহ ১৫টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের জন্য। এই প্রস্তাবটিকে ৭ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করার উল্লেখ করা হয়। ঢাকাতে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী রাজীব মেটা এই প্রস্তাবপত্রটিকে ঢাকাতে জমা দেন। রাজীব মেটা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক বণিক সম্মেলনে জানান ট্রানজিট সহ নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে এবং ট্রানজিট সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়টি নির্ভর করছে বাংলাদেশ সরকারের গঠিত কমিটির প্রস্তাবের উপরে।

ট্রানজিট প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে শুল্ক দাবি করেছে, ভারত তাতে রাজি বলে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী রাজীব মেটার উল্লেখ করেন।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সড়ক ও রেলপথের যে রুটগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হল—

Bangladesh	**India**
Akhura	Agartala
Sabroom	Ramgarh
Demagiri	Thegamukh
Bifir Bazar	Srimantpur
Belonia	Belonia
Betui	Old Raghna Bazar
Chatlapur	Manu
Borosora	Borosora
Haluaghat	Ghasuapara

Sonamganj	Shell Bazar
Rohampur	Singhabad
Birol	Radhikapur
Benapole	Petrapole
Darshanak	Gede

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে ভারতবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রথম থেকেই ট্রানজিট প্রদানের বিরোধিতা করে আসছিল। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দাবি করে যে, ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষর হলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। বিএনপি দাবি করে, বাংলাদেশের মাটিতে কোনো ভারতীয় পরিবহনকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে এক সপ্তাহ ব্যাপী নয়াদিল্লি সফরে আসেন বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া। ২০০১-২০০৬ বিএনপি, জামাত জোট সরকার থাকাকালীন ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে চাপান-উতোর ছিল, তা সংশোধন করে ভারত সরকার তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

রাজনীতিক বিশ্লেষকদের মতে, বেগম খালেদা জিয়া তার তীব্র ভারতবিরোধী অবস্থান থেকে সরে আসার উল্লেখ করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লিতে বেগম খালেদা জিয়া জানান, ট্রানজিট চুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিএনপি-র কোনো আপত্তি নেই। বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য ট্রানজিট চুক্তিকে সাধুবাদ জানান। বেগম খালেদা জিয়া ট্রানজিট চুক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে তার কিছু আপত্তির কথা উল্লেখ করেন। বেগম জিয়া শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে আরও অলোচনার পক্ষপাতী।

ভারত সরকারের প্রস্তাবিত রেল-সড়ক সংযোগ সহ মংলা-চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের জন্য যে ১৫টি ট্রানজিট রুটকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই ট্রানজিট চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের ৬-৭ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। কিন্তু তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি সম্পাদিত না হওয়ায় বাংলাদেশ সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষকর করেনি। বাংলাদেশের তরফ থেকে বলা হয় যে, বিতর্কিত তিস্তা জলবণ্টন জটিলতা না মেটা পর্যন্ত বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবে না।

৩.৩.২ যৌথ উদ্যোগে ভারত-বাংলাদেশ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

বিশ্বায়নের যুগে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্প স্থাপনের তাগিদ অনেক বেশি বেড়ে গেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। শিল্প স্থাপনের সঙ্গে যোগ হয়েছে মানুষের আধুনিক জীবনযাপনে বিলাসিতা। তার ফলে ক্রমশ বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের চাহিদা। কিন্তু চাহিদা মতো যোগান না থাকায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি থমকে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশ সরকার নতুন নতুন যৌথ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রান্ত চাহিদার বিষয় বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করছে। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর এই প্রথম বাংলাদেশ ভারতের থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি ক্রয় করার জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ দৈনিক ৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার কারণে দেশের বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের দৈনিক বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা ৬০০০ মেগাওয়াট। উৎপাদনের থেকে চাহিদা বেশি থাকায় দেশের সর্বত্র ব্যাপক সমস্যা দেখা যায়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন মরসুমে এই চাহিদা আরও তীব্র হয়। ফলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রবল ঘাটতি থাকে।

সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সচেষ্ট হয়েছে। মণিপুর প্রস্তাবিত টিপাঁইমুখী বাঁধ থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহমত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার টিপাঁইমুখী থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার জন্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ নিগম বোর্ড সম্মতি প্রদান করেছে। অরুণাচলে প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও বিদ্যুৎ ক্রয়ের আগ্রহ জানাচ্ছে।

বাংলাদেশের নিজস্ব বিদ্যুৎশক্তির ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে বাংলাদেশের মাটিতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য যেকোনো প্রকার চুক্তি সম্পন্ন করতে আগ্রহী। তার সুফল হল ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক শক্তি উন্নয়ন বোর্ড ও ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা কেন্দ্রীয় তাপবিদ্যুৎ কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হবে। BPDB-র চেয়ারম্যান আবদুল ওহাব এবং NTRC-র পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর অরুণ রায়চৌধুরী এই যৌথ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির অবস্থান বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার রামপালে। অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের মংলা সমুদ্র বন্দরটি হল বাগেরহাট জেলাতে। আর রামপালের অবস্থান মংলা বন্দরের অতি নিকটে। এই প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। যা বাংলাদেশে বিনিয়োগ হওয়া সবথেকে বড়ো মাপের বিনিয়োগ। পাঁচ বছরের মধ্যে এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে সক্ষম হবে বলে পর্যবেক্ষকদের দাবি। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৭০ শতাংশ অর্থ বাজার থেকে ধার হিসেবে নেওয়া হবে এবং বাকি ৩০ শতাংশ অর্থ BPDB এবং NTPC বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, দেশের বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর কারণে আরও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

৩.৩.৩ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে রেলপথের বিস্তার মুক্ত অর্থনৈতিক চিন্তাধারার এক বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ। অবিভক্ত বাংলার অন্যতম পরিবহন যোগাযোগ ছিল রেলপথ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে রেলপথের মাধ্যমে দুই বাংলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট ছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে এই রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের এক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি।

২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু করার মাধ্যমে দুই দেশের মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটে। দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রেখে দুই দেশ নিবিড় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আরও কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে অন্যতম প্রস্তাব হল আগরতলা-আখোরা রেলপথ সম্প্রসারণ। ১৪ কিলোমিটার প্রস্তাবিত এই রেলপথটি বাংলাদেশকে যুক্ত করেছে আখোরা রেলস্টেশনের মধ্যে দিয়ে, যার মধ্যে ৫.৪ কিলোমিটার ভারতের অন্তর্ভুক্ত, বাকি অংশ বাংলাদেশে। প্রস্তাবিত আগরতলা-আখোরা রেলপথটি নির্মাণের জন্য ভারতীয় রেল আধিকারিকরা ১৯৯৯ সালে জমি-জরিপের কাজ সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। বাংলাদেশ-ভারতের রেল আধিকারিকরা প্রস্তাবিত আগরতলা-আখোরা রেলপথ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকাতে মিলিত হন। ভারতীয় আধিকারিকরা দাবি করেন, দিল্লি অতি দ্রুততার সঙ্গে এই রেলপথ নির্মাণ করতে ইচ্ছুক, যাতে করে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রস্তাবিত রেলপথটি নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে ৬০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার্য করেছে। ভারত এই প্রস্তাবিত রেলপথটিকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০ ফুটের একটি কন্টেনার সড়ক পথে দিল্লি থেকে ঢাকা পৌঁছোতে প্রায় ৩০ দিন সময় নেয় এবং এর জন্য খরচ করতে হয় প্রায় ২৫০০ মার্কিন ডলার। কিন্তু রেলপথের মাধ্যমে দুই দেশকে যুক্ত করা গেলে এই একই কন্টেনার দিল্লি থেকে ঢাকা পৌঁছোতে প্রায় ৪-৫ দিন সময় নেবে এবং খরচও অনেকটা কমে প্রায় ৮৫০ মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়াবে বলে সমীক্ষা দাবি করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত রেলপথটি ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে— যার সদস্য রাষ্ট্র ভারত-বাংলাদেশ। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি অংশ হিসেবে ভারত তার রেলপথটিকে মায়ানমারের মোরে (Morre) অবধি বিস্তৃত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার ফলে বাংলাদেশ লাভবান হবে।

প্রস্তাবিত আগরতলা-আখোরা রেলপথটি চালু হয়ে গেলে ত্রিপুরা হবে ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য যে বাংলাদেশের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হল একমাত্র রাজ্য যে বাংলাদেশকে রেলপথে যুক্ত করেছে। আগরতলা-আখোরা বাদ দিয়ে আরও কতকগুলি রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে—

১. Chilanati (Bangladesh) - Haldabari (India); হলদিবাড়ি হয়ে এই রেলপথটিকে নেপাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে।

২. Shahbazpur (Bangladesh) - Mahishashan (India)

৩. Birol (Bangladesh) - Radhikapur (India); একটি প্রস্তাবিত ব্রডগেজ লাইন।

তাছাড়া বাংলাদেশ ট্রানজিট হিসেবে নেপালকে যুক্ত করতে পারে—

৪. Rahampur-Singabad ব্রডগেজ রেললাইনের মাধ্যমে।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে এলে ভারত-বাংলাদেশকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেয়। তাছাড়া অতিরিক্ত ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণের জন্য এই সাহায্য প্রদান করা হয়েছে, যার বেশিরভাগটা রেলপথ নির্মাণ, রেলব্রিজ নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য।

বাংলাদেশ রেলকে সম্প্রসারিত করার জন্য ১০টি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন বাংলাদেশকে ভারত বিক্রি করবে, যার জন্য খরচ পড়বে প্রায় ৩৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর সঙ্গে ঢাকাকে ১২৫টি যাত্রীবাহী ব্রডগেজ কোচ বিক্রি করবে। বাংলাদেশের তিতাস নদীর উপর একটি রেলব্রিজ নির্মাণ করবে ভারত, যার জন্য খরচ হবে ১২০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশকে ৫০টি বিশেষ আর্টিকুলেটেড বাস দিচ্ছে ভারত। প্রথম দফায় তার ২০টি ঢাকায় পৌঁছে গেছে। এছাড়াও দুই দেশ কিছু ঐতিহাসিক জায়গাকে রেললাইনের মাধ্যমে যুক্ত করতে আগ্রহী। তার মধ্যে অন্যতম হল খুলনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ।

৩.৩.৪ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ভারত সরকার ব্যবহার করতে পারবে

ভূ-কৌশলগত রাজনৈতিক দিক দিয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের অবস্থান অতি তাৎপর্যপূর্ণ। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর। এটি চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরটিকে ব্যবহার করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুরোধ করা হয়েছিল। অবশেষে শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লি সফরে এসে ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের আশ্বাস প্রদান করেন। বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী মো. ফারুক খান ২০১১ সালের জুন মাসে মেঘালয়ের কালিয়াচকের 'বর্ডার হাট' (Border Haat) উদ্বোধনে এই ঘোষণা করেন এবং ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী আনন্দ শর্মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী জনাব ফারুক খান ঘোষণা করেন, ভারত শুধুমাত্র চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর নয়, বাকি বন্দরগুলিকেও ব্যবহার করতে পারবে। বাকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র— নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারও ভবিষ্যতে আমাদের বন্দরগুলিকে ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে। চট্টগ্রাম ও বাকি বন্দরগুলিকে ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশ একটা ব্যাপক অঙ্কের শুল্ক আদায় করতে পারবে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতির কাজ করবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সামগ্রিকভাবে ব্যাপক উন্নতি লাভ করবে। কলকাতা বন্দর থেকে সামগ্রী পাঠাতে যে অর্থ ও সময় লাগে, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের ফলে তার থেকে খরচ ও সময় অনেক বেশি সাশ্রয় হবে। ফলে বাংলাদেশর কাছে একটি নতুন বাজারের দরজা খুলে যাবে। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মা বলেন, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান সম্পূর্ণ করবেন।

ভারতের কাছে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষিণ-এশিয়ার রাজনীতিতে চীন ক্রমশই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়— ভারতকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, যাতে করে ভারত চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না উঠতে পারে। চীন পাকিস্তানের গদর সমুদ্র বন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়েছে। দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার বন্দরের আধুনিকীকরণের দায়িত্ব নিয়েছে চীন এবং নিজের প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। মায়ানমারের Sittwe সমুদ্র বন্দরের ব্যবসার অধিকারও চীনের হাতে। এর ফলে ভারতের কাছে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের গুরুত্ব অধিক মূল্যবান। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর নয়, মংলা বন্দরকে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষকে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হবে। অতি দ্রুততার সঙ্গে মাল-সামগ্রী ভারতে পৌঁছোনো সম্ভব হবে। তাছাড়া অগভীর কলকাতা বন্দরের অবস্থা বর্তমানে অতি সংকটজনক। কলকাতা বন্দরের এই বেহাল দশার কথা মাথায় রেখে মংলা বন্দরের ব্যবহার অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরগুলিকে ব্যবহার করে শুধুমাত্র ভারত লাভবান হবে না; বাংলাদেশও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ করের মাধ্যমে প্রত্যেক বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। চট্টগ্রাম-মংলা বন্দরের আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। ভারত-বাংলাদেশের বন্দরগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করবে। ফলে বন্দর আধুনিকীকরণের খরচ বাংলাদেশকে বহন করতে হবে না। চট্টগ্রাম-মংলা বন্দর থেকে দ্রব্যসামগ্রী সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে ভারতে পৌঁছোবে। বাংলাদেশের বর্তমান নির্মিত সড়কের পরিবহন ক্ষমতা অতি দুর্বল। তার ফলে বাংলাদেশের সড়ক যাতায়াত ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারত সরকার বাংলাদেশকে তার সড়ক ও পবিরহন রেল যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য ঢাকাতে পৌঁছে দিয়েছে। আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠার পর বাংলাদেশ বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হয়ে উঠবে বলে পর্যবেক্ষণকারীরা দাবি করেন।

৩.৩.৫ ভারত-বাংলাদেশ তুলনামূলক আলোচনা

দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। বিপরীতে জনসংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তন এবং অর্থনৈতিক আয়তনের বিচারে ভারতের সঙ্গে এর কোনো তুলনা চলে না। ভারত হল সারা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর অর্থনীতি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভারতের দ্বারা উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে বেষ্টিত, দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার।

শারীরিকভাবে ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক হওয়ায় এটা খুবই স্বাভাবিক যে বৃহত্তম প্রতিবেশীর সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকবে। তাই এটা একেবারে আশ্চর্যজনক নয় যে, ভারত হল বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক সহযোগী।

তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের থেকে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে ভারত। সর্বোপরি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারত বাংলাদেশকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষমতা রাখে, যা বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক ঘাটতির কারণ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের শুধু ভৌগোলিক সম্পর্কই নয়, ভাষাগত, ধর্মগত, সাংস্কৃতিক অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস এবং উৎসবেরও সাদৃশ্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক এই বন্ধন দুই দেশের মানুষের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক বন্ধন ও বাণিজ্যকে নিবিড় করেছে। সর্বোপরি, দুই দেশই বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন United Nations Conference and Trade and Development (UNCTAD), World Bank, IMF and WTO। এছাড়াও দুই দেশই SAARC এবং BIMSTEC-এর মতো আঞ্চলিক জোটে যুক্ত। সর্বোপরি, বিশ্বব্যাঙ্ক দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশকেই এক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নশীল সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে।

Table - 1

Bangladesh-India Demographic and Economic Performance Indicators: 2015

Democraphic & Economic Indicators	India	Bangladesh	India-Bangladesh Ratio (Times)
Population (Million)	1,311	161	8.14
Area ('000 sq. km.)	2,973	130	22.87
Population Density (Population per sq. km)	441	1,237	0.36
GDP (PPP $) (million PPP $)	7,998,278	537,659	14.88
GDP per Capita (PPP $)	6,101	3,339	1.83
Population Growth Rate (%)	1.2	1.2	1.00
Real GDP (PPP $) [Growth rate (%)]	7.56	6.55	1.15
CPI Inflation Rate (%)	5.87	6.20	0.95

Sources: Michigan State University Gobaledge database, the World Bank Development indicators and author's calculations.

ভারত বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জাতিগত বিভিন্নতা যেমন অনেক বেশি, তেমনি শ্রম সম্পর্ক ও শ্রমিকের দক্ষতার মানে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা অবস্থানে অবস্থিত। একইসঙ্গে রাজনৈতিক

স্থিতাবস্থা, স্থায়ী ও সুস্বীকৃত গণতান্ত্রিক অনুশীলন এবং শক্তিশালী পরিকাঠামো ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থান রয়েছে। বাংলাদেশ সেদিক থেকে দেখলে কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি সমসত্ত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্র, যে দেশে দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার অভাব লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদের দিক থেকে জঙ্গল-নদী-পাহাড় সমাকীর্ণতার দিক থেকে ভারত বাংলাদেশের থেকে বহুগুণ এগিয়ে।

এই সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি দুই দেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। সাদৃশ্যর দিক থেকে বলা যায়, দুই দেশেই সস্তা শ্রমিকের উপস্থিতির কারণে শ্রমনিবিড় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুই দেশেরই আগ্রহ থেকেছে। বস্ত্র শিল্প ও চর্ম শিল্পের ক্ষেত্রে দুই দেশেরই বাণিজ্যিক বিনিয়োগ থেকেছে। অন্যদিকে, বৃহৎ প্রতিযোগী হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভারতের ভূমিকা সবসময় আলোচ্য বিষয়।

Rather and Gupta ২০১৪ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যেকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাণিজ্যের বিকাশ ঘটাতে পারে এবং এই বিকাশ কীভাবে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বাণিজ্যিক ঘাটতিকে কমিয়ে আনতে পারে, তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিশেষত অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরামের সঙ্গে বাণিজ্যের বিকাশ কীভাবে ওই সকল এলাকার রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তার উল্লেখ করেছেন। কাশ্যপের মতে, ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয় প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রী।

নীচের দুটি রেখাচিত্র ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সামগ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের চিত্রটিকে স্পষ্ট করে—

Table - 2

Bangladesh and India Global Trade Performance Comparison: 2015

Trade Performance Indicator in the Global Context	India	Bangladesh	India-Bangladesh Comparison
Average Trade as % of Country GDP	24.8	22.4	Similar
Goods Exports as % of World Goods Exports	1.62	0.20	India Stronger
Goods Export World Rank	19	60	India Stronger
Goods Imports % of World Goods Imports	2.34	0.24	India Stronger
Goods Imports World Rank	13	54	India Stronger
Service Exports as % of World Service Exports	3.27	0.04	India Stronger

Service Exports World Rank	8	109	India Stronger
Service Imports as % of World Service Imports	2.65	0.19	India Stronger
Service Imports World Rank	10	63	India Stronger

Sources: WTO (2016) and author calculations

Table - 3

Bangladesh-IndiaTrade, Trade Balance and Trade Growth

2009-2016

Year	Exports (X) (Million US $)	Imports (M) (Million US $)	Tade (= X + M) (Million US $)	Exports as % of Trade	Trade Balance (TB) = (X-M) (Million US $)
2009-10	304.62	3,202.1	3,506.72	8.69	-2,897.48
2010-11	512.5	4,560.04	5,072.51	10.10	-4,047.51
2011-12	490.42	4,758.89	5,249.31	9.34	-4,268.47
2012-13	563.96	4,776.90	5,340.46	10.56	-4,212.94
2013-14	456.63	6,035.51	6,492.14	7.03	-5,578.88
2014-15	527.16	5,828.1	6,355.26	8.29	-5,300.94
2015-16	689.62	5,452.9	6,142.52	11.23	-4,763.28
Growth Rate 2009-10 to 2015-16	226.39	170.29 (182.01 at Peak Year)	175.16	NA	164.39
Annual Average growth rate (%)	37.73	28.38 (30.33 at Peak Year)	29.19	NA	27.40

Sources: DCCI 2016 and Author Calculations; Inter- and Intra-Industry Trade Relation b/w Bangladesh and India, Empirical Result, Anisul M. Islam, Sage.

উপরোক্ত সারণী চিত্র থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, এবং তা হল— প্রথমত, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত হল নিয়ন্ত্রক ও প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং বাংলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের বিভিন্নতায় ভারত অনেক বেশি বৈচিত্র্যসম্পন্ন সামগ্রী উৎপাদন করতে সক্ষম এবং শক্তিশালী শ্রম সম্পদকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা তার রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের দিক থেকে নির্দিষ্ট কিছু উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায়ু রাখার ক্ষমতা রয়েছে, যেমন বস্ত্রশিল্প। কেননা এছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদিত সামগ্রীর বৃহৎ অংশ ভারত থেকে আমদানিকৃত কৃৎকৌশল ও কাঁচামাল আমদানির

মাধ্যমে। রপ্তানি বাণিজ্যের বহর বিস্তৃত না হওয়ায় তাই বাংলাদেশের দিক থেকে স্থায়ী বাণিজ্যিক ঘাটতি একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

২০০১-০২ সালে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন ডলার, ২০০৬-০৭ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২.৫৬ বিলিয়ন ডলার এবং ২০০৭-০৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩.৬১৬ বিলিয়ন ডলার। দুই দশকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ৪৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার এই উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে, দুই দেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত যে সকল প্রতিকূলতা রয়েছে, তা দূর করে যদি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়, বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যে সকল অসমাধিত বিষয়গুলি রয়েছে তার সমাধান করে দুই দেশের শিল্পপতি, বণিক ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতি করা যায়, তবে অবশ্যই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।

* একবিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারত ৪,৫৪০ কোটি টাকা (১ বিলিয়ন ডলার) ঋণ প্রদান করেছে বাংলাদেশকে। এই অভূতপূর্ব ঋণ ও অনুদানের উদ্দেশ্য বাংলাদেশে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যার মধ্যে রয়েছে রেললাইন, ব্রিজ ও নতুন রেল কোচের নির্মাণ।
* ৪৭টি বাংলাদেশি পণ্যকে ভারতীয় বাজারে শুল্ক মুক্তও করা হয়েছিল।
* বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য ভারতী টেলিকম গ্রুপ সে দেশে ১ বিলিয়ন ডলার অর্থ বিনিয়োগ করেছে।
* টাটা (TATA)-র সঙ্গে যৌথভাবে ভারতের MERU Taxi বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনে ২০ হাজার রেডিও ট্যাক্সি নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।
* ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ আড়াইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে এক হাজার মেগাওয়াট (বাংলাদেশের বার্ষিক বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ হাজার থেকে দেড় হাজার মেগাওয়াট)।

নিকটতম প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র, যারা প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার ব্যাপী সীমান্তের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে সীমান্ত বাণিজ্য বিকাশের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার যে সচলতা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, সেদিকে নজর দিতে পারেনি। সাম্প্রতিক সময়ে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কতকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

* বাংলাদেশের আণুগঞ্জ ও অসমের পিলঘাটকে কেন্দ্র করে সীমান্ত বাণিজ্যের বিস্তার ঘটানো।
* বাংলাদেশের মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারত অবাধে যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই সংক্রান্ত চুক্তি।
* আখাউড়া ও আগরতলার মধ্যে ১৪ কিলোমিটার রেলপথ গড়ে তোলার জন্য ভারত অর্থনৈতিকভাবে বিনিয়োগ করবে, যার ফলে কলকাতা ও আগরতলার দূরত্ব কমে দাঁড়াবে ৫৫০ কিলোমিটার।

* বাংলাদেশ রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ রেলওয়ে লাইন ব্যবহার করবে নেপালের সঙ্গে তার বাণিজ্য বৃদ্ধি করার জন্য।
* বাংলাদেশের নদীগুলির সংস্কার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নৌপরিবহন ও বন্দরগুলির বিকাশে যে পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে ভারত সম্পূর্ণ সহযোগিতার বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সীমান্ত এলাকায় দুই দেশই ৬.৩ কিলোমিটার প্রশস্ত এলাকা ছাড় দিয়ে নিজ নিজ সীমান্ত সীমারেখা নির্মাণ করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে—

* ত্রিপুরার বেলোনা সাব-ডিভিসন ওই মুহুরি ঘাটকে স্থলসীমান্ত বন্দর হিসেবে বিকশিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের ফেণী বন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী। সিমেন্ট হল এই এলাকার প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য।
* সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ভুটান এবং নেপাল থেকে বাণিজ্যিক ট্রাকগুলি বাংলাবাধ-ফুলবাড়ি এলাকার ২০০ মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে।
* ভারতের সাবরুম ও বাংলাদেশের রামগড়; ভারতের দেমাগিরি ও বাংলাদেশের যেগামুখকে সীমান্ত বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে বিকশিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
* দাহগ্রাম এবং আমড়াপোতা এলাকায় বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার প্রভাব পড়বে ১৫,০০০ জনসমষ্টির উপর।
* নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে আরও বেশি স্থানীয় হাট বা বাজার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পারস্পরিক সুস্থ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতি ছাড়া কখনোই সুস্থায়ী বাণিজ্যে বিকাশ সম্ভব নয়। এই উপমহাদেশে যে যে সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, উন্নয়ন ঘটেছে বাণিজ্যেরও। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের স্তরে বোঝাপড়া গড়ে তোলার লক্ষ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল—

* ভারত ঘোষণা করেছে সহস্রাধিক বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রদান করার।
* যৌথ চিত্র প্রদর্শনী, নাটক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নেওয়ার।
* ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ভারতের Archaeological Survey of India ও বাংলাদেশের Department of Archaeology-র মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ভারতের সাহিত্য একাডেমীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশি লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি স্তরে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

* নির্দিষ্ট রেডিও ও টেলিভিশন সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং টেলি উপস্থাপক ও বৈদ্যুতিক মিডিয়ার অন্যান্য ব্যক্তিত্বের যৌথ সংযোগ, যৌথ উদ্যোগে সিনেমা তৈরি— সব কিছু এর অধীনে এসেছে।
* দুই দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও বিনিময় ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের GDP বৃদ্ধি হয়েছে ৭.৩ শতাংশ, যা অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত অনুসারে আরও বৃদ্ধির দাবি রাখে। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের বৃদ্ধি ভারত ও চীনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে কেউ কেউ মনে করে। বাংলাদেশের গড় আয় বর্তমানে বার্ষিক ১৭৫০ ডলার এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা ২০১৮ সালের রিপোর্টে কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশ। পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের মুদ্রার অবস্থা স্থিতিশীল। যদিও এই বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য সমস্যাগুলি লক্ষ্যনীয়। তার মধ্যে প্রথম হল বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ৪০ শতাংশই মূলত একটি নির্দিষ্ট শিল্পে কেন্দ্রীভূত এবং তা হল বস্ত্রশিল্প। অন্যান্য শিল্পের বৃদ্ধি ও বিকাশ তেমন আশানুরূপ নয়। জীবন বিপন্ন করে বাংলাদেশি নাগরিকরা শুধু ভারত নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশেও চলে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের মতোই বাংলাদেশে শহুরে নাগরিক সমাজ ও গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান তৈরি হচ্ছে ও তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। দুর্নীতি দুই দেশেরই সরকারি প্রতিষ্ঠানের সবকটি স্তরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাঁচামালের অপ্রতুলতা বাংলাদেশে যেকোনো পরিকাঠামো সংস্কারের অন্যতম প্রধান বাধা। চলমান সমস্যাগুলির সঙ্গে যে সমস্যার বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছে, তা হল পরিবেশের সামগ্রিক বিপর্যয় ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি। বাংলাদেশের স্থলভাগের ৪০ শতাংশই সমুদ্রস্তরের ১২ মিটার নীচে অবস্থিত। সাম্প্রতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে অনুপাতে, তাতে গবেষকদের মতে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৩০ কোটি মানুষ ১ লক্ষ ২০ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকাতে বাস করতে বাধ্য হবে এবং একইসঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে উচ্ছেদের মুখোমুখি হবে জনসংখ্যার ৭ শতাংশ।

দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনও যে প্রতিবন্ধকতাগুলি রয়ে গেছে, সেগুলি সমাধান করে আগামী দিনে বাণিজ্য সম্পর্কের বিস্তার ও বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়াস নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সামরিক শাসনের পর্ব পেরিয়ে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এক সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের দিকে তার যাত্রা শুরু করেছে। উপমহাদেশের অন্যতম শক্তিশালী সহযোগী হিসেবে ভারত এক্ষেত্রে কতটা পরিপূরক ভূমিকা নেয়, তাই এখন দেখার।

৩.৩.৬ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌ-বাণিজ্য

প্রায় ২১,৭৩,০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বঙ্গোপসাগরের বিস্তার। এই সমুদ্র ও তাকে কেন্দ্র করে রণনীতি বিগত বছরগুলিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগরের রণনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে এই সমুদ্র দক্ষিণ-এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বিশেষত বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারত ও চীনের উত্থান ক্ষমতার ভারসম্যে এক বড়ো রকমের পরিবর্তনকে সূচিত করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গোপসাগরের তীর ধরে অবস্থিত দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সমুদ্রকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের মূল্যায়ন জরুরি। ভারতের দিক থেকে সাগরমালা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বন্দর এলাকা গড়ে তোলা ও বন্দরের পরিকাঠামোর বিকাশ যেমন এর আওতায় পড়ে, তেমনই বাংলাদেশের দিক থেকে Maritime Affairs Unit (MAU) গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে জলপথে সশস্ত্র ডাকাতি, চোরাকারবারি রোধ সহ বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ভারতের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-বন্দর রয়েছে, যার মধ্যে সাতটি পূর্ব উপকূলে অবস্থিত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সহ। এর মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য মূলত পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া, উড়িষ্যার পারাদ্বীপ, অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম এবং তামিলনাড়ুর চেন্নাই বন্দর অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কলকাতা বন্দর। কলকাতা বন্দর থেকে বার্ষিক রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৬৬ টন, যেখানে হলদিয়া বন্দর থেকে আমদানির পরিমাণ ১৭,৬৮২ টন। এই পরিমাণই বুঝিয়ে দেয় এই বন্দরগুলির গুরুত্ব। বাংলাদেশের দিক থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুটো গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দরহল চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর, যার মধ্যে প্রথমটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। এই দুই বন্দরের উপর সামগ্রিক চাপ হ্রাস করার জন্য পটুয়াখালির পায়রাবন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে মাতারবাড়ি বন্দর, যার কাজ শেষ হলে বিশ্লেষকদের ধারণা তা দক্ষিণ এশিয়ার আর এক গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর কলম্বোকে ছাপিয়ে যাবে। এছাড়া গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে সোনাদিয়া বন্দরটিকেও যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সমুদ্রপথে পরিবহন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম খরচসাপেক্ষ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। যেখানে জ্বালানির সাশ্রয়ও অনেক বেশি পরিমাণে হয়। সামগ্রিক বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই জন্যই সমুদ্র বাণিজ্যের বিস্তারের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে দেখা হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে Coastal Shipping Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দুই দেশের নৌবন্দর সমূহের কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি কলম্বো বা সিঙ্গাপুরকে এড়িয়ে পারস্পরিক যোগাযোগের সূত্রও বেড়েছে। এছাড়া ভারতীয় পণ্য ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত বাংলাদেশি ভেসেলগুলি উপকূলবাহিনীর থেকে অনেক বেশি ছাড় পেয়ে থাকে অন্য দেশের তুলনায়। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রুড অয়েল, চাল, চামড়া, কসমেটিকস, ওষুধ, প্লাস্টিক সহ বিপুল পরিমাণ

পণ্যসামগ্রী ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়ে থাকে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলি শূন্য অবস্থায় ফেরত আসে, এর অর্থ আমদানি যথেষ্ট কম হয়। Inland Water Transport-এর ক্ষেত্রে যে সকল বাধা-বিপত্তি রয়েছে, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুই দেশ তার সমাধান করার আন্তরিক চেষ্টা করছে।

বঙ্গোপসাগর তার ঝোড়ো আবহাওয়া ও সাইক্লোনের জন্য সুবিখ্যাত। সুনামি সদৃশ ভয়াবহতা এখানে প্রায়শ লক্ষ করা যায়। ভারতের পূর্ব উপকূল এমনই Cyclone High Damage Risk Zone হিসেবে বিখ্যাত এবং প্রতি বছর মে-জুন থেকে অক্টোবর-নভেম্বর মাস পর্যন্ত ন্যূনতম তিনটি সাইক্লোনের ঘটনা এখানে ঘটে থাকে। এছাড়া ধারাবাহিক বন্যা, ভূমিকম্প ও সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি বিষয়ও নিত্যনৈমিত্তিক। বাংলাদেশ শারীরিকভাবে ভারতের সন্নিকটে অবস্থান করায় এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বাভাবিক ভাগীদার।

যেহেতু দুই দেশের এক বড়ো সংখ্যক জনসমষ্টি এই উপকূলীয় এলাকায় বাস করে এবং জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা সমুদ্রের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল, ফলত এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনজীবনকে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পশ্চিমবঙ্গে যেকোনো সাইক্লোন বাংলাদেশের উপর তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং উলটোটাও সত্যি।

দ্বিপাক্ষিকভাবে তাই এইসকল বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য যৌথ উদ্যোগ জরুরি। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নয়, দুই দেশের উপকূলীয় মানুষদেরও যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে পারে। এই সকল বন্দরগুলি নিজেদের মধ্যে Hot Line যোগাযোগ রাখা, বন্দর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের যৌথ ট্রেনিং ও উপকূলীয় বাহিনীর যৌথ মহড়ার মধ্যে দিয়ে এই ধরনের আকস্মিক সংকট বহুক্ষেত্রে সামাল দেওয়া সম্ভব। পরিবেশের নিরাপত্তা ছাড়া যেহেতু বাণিজ্যের বৃদ্ধি সম্ভব নয়, তাই দুই দেশের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নে যৌথ গবেষণা ও সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর টিম গড়ে তোলা অবশ্যম্ভাবী রূপে নিতে হবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য ও বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান চৈনিক আগ্রাসনকে রুখে দেবার জন্য ভারত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা নিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বহুবিধ বাংলাদেশি পণ্যকে শুল্কমুক্ত বলে ঘোষণা করা। যেখানে চীনের লক্ষ্য হল বাংলাদেশকে ঋণের ফাঁদে বেঁধে ফেলা ও দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য ঘাটতির দিকে নিয়ে যাওয়া, সেখানে ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশি পণ্যের বিস্তারের মধ্যে দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির এক নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ সালে চীনের রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্য পণ্যের মূল্য ছিল ১৩,৬৩৮ মিলিয়ন ডলার, যেখানে বাংলাদেশের চীনের সঙ্গে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণ ছিল ৫৩৮ মিলিয়ন ডলার। একাধারে এই একই বছর ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণ ছিল ৯.২১ বিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশের ভারতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১.০৪ বিলিয়ন ডলার।

২০১৫ সালে ভারত-বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রী জয়শঙ্কর বলেছিলেন, ''What it has done is, it has really created a climate of confidence, of goodwill,

of trust, where a lot of other initiatives which could have happened, should have happened, can now happen ... there is an enormous sense today of optimism and confidence about the entire relationship." এই পর্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশ সামুদ্রিক সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া আসে।

* নৌবন্দরগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাণিজ্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
* ১৯৭২ সালে Protocol Inland Water Ways Transit and Trade (PIWTT) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং তৃতীয় কোনো দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই দুই দেশ যে পরস্পরের বন্দরকে অগ্রাধিকার দেবে তা স্থির হয়।
* ভারত ও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে ব্যবহার করতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এবং আগরতলা-চট্টগ্রাম, মংলা-সুতারকান্তি জলপথ যে দুই দেশই ব্যবহার করবে পরস্পরের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে তা স্থির হয়।
* বঙ্গোপসাগরে যৌথ মহড়া, যৌথ বোঝাপড়া ও দুই দেশের বিভিন্ন সংকটকে কেন্দ্র করে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়।
* দুই দেশের উপকূল রক্ষী বাহিনী সমুদ্রপথে অপরাধ নির্মূলীকরণের জন্য যে একসঙ্গে কাজ করবে, তা স্থির করে।
* ভারতের Council of Scientific and Industrial Research এবং Dhaka University যৌথভাবে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় রত হবে ও অর্থ বিনিয়োগ করবে তা স্থির করে।
* জাতীয় সার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক বোঝাপড়া, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক বিধিকে মান্যতা দিয়ে যে সকল বোঝাপড়া দুই দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তা বাস্তবায়িত হলে সমুদ্রবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের উন্মোচন হবে। বাংলাদেশ সফরের সময় প্রধামন্ত্রী মোদি শেখ হাসিনাকে INS Vikrant-এর একটি প্রতিরূপ উপহার দিয়েছিলেন। এ কথা মনে রেখে যে, INS Vikrant বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যের বিকাশ সেই অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বলে অনেকেই মনে করে।

৩.৪ নাগরিক সমাজের ভূমিকা

৩.৪.১ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

বাংলাদেশ এবং ভারত— দুই দেশেই এক সমৃদ্ধ নাগরিক সমাজ রয়েছে, যদিও সাধারণত দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেই নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে বড়ো করে দেখা হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রেও নাগরিক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম *Daily Star*-এর মতে, ''Better relations between India and Bangladesh could be established only if the two countries emphasise a 'People to People' approach. Here, the role of civil society, academic institutions, NGOs, media and information technology are noteworthy in formulating and shaping policies.'' রাজনৈতিক নীতি প্রণেতাদের নাগরিক সমাজ প্রস্তাবিত নীতির সম্ভাবনা ও বাস্তবতা সম্পর্কে যেমন অবহিত করতে পারে, তেমনই নতুন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার যোগসূত্রটিও হতে পারেন নাগরিক সমাজ।

বহু ক্ষেত্রে বলা হয়, সংবাদ মাধ্যম ও বিভিন্ন ধারার গণমাধ্যম আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে। Craig মনে করেন, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। মিডিয়াই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে জনগণের কাছে সহজবোধ্য করে তোলে। যদিও অনেকেই এর বিপরীত মত পোষণ করেন। Karl Further-এর মতে, ''Governments today talk not so much to each others through the media. The use of the media to pre-empt governments may often delay normal diplomatic relations or create foreign policy crises largely unanticipated by governments. Government misuse of the media has also led to a number of dangers that mislead domestic public opinion and foreign public and governments.''

মিডিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মূলত দুটি কারণে— প্রথমত, জনগণের মধ্যে মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ও তার অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে সেটি জোরালোভাবে বিশ্বাস করে, যা মিডিয়াতে দেখানো হয়। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা নীতি-নির্ধারকরা স্বীকার করেন, যেমন ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর India-Bangladesh Joint Consultative Commission-এর ষষ্ঠ বৈঠকে বলা হয়, ''Both Ministers underscored the value of positive media reporting on the bilateral engagement between the two countries and agreed to call upon their respective media communities to play more responsible roles in this regard.''

৩.৪.১.১ ভারতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা

ভারতীয় গণমাধ্যম সাধারণভাবে বেশি আকর্ষিত হয় তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুগুলিতে, এমনকী প্রথম সারির ইংরেজি সংবাদপত্র ও চ্যানেলও অভ্যন্তরীণ ঘটনা, ব্যক্তিত্ব ও দৈনন্দিন বিষয়টি মূলত তুলে ধরে থাকে। বাংলাদেশ সম্পর্কিত খুব কম খবর ভারতীয় মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় এবং যেটুকু হয়, তা-ও অত্যন্ত নেতিবাচক ভাবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, ফারাক্কার বাঁধ নির্মান প্রকল্পের যে নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে, ভারতীয় মিডিয়ায় তা কখনো প্রচারিত হয় না। এছাড়া জলবণ্টন ইস্যু, সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য ঘাটতি, ছিটমহল ও

নৌ-সীমান্ত সংক্রান্ত বিতর্ক ভারতীয় মিডিয়ায় কখনো আলোচনা হয় না। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের এই দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ে কার্যকরী কোনো অগ্রগতি নেই। বাংলাদেশের *Daily Star*-এর সম্পাদক ও প্রকাশক মাহাফুজ আনাম এই বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন, "As a media person, I have never been able to understand the indifference of the Indian media towards Bangladesh's issues, especially those affecting bilateral relations. The saddest example is the Farakka barrage, which, in my view, was the first major cause of the rise of grassroot-level anti-Indianism in the late eighties. This lasted for decades and still lingers, but this was never reported in-depth in India by any mainstream print or audio-visual media. If fact, water sharing of our common rivers remains a blotch in our relations. The failure to even talk about Teesta, when a deal was really to be signed in September 2011, has greatly disappointed us in Bangladesh. The rationale for Bangladesh's position on this crucial water sharing issue has almost never found adequate space in the Indian media. There are many other issues that can be cited. Nothing about Bangladesh is covered except for occasional instances of communal violence— which is endemic to the subcontinent— and the so-called rise of terrorism that Bangladesh is waging a frontal onslaughter against."

এই ধরনের সাংবাদিকতার বিপরীতে বাংলাদেশের চিত্রটি আবার বিপরীত। জয়িতা ভট্টাচার্য মনে করেন, বাংলাদেশে ভারতীয় মিডিয়ার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। বিশেষত, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশিষ্ট কোনো খবর। সদর্থক খবর যেমন উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ তৈরি করে, মেনই ভুল খবর ও মনোভাব ভারতবিরোধী চিন্তাকে প্ররোচনা জোগায়। নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশে গণমাধ্যম যেহেতু একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, সেই ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয় মিডিয়া যদি আরও বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে, তবে তা আগামীদিনের জন্য কল্যাণকর হবে।

৩.৪.১.২ স্কলার ও স্কলারশিপ-এর ভূমিকা

ক্লাসরুম অনুশীলনের বাইরে গিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের বিকাশে গবেষণামূলক কাজ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আদান-প্রদানের ও একে অপরের থেকে শেখার সুযোগ থাকলেও গবেষণার সুযোগ এখনও অপ্রতুল। অথচ অ্যাকডেমিক গবেষণাই দুই দেশের মধ্যেকার সমস্যাগুলিকে ঐতিহাসিকভাবে তুলে ধরতে পারে ও সমস্যা সমাধানের রূপরেখা সামনে রাখতে পারে। একে অপরকে জানার ক্ষেত্রে এই সকল গবেষণার মূল্য অপরিসীম। যৌথ রিসার্চ প্রজেক্ট, যৌথ ফিল্ড ওয়ার্ক ও সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। জীবন্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের যে অংশ বিদ্যাচর্চা করেন ও জ্ঞানতত্ত্বের নতুন নতুন শাখার অনুসন্ধানরত, তারা কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে

পারেন, যদি রাষ্ট্রীয় স্তরে ওই ধরনের উদ্যোগ জোরদার হয়। ২০১১ সালে মনমোহন সিং-এর ঢাকা সফরের সময় দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশকিছু মৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে দু-দিনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর। ICCR-এর পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর ২০০০ বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য।

৩.৪.১.৩ নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও চাপসৃষ্টিকারী সংগঠনগুলির ভূমিকা

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতের বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক নির্ধারণে প্রায় নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries (FBCCI) এবং FICCI এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া Bangladesh-India Friendship Society (BIFS), India-Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (IBCCI), Bangladesh-India Friendship Diology, Bangladesh Foundatiuon for Regional Studies ইত্যাদি সংগঠনগুলি দুই দেশের সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Indian Chamber of Commerce (ICC) এবং IBCCI যৌথভাবে Dhaka Declaration-এ স্বাক্ষর করে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের পরিমাণ কী করে বৃদ্ধি করা যায়, সড়ক যোগাযোগ কী করে বাড়ানো যায়, পর্যটন শিল্পের কী করে বিকাশ সম্ভব, সেই লক্ষ্যে এই সকল সংগঠন কাজ করে। ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ IBCCI ও ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে ঢাকার রূপসী বাংলা হোটেলে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল Foreign Investment in Bangladesh: Opportunity and Prospects। অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলিকে কী করে ব্যবহার করা যায়, ওই সম্মেলন তা নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বণিক সমাজ, তাই দুই দেশের বণিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে আদান প্রদান যত নিবিড় হবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উচ্চতা তত এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হবে।

এছাড়া চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবী সমাজের যে অংশ দেশের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, দুই দেশেই তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং দুই দেশেরই প্রয়োজন রয়েছে তাদের কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা। সাহিত্য-সংস্কৃতি, এমনকী সংগীতের সম্মেলন, বিনোদনের জগতেও যৌথভাবে কাজ করা, যেহেতু দুই দেশেরই রয়েছে অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। এমন বহু কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে নাগরিক সমাজ দেশ ও দশের কল্যাণে এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

নিরাপত্তা— সামরিক ও অসামরিক

(Security – Military & Civilian)

বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অভিবাসীদের ভারতে আসা দীর্ঘ সময় ধরে এক বড়ো সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ ভারতে, যা ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যখন পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় সেই পর্যায়েও অক্ষুণ্ণ থেকেছে। প্রথম পর্যায়ে এই আগমন-বহির্গমনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রশ্নই ছিল প্রধান, কিন্তু ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিচিতির সত্ত্বাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা বেশিরভাগ মানুষ মূলত দারিদ্র্যজনিত কারণেই আসেন, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র অংশ ভারতে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করার অভিপ্রায়ে এসে থাকে। এই সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সরকারিভাবে অনুমান করা হয় যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নাগরিক ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ অন্য রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করে। যদিও বেসরকারি মতে, এই সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। ভারতবর্ষের বড়ো শহরগুলিতে এই অভিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকরা সস্তা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবশ্য বাংলাদেশি নাগরিকদের এক বড়ো অংশ সম্পন্ন ব্যবসায়ী ও কৃষিজমির মালিক হিসেবে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা গত ১০০ বছর ধরে নির্মাণ করেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি অংশ উদ্বাস্তু, অভিবাসী ও বেআইনি অভিবাসীদের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছেন। উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাদের তারা বলেছেন, উদ্বাস্তু হলেন তারাই, যাদের পক্ষে কোনোভাবেই আর দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় রাজনৈতিক-ধর্মীয় আক্রমণের ভয়ে এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে। অভিবাসী হলেন তারা, যারা স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছেন উন্নত জীবনধারণের জন্য, কারণ স্বদেশ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি তার জীবিকা নির্বাহের অনুকূল ছিল না। বেআইনি অভিবাসী হলেন তারা, যারা সুনির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রে প্রবেশ করেন অথবা ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরও সেখানে থেকে যান। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পরে এই বেআইনি অভিবাসনের পরিমাণ বেড়েছে, যদিও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা জনস্রোতের ধারাবাহিকতা স্বাধীনতা-পূর্ব সময়কাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু সেসময় তাকে বেআইনি বলা হত না। কারণ দুই অংশই ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অভিবাসন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনা আন্তর্জাতিক স্তরে মূলত অর্থনীতির পরিধিতে সীমায়িত হয়ে থাকে। ফলত সাধারণত তারা দুটি দেশের মজুরি শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যকে তুলে ধরে অভিবাসনের কারণকে চিহ্নিত করেন এবং সুযোগ-সুবিধা বেকারত্ব এইগুলিকে মূলত তারা মূল মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেন এই আলোচনায়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বড়ো সমস্যা হল যে, এক্ষেত্রে অভিবাসন রুখতে বা তাকে গতি দিতে

রাষ্ট্রের ভূমিকা সাধারণ অনালোচিত থেকে যায়। অর্থনৈতিক কারণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এছাড়াও দেশ-দেশান্তরে আরও বহুবিধ কারণ উপস্থিত থাকে। যেমন অর্থনৈতিক কারণ এটা ব্যাখ্যা করে না যে, কোনো একটি দেশে কোনো একটি নির্দিষ্ট জনসম্প্রদায় বা সমষ্টি কেন বার বার আক্রমণের মুখোমুখি হয়। এখানেই আসে নিরাপত্তার প্রশ্নটি। যে নিরাপত্তার অভাবে কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক গোষ্ঠী অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হয় বা কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী আশ্রিত দেশে নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ বলে চিহ্নিত হয়।

বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে যোগাযোগের সুবিধা অভিবাসন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করেছে। এর যেমন একদিকে সুবিধা আছে, যে সুবিধার ফলে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারের মেধা ও দক্ষতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে, তেমনই বহু ক্ষেত্রে এই অভিবাসন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ বলে চিহ্নিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, সুষ্ঠ অভিবাসনের জন্য অভিবাসীদের ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষঙ্গ, পরিবার ও জনজাতির উৎস সহ বহুবিধ বিষয়ে সন্ধান যদি সুনিবিড়ভাবে করা যায়, তবে অনেক সমস্যার মোকাবিলা সহজে করা যায়। রাজনৈতিক সংকটের ফলে বড়ো আকারের অভিবাসন বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর বিকশিত হওয়ার অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে। যেমন ২০০১ সালে ৯/১১ হামলার পর এটা প্রমাণ হয়ে যায়, দেশের মধ্যে হামলাকারীদের উৎস দেশীয় অভিবাসীদের মধ্যে হওয়া সম্ভব। World Trade Centre-এ হামলার পর পশ্চিমি দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ নিজস্ব অভিবাসন নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। একইসঙ্গে এই বোঝাপড়ারও নির্মাণ হয় যে, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার জনবিস্ফোরণ নিঃসন্দেহে বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। এই সকল এলাকায় হতাশ, বিপথগামী, মূল্যবোধহীন ও ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা যুব সম্প্রদায় আল-কায়দার মতো জঙ্গি সংগঠনকে বিকশিত করার হাতিয়ার হতে পারে। বড়ো আকারে বেআইনি অভিবাসন করাচি, উত্তর পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স এবং বালুচিস্তানকে শাসনে অযোগ্য বলে প্রমাণ করেছে। বিবিধ ইসলামিক জেহাদি সংগঠনের উর্বরভূমি হয়েছে এই সকল এলাকা। করাচি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা বহুক্ষেত্রে প্রকাশে বলেছেন, বেআইনি অভিবাসনকে রুখে দিতে পারলে ইসলামীয় মৌলবাদকে লাগাম পরানো সম্ভব। লাগামছাড়া বেআইনি অভিবাসন ভারতের ক্ষেত্রেও আগামী দিনে এক স্থায়ী সংকটের জন্ম দিতে চলেছে।

অনেকেই মনে করেন, অন্য দেশে অভিবাসী প্রেরণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এক অঘোষিত কর্মসূচি। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে মুসলিম লিগ এই অবস্থান বহন করত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুজিবর রহমানের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশ কখনোই সমগ্রতা লাভ করতে পারে না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনেকেই এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, অন্যদেশে প্রভাব বিস্তার করার একটা কার্যকরী উপায় হিসেবে এই অভিবাসীদের স্থানান্তরের বিষয়টিকে দেখা হয়ে থাকে এবং এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিও। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে সামরিক অভিযানের ক্ষমতা যেহেতু তার নেই, তাই অভিবাসীদের মাধ্যমে নিজের প্রভাব বলয় বৃদ্ধির জন্য সে সচেষ্ট।

সীমান্তে কাঁটাতার দেবার প্রশ্নটিকে বাংলাদেশ এক বড়ো সময় ধরে বিরোধিতা করেছে। একে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এক শত্রুভাবাপন্ন সংস্কৃতির নিদর্শন বলে তারা মনে করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। অথচ বাস্তবতা এটাই, সীমান্ত জুড়ে সঠিক কাঁটাতারের বেষ্টনী অনুপ্রবেশকে কার্যকরীভাবে রুখতে সক্ষম। বাংলাদেশ সরকার জানেন যে, পর্যাপ্তভাবে যে রসদ বিপুল সংখ্যায় তাদের কাছে রয়েছে, তা হল মানবসম্পদ। বর্তমানে বাংলাদেশি অভিবাসীরা রয়েছেন উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে, ইউরোপে, উত্তর আমেরিকা ও মালয়েশিয়াতে এবং ভারতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতারা এই সকল দেশে আরও অভিবাসী পাঠানোর বিষয়ে নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা করেছেন। বিদেশি চাকুরি ও জীবিকার বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তর থেকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখতে তাই বাংলাদেশ সরকার সচেষ্ট হবে, তা একেবারেই স্বাভাবিক নয়।

১৯৭৯ সালে বেআইনি বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ শুরু হয় অসমে All Assam Student Union (ASU)-র নেতৃত্বে। এই বিক্ষোভ যখন এক বড়ো আকারে জনমত গড়ে তোলে, তখন ইন্দিরা গান্ধী সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর সময়ে যে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, '৭৯ সালে ২৫ মার্চের পরে আসা সমস্ত বাংলাদেশি মানুষদের বে-নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের ফেরানো হবে। সেই পর্যায়ে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ১৯৯২ সালে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক গোপন রিপোর্ট অসম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বলা হয়েছিল, ''Serious dimensions as large scale infiltration has changed the demographic landscape of the borders.'' এই রিপোর্টে আরও বলা হয়, ''Hindu migrants 'have generally been staying in shanties in miserable conditions in visible concentration in south West Bengal districts' while the Muslim immigrants have fanned out to urban areas in other states, most notably in Delhi, Rajasthan, Gujrat, Maharashtra etc.'' ১৯৯৮ সালে লেফট্যানেন্ট জেনারেল S.K. Sinha-র রিপোর্টে একই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। বলা হয় যে, অনুপ্রবেশের এই পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে নিম্ন অসমের গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলি তার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারত-রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

১৯৯৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি অসমে Illegal Migrants Determination by Tribunal Act-এর পরিবর্তে আরও কঠিন আইন আনার দাবি জানায় তার নির্বাচনী ইস্তাহারে। ১৯৮৩ সালের অসম চুক্তির ধারাবাহিকতায় এই IMDT Act চালু হয়েছিল। এই আইন Foreigners Act-এর থেকে অনেকটাই পৃথক। কেননা Foreigners Act-এ যেখানে অভিযুক্তকে নিজের পরিচিতির প্রমাণ যেমন নিজেকেই দাখিল করতে হয়, IMDT Act-এর ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। IMDT Act-এ কাউকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ঘোষণা করতে হলে অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের বাসস্থানের ৩ কিমি পরিধির অধিবাসী হতে হত, এবং তাও নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে অভিযোগ দাখিল করা যেত। ভারতীয় জনতা পার্টি সেইসময় প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ক্ষমতায় আসলে তারা

National Registration of Citizen প্রণয়ন করবে। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর যার প্রয়োগ তারা শুরু করেছে।

২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের Parliamentary Standing Committee-র একটা মিটিং-এ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি সংকটজনক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং কার্যকরী মূল্যায়নের দাবি তোলেন। ভারতের বিচারবিভাগও এই প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিচার বিভাগের হাত ধরে IMDT Act রোধ করা হয়। ২০০১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিমকোর্ট তার একটি ঘোষণায় অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে ভারতবর্ষের অর্থনীতির পক্ষে বিপদমূলক বলে চিহ্নিত করেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের সীমানা কতদূর অবধি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশ ফেরত পাঠানোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান কী তার রিপোর্ট দাবি করে। Multipurpose National Citizens Card (MPNCC) গড়ে তোলার বিষয়েও কেন ফল আশানুরূপ নয়, তা জানতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে আইনজীবী K.K. Venugopal সে সময় সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত নেবার বিষয়টিতে একান্তই অনিচ্ছুক। এর ফলে Transit Campগুলিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয় বহন করতে হচ্ছে।

১৯৭৯ সালে অসম জাতীয়তাবাদীদের হাত ধরে অসম আন্দোলন ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তির হাত ধরে শেষ হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই চুক্তি অবৈধ অনুপ্রবেশের কোনো সমাধান করতে পারেনি। বরং '৮০-র দশকে অসম আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ALFA-র জন্মলাভ ঘটে। ALFA যদিও একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অসম গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রাজ্য থেকে বাংলাদেশি বিতাড়নও তার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরোধিতা বিভিন্ন স্তর থেকে বহু বছর ধরে করা হয়েছে, কিন্তু ১৯৮০-র দশকের মতো এত আলোড়ন অন্য কোনো সময়ে তৈরি হয়নি। ২০০৫ সালে Chiring-Chapori Yuva Mancha নামে একটি যুব সংগঠন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিপক্ষে আন্দোলন শুরু করে। ডিব্রুগড়ে অবস্থিত এই সংগঠন অবৈধ বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট জারি করে। যার ফলে সন্দেহভাজন বহু বাংলাদেশি শহর ছাড়তে বাধ্য হন। প্রাথমিকভাবে অসমের মানুষ মনে করতেন যে, বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিপন্নতার মুখে ফেলবে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে জমি, জমির মালিকানা ও জমির হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে। ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বোড়ো জনজাতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই পর্যায়ে রাভা জনজাতি ও মুসলিমদের সংঘর্ষও স্থানে স্থানে গড়ে ওঠে। বোড়োদের দাবি ছিল যে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা

তাদের জনজাতির ভূমির ৩৭ শতাংশ অধিগ্রহণ করেছে, যে জমির পাট্টা একসময় রাজ্য সরকার তাদের দিয়েছিলেন।

বছরের পর বছর ধরে অনুপ্রবেশের ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ত পরিবর্তনশীল থেকেছে। একদিকে উভয় অসমে আসু-র মতো সংগঠনের পক্ষ থেকে সন্দেহজনক চিহ্নিত করার যেমন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তেমনই সংখ্যালঘু সংগঠনগুলি অভিযোগ তুলেছে যে, 14th Foreigners Act তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৮ সালে জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ অসম কমিটি একটি সমাবেশে ঘোষণা করে সন্দেহভাজনের নামে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসকারী মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া চলেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে তার প্রভাব অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনুভূত হয়েছে। এই অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ যে জেহাদি ইসলামীয় গ্রুপগুলি গ্রহণ করবে, তাই স্বাভাবিক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলফা-র কার্যকরী অভিমুখের পরিবর্তন একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। যদিও অবৈধ বাংলাদেশি জনতাকে বিতাড়নের Agenda-কে সামনে রেখে আলফা-র উত্থান, কিন্তু ভারত সরকার যখন আলফা-র বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায় ২০০৩ সালে, তখন আলফা-র নেতৃত্বের এক বৃহৎ অংশ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলে। দুর্বল আলফা এই পর্যায়ে আইএসআই-এর সংস্পর্শে আসে এবং বাংলাদেশের ইসলামীয় গ্রুপগুলির সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। ২০০৮ সালে অসম পুলিশের হাত বাংলাদেশি নাগরিক S.M. Alam-এর গ্রেপ্তারির মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় আইএসআই ও আলফা-র যোগসূত্র। এই পর্যায়ে জামাত, আইএসআই, বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামীয় গোষ্ঠী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময়ে অসমে মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সরকার প্রায় ১,৪৬৬টি মাদ্রাসাকে চিহ্নিত করে, যেখানে অবাধে ইসলামীয় গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বের আসা-যাওয়া ছিল।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে নমনীয়তা নীতিকে কেন্দ্র করে আলফা-র মধ্যেও বিভাজন ঘটে। সাময়িক ঘাঁটি হিসেবে বাংলাদেশের মাটিকে যেহেতু আলফা নেতৃত্বের একটা অংশ ব্যবহার করছিল, মায়ানমারে স্থিত নেতৃত্বের অন্য অংশের সঙ্গে তাদের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ আলফা-র শক্তিক্ষয়ের অন্যতম কারণ ও তার উচ্চ নেতৃত্বের বড়ো আকারের গ্রেফতারির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধারাবাহিকভাবে অসমে আগমনের ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় মেরুকরণ প্রবলতম হয় এবং একটি নতুন শক্তি হিসেবে Assam United Democratic Front গড়ে ওঠে। প্রায় ১৪টি মৌলবাদী ও জঙ্গি সংগঠন এই সংগঠনকে সমর্থন করে। রাজনীতির আঙিনায় AUDF-এর অংশগ্রহণ কংগ্রেসকে মূলধারার শক্তি হিসেবে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে এবং ধরে নেওয়া হয়, ক্ষমতা ধরে রাখতে কংগ্রেস AUDF-এর সঙ্গে রণকৌশলগত মিত্রতায় যাবে। এবং একই সঙ্গে এই আশঙ্কাও ঘনীভূত হতে থাকে যে, ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের

সঙ্গে জোট যদি সম্ভব হয়, তবে অসমের মূলবাসী মানুষ নিজের ভূমিখণ্ডের উপর নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পর্যবসিত হবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশি মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র অসম বা ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে নয়, নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্য, যেখানে Inner-line Permit রয়েছে, সেখানেও এই প্রভাব ক্রমবর্ধমান। বিশেষত ডিমাপুর ও কোহিমায় এক বড়ো সংখ্যক বাংলাদেশি একদিকে যেমন সেখানকার স্থায়ী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে বিবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এইগুলি বাদ দিলে সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল এই বেআইনি অভিবাসী মানুষদের এক অংশ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ ও মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঐতিহাসিকভাবে নাগাল্যান্ডের সঙ্গে বাংলা বা অসমবাসী মুসলিমদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইসলামীয় মৌলবাদীদের উপস্থিতি বাড়ছে, কারণ রাষ্ট্রের দ্বারা কোণঠাসা জাতীয়তাবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী ও বাংলাদেশি মৌলবাদীদের মধ্যে এক আদর্শগত রণনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যদিও ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত বড়ো আকারে সামরিক সংঘাতে যায়নি। তার কারণ এই এলাকাকে ভিত্তি করে তারা জালনোট, মাদক ব্যবসা, আফিমের চোরাচালান ও বন্দুক সরবরাহের যে কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য— তা নিয়ন্ত্রণ করে। আগরতলা এবং অসম বিস্ফোরণে এদের কোনো কোনো গোষ্ঠী যুক্ত থাকলেও যেহেতু ভারত রাষ্ট্র বেআইনি অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে কম মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছে, তাই এদের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২০১৯ সালের পরবর্তীকালে NRC প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশি বিতড়নের প্রক্রিয়া শুরু হলেও যে প্রক্রিয়ায় NRC সম্পূর্ণ হয়েছে, তা নিয়ে অসমবাসীর মনে বহু প্রশ্ন আছে, যা এখনও অমীমাংসিত। আগামী দিনে শান্তি-সুস্থিতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর এক উত্তর-পূর্বাঞ্চল নির্মাণ করতে গেলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থের বাইরে গিয়ে যেমন রাষ্ট্রকে ভূমিকা নিতে হবে, তেমনই অতীত বহু ভুলেরও সংশোধন জরুরি।

অসমের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে রাজ্য বড়ো আকারে বেআইনি অভিবাসী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা হল পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষত সীমান্ত এলাকার গ্রামাঞ্চলে এই বেআইনি অভিবাসনের পরিমাণ এতটাই বেড়েছে যে, সেই এলাকার বহু স্থানীয় অধিবাসীদের নিকটবর্তী বা দূরের শহরে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে।

জনসংখ্যার সঙ্গে এই রাজ্যে মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত আশঙ্কার মেঘকে আরও ঘনীভূত করছে। বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ ঘটছে সামাজিক সংগঠনের ছত্রছায়ায়। ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় ৭টি মুসলিম সংগঠনকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছিল, যার মধ্যে ৪টি অতি সক্রিয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এইগুলি হল জামাত-এ-ইসলামি-এ হিন্দ, জামিয়ান-আল-এ-হাদিস, Students Islamic Movement of India, তাবলিগ-এ-জামাত। এই সকল সংগঠনের সক্রিয় সদস্যরা নিয়মিতভাবে সীমান্ত পার করে এখানে তাদের সদস্য ও সমর্থক গোষ্ঠীকে সক্রিয় করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালায় এবং অস্ত্র ও

অর্থ সরবরাহের গোপনীয় নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি ঘটায়। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রশ্নে সতর্ক ও সক্রিয় ছিলেন এবং তার নির্দিষ্ট মত ছিল যে, পূর্ব ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ জনবিন্যাসের স্থায়ী ছককে পালটে দিতে সক্ষম। ধর্মীয় মৌলবাদীরা কলকাতা ও আগরতলাকে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে, কারণ এই এলাকার ভাষিক পরিচিতির সঙ্গে তারা একাত্মতা গড়ে তুলতে পারে, আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং যেহেতু শহরের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠছে, ফলত শহরকে তাদের রসদ সংগ্রহের নেটওয়ার্ক বেস হিসেবে তারা ব্যবহার করতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে বড়ো আকারের জঙ্গি কার্যকলাপ সংগঠিত না করার অন্যতম প্রধান কারণ হল, পশ্চিমবঙ্গকে তারা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে এবং রাষ্ট্রের নজর এড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের নেটওয়ার্ককে যাতে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, সেই বিষয়ে তারা সচেষ্ট। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল, ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের মতো ঘটনা। যার মধ্যে দিয়ে একমাত্র বোঝা যায় এই নেটওয়ার্কের জাল কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এছাড়া বসিরহাট, নদীয়া, হুগলি, মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কিছু বছর ধরে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সদস্য ও সমর্থকদের ধারাবাহিক গ্রেফতারি এর ব্যাপকতা প্রমাণ করে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক হল হরকত-উল-জেহাদি-ইসলামি। এই সংগঠন ভারতবিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর জন্যই গড়ে ওঠে লসকর-ই-তৈবার সহযোগী হিসেবে। এই পর্যায়ে প্রায় ১০ ইসলামি গোষ্ঠী ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জন্য পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়— একে অপরকে সামরিক ও লোকবলের সহযোগিতা আদানপ্রদানের বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গে এই সকল গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন জেলার আধা শহর ও মফস্বল এলাকায় ও গ্রামে অসংখ্য স্লিপার সেল তৈরি করেছিল। ২০০৭ সালের মে মাসের পর থেকে এই সকল গোষ্ঠীগুলির ব্যাপক গ্রেফতারি তাদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তে শিলিগুড়ি করিডর, যা chicken neck হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে, তা গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সংযোগস্থল। শিলিগুড়ি শহর হল গুয়াহাটি, গ্যাংটক ও কিষাণগঞ্জের প্রবেশদ্বার। এই শহরের সঙ্গে তিনটি দেশের— বাংলাদেশ, ভূটান ও নেপালের সীমান্ত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল যোগাযোগ শিলিগুড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়া বাগডোগরা ও হাসিমারার মতো গুরুত্বপূর্ণ এরোড্রোম ও তেলের পাইপ লাইন শিলিগুড়িকে সংযুক্ত করেছে।

শিলিগুড়ি করিডরের ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় জনবিন্যাস বিগত বেশ কিছু দশক জুড়ে পরিবর্তিত হয়েছে। দুর্বল পুলিশি ব্যবস্থার কারণে সম্ভবপর হয়েছে এই বিপুল পরিমাণে অনুপ্রবেশ। যদিও ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে এই অঞ্চলটিকে নিরাপদে রাখার সবরকম প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার পরেও এখানকার জনঘনত্বের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও বিশালতা এই প্রয়াসের সামনে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

শিলিগুড়ি করিডর লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে যে অদ্ভুত মিশ্র জনবসতি দেখা যায়, তা আইএসআই-এর কার্যকারিতার পক্ষে এক উর্বরভূমি। এখানে চোপড়া বলে যে গ্রামটি রয়েছে, সেটি বেআইনি সীমান্ত বাণিজ্য ও জালনোটের কারবারের উর্বরভূমি হিসেবে বহুকাল ধরে চিহ্নিত। এছাড়া ইসলামপুরকে কেন্দ্র করে আইএসআই-এর কার্যকারিতা রয়েছে। এখানে আফগানিস্তান থেকে আসা বালুচ জনজাতির মানুষ বাস করেন, যা এইধরনের বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ও আইএসআই-এর আবাদভূমি। এছাড়া ১৯৬০ সাল থেকে এই এলাকায় প্রায় ৬ হাজার ইরাণীয় বসবাস করেন, যাদের অনেকেই এই ধরনের বেআইনি চোরাকারবার ও অনৈতিক কার্যকলাপকে মদত দিয়ে থাকেন।

ক্রমবর্ধমান মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি এই এলকাকে কেন্দ্র করে আশঙ্কার আরও একটি বড়ো কারণ। হরকত-উল-মুজাহিদিন শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে তার জাল বিস্তার করেছে, তাবলিগি জামাত শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে তার বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়েছে। এছাড়া বহু ইসলামীয় অ-সরকারি সংস্থা ও Trust এই এলাকায় সক্রিয়, যাদের মাধ্যমে এক বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। ধারাবাহিকভাবে ভারতবিরোধী প্রচার এই এলাকাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়ে চলেছিল।

১৯৯৯ সালে জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ যেমন ছিল একটা সূচনা, কিন্তু তার পর থেকে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। একে মোকাবিলা করার মতন উপযুক্ত সামরিক ও বেসামরিক পরিকাঠামো না থাকলে এলাকায় জনবিন্যাসকে বদলে দিয়ে আগামীদিনে শিলিগুড়ি শহরকে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা, তাকে রোখার সদিচ্ছা না থাকলে ও বাংলাদেশ থেকে ধারাবাহিক অনুপ্রবেশ রোধ না করলে সমস্যা যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে সেটা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যে এই অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভূমিকা রয়েছে, তদন্তে তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। বেশ কিছু শহরে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ যে এই সকল গোষ্ঠীরই কর্মসূচি, তা উঠে এসেছে। ২০০৪ সাল থেকে লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ, বেনারস, নিউ দিল্লি ও ব্যাঙ্গালোরে যে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাতে হুজির সম্পর্ক এক প্রমাণিত সত্য। ২০০৬ সালে রেললাইন ট্র্যাকে বিস্ফোরণ, যার ফলে নিরাপরাধ ১৮০ জনের মৃত্যু হয়, তাও হুজি গোষ্ঠীর জঙ্গি কার্যকলাপের ফল।

জয়পুরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ বাংলাদেশি ইসলামীয় গোষ্ঠীগুলি সম্পূর্ণ করেছিল। জয়পুরের বাগরোনা এলাকায় এক বিপুল সংখ্যক বেআইনি অভিবাসীদের বাস, স্থানীয় পুলিশের সূত্র অনুসারে যাদের এক বড়ো অংশ ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তানে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়া এই এলাকার বেশ কিছু বাংলাদেশিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। হুজির ভূমিকা বেনারসের বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও সামনে আসে। এক্ষেত্রে জানা যায় যে, সিমি গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ভারতবর্ষে হুজি সামরিক প্রশিক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া এই দুই গোষ্ঠী বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র শিবিরের সঙ্গে ধারাবাহিক সম্পর্কে থেকেছে। ২০০৫ সালের

২৯ অক্টোবর দিল্লি বিস্ফোরণের সূত্র ধরে সারাদেশ জুড়ে এক বড়ো সংখ্যক বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হন।

বন্দর শহর হিসেবে মুম্বাই ভারতবর্ষের একটি অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। খুব স্বাভাবিকভাবে জীবিকা নির্বাহের কারণে সারা দেশ থেকে মানুষজন এখানে আসে এবং এক মিশ্র জনবসতিপূর্ণ শহর হিসেবে এর বিস্তার ঘটেছে। এই শহরেও লস্কর-ই-তৈবা এবং হুজি গোষ্ঠী তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে স্থানীয় বাংলাদেশি বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে যারা আর্থিক ও অন্যান্য বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কারণে এই শহরে আসেন। নাগপুরের Anti-terrorism Squad-এর সূত্র অনুসারে এই বাংলাদেশিরাই এই রাজ্যে স্লিপার সেল হিসেবে কাজ করে।

আসাম চুক্তির মধ্যে দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণ, নথিবদ্ধ করণ ও ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া স্থির করা হয়েছিল, যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এক্ষেত্রে IMDT Act একটি বড়ো বাধা হিসেবে কাজ করেছে ও তা কেন, তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। যদিও এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে দায় নেবার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এটা স্পষ্ট যে, প্রতিবেশি রাষ্ট্রটি সেখান থেকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ হয়ে চলেছে এবং সেই দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরের সহযোগিতা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কূটনৈতিক স্তরে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা জরুরি। বাংলাদেশ সরকার তার সমস্ত নাগরিকদের বায়োমেট্রিক ডিজিটাল ডেটাবেস গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত রূপায়িত হলে হয়তো তা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

ভারত আর্থিক সহযোগিতা, ঋণ ও অনুদানের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে, যার ফলে সেই দেশের গড় আয় বৃদ্ধি পায় শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে এবং বেকারত্ব দূর হয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের বাস্তব সম্ভাবনা নির্মূল হয়। কিন্তু একদিকে সহৃদয়তা ও মহত্ব দেখানার প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেশ কিছু কঠিন পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন রয়েছে। এই মুহূর্তে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর যা খরচ, তা মূলত ভারতই বহন করে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের গুলি চালানোর প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উত্থাপন করেছে, যদিও এই বিষয়ে মাথায় রাখা দরকার যে, সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত প্রায় বেশিরভাগই গোরু, ড্রাগ ও অস্ত্রের চোরাকারবারি। মানবাধিকারের প্রশ্নটিকে যেমন সীমান্তরক্ষীবাহিনীর খেয়াল রাখা দরকার, তেমনই এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে, সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের সীমানা সম্পূর্ণ করার যে কথা ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা বহু বছর ধরে বলে আসছেন, তা সম্পূর্ণ না হলে এই অনভিপ্রেত ঘটনাগুলির বার বার সাক্ষী হব আমরা। পশ্চিম ভারতে কাঁটাতারের সীমানা কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রেও তা সমাধানের উপায় হতে পারে। NDA সরকার তার ক্ষমতায় থাকাকালীন পর্বে এই প্রশ্নে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কেন্দ্রের কোনো পদক্ষেপই রাজ্যসরকারের সদিচ্ছা ও পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়।

এক দীর্ঘ সময় ধরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ইস্যু টালবাহানার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। এর কারণ মূলত দুটি— প্রথমত, সরকার এই বিষয়ে সচেতন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর অনুপ্রবেশের সমস্যা এমন একটা সমস্যা যা নিয়ে কঠিন পদক্ষেপ অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িক চেহারা নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বৃহৎ অর্থনীতি হবার সুবাদে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মানুষের চাপ ভারতরাষ্ট্র আত্মীকরণ করে নিতে পেরেছে। ফলত দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সুদূরপরাহত।

৯/১১ পরবর্তীকালে গোটা পৃথিবী জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়কে কেন্দ্র করে দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটে, তা ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণিকেও প্রভাবিত করে ও তারাও এই বিষয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমি উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক দেশগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। অভিবাসনের দ্বার যেমন তারা বন্ধ করেনি, তেমনি কাকে এবং কত সংখ্যক মানুষকে নিজেদের দেশে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা হবে, সেই সম্পর্কিত নিয়ম কঠিনতর হয়েছে দিন দিন।

বাংলাদেশি সমাজের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া BNP শাসনকালে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ হয়। এই পর্যায়ে অনুপ্রবেশকারীরা প্রায় সকলে জঙ্গি ইসলামের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে এদেশে আসেন। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে ঢোকার রাস্তা সুগম করে। শেখ হাসিনার শাসনকালে যদিও এর বিপরীত অভিমুখ তৈরি করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে; উত্তর-পূর্বে জঙ্গি গোষ্ঠীসহ ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদীদের অনেকের বিরুদ্ধে শাস্তি ও গ্রেপ্তারির ও ব্যাপক ধরপাকড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার পরও সমস্যার সমাধানে বাস্তব হস্তক্ষেপ হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

ইসলামিক শক্তি উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলিকে তাদের Transit Point হিসেবে ব্যবহার করে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আঘাত হানার জন্য। এক্ষেত্রে শিলিগুড়ির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরকে যে তারা ব্যবহার করতে পারছে, তা যথেষ্ট আশঙ্কার বিষয়।

দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রশ্নে কোনো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মূলধারার প্রায় সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলের দ্বারা তোষণের মুখোমুখি হয়েছে। যদিও বর্তমানে তাদের সচেতনতা বেড়েছে, কারণ তারা উপলব্ধি করছেন, অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনবিন্যাসের এই পরিবর্তন তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংহতিকরণের প্রক্রিয়াকে ধাক্কা দিতে পারে ও সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটাতে পারে। কূটনৈতিক স্তরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা, ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও সমস্যাসংকুল রাজ্যগুলির মধ্যে বোঝাপড়া, সীমান্ত সম্পর্কে স্পষ্ট নীতি ও নাগরিকদের সুস্পষ্ট রেকর্ড ও নথি তৈরি করার কাজ সুসম্পন্ন করাই একমাত্র এই বেআইনি অনুপ্রবেশের সমস্যাটির বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক সমাধান করতে পারে।

৪.১ আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইবুনাল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা মিলে হিন্দু সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারণকে গণহত্যা করে। ঐতিহাসিকদের মতে, দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। এবং কমপক্ষে ২ লক্ষ নারীর সম্মানহানির ঘটনা ঘটে, যার ফলে প্রায় ২৫ হাজার শিশু জন্ম নেয়। এই যুদ্ধের ফলে প্রায় ১০-১২ লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ব্যাপক জনসংখ্যার চাপে ভারত সরকার এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই প্রধান প্রতিপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অপরাধী শাস্তির দাবি তোলে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট। চার দলীয় জোট, বিএনবি, জামাত-ই-ইসলাম, যাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব ছিল যুদ্ধ অপরাধে দুষ্ট। প্রাক্তন মুক্তি যোদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে সেনাদলের অধিনায়করা নাগরিকদের যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনগণকে ভোট দিতে আহ্বান জানান।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটের ঐতিহাসিক জয় হয়। ২০০৯ সালের ২৯ জানুয়ারি আওয়ামি লিগের দলীয় সাংসদ মাহমদু সামাদ চৌধুরী জাতীয় সংসদে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। সরকার জাতীয় সংসদে এই প্রস্তাব পাশ করে, তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের আইন, বিচার এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী সফিজুল আহমেদ ঘোষণা করেন, যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করা হবে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনালের দ্বারা। যুদ্ধ অপরাধের তথ্য অনুসন্ধান কমিটির কাজ হল অনুসন্ধান করে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা। সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি ২০০৯ সালে পেশ করা হয় এবং ১৬০০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনাল গঠনের পূর্বে UNDP এই আদালত গঠনে সাহায্য করে। ২০০৯ সালের ৯ জুলাই আইন কমিশন সংসদ সংশোধনীটিকে আইনে রূপায়িত করার অনুমোদন দেয়। এই সংশোধনীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা একটি রাজনৈতিক দল ও একই অপরাধে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়। ২০১০ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারালয়ের গঠন ঘোষণা করে— তিন বিচারপতি এই আদালতে বিচারক হবেন, সাতজন সদস্য নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা গড়া হবে, ১২ জন সদস্যের একটি টিম মামলাটি পরিচালিত করবে। এই ঘোষণা করা হয় পাকিস্তানি সেনা দ্বারা সংঘটিত ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের ৩৯তম বছরে।

যে তিনজন বিচারককে নিয়ে এই বিচারসভা গঠিত হয়, তারা হলেন মোহাম্মদ নিমাজুল হক, এই কমিটির চেয়ারম্যান, অন্যান্যরা হলেন এ.টি.এম. ফাজলে কবির ও এ.কে.এম. জাহির আজমদ। তদন্তকারী দলের সাতজন সদস্য হলেন আবদুল মতিন, আবদুর রহিম, কুতুবর রহমান, এ.এ.এম. সামসুল আরফিন, মীর শাহিদুল ইসলাম,

নুরুল ইসলাম এবং আবদুর রেজ্জাক খান। ১২ সদস্যের মামলা পরিচালনকারী দলটির প্রধান হলেন আইনজীবী গোলাম আরিফ টিপু। বাকি সদস্যরা হলেন, সৈয়দ রেজাউর রহমান, গোলাম হাসনায়ন, রাণা দাসগুপ্ত, জাহিরুল হক, নুরুল ইসলাম সুজন, সৈয়দ হায়দার আলি, খন্দকার, আবদুল মান্নান, মোল্লারফ হোসেন কাজল, জাহিদ আল আলউস, সানজিদা খামন এবং সুলতান মাহমুদ মেমন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের ফৌজদারি ট্রাইব্যুনাল বিশ্বজুড়ে সমর্থন অর্জন করে এবং UN এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য প্রদান করতে আগ্রহ জানায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই আদালতের সমর্থনে তিন প্রস্তাবনা গ্রহণ করে। মানবাধিকার রক্ষা সমিতি এই আদালত স্থাপনকে সমর্থন জানায়।

শাহবাগ আন্দোলন

এই আদালত প্রথমে প্রায় ১২ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে, যার মধ্যে জামাত-ই-ইসলামের ৭ জন নেতা। এই জামাত-ই-ইসলাম হল বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামিক রাজনৈতিক দল, যারা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জামাতের প্রধান ছিল। প্রাক্তন জামাত প্রধান এবং ২০০১-০৬ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামি, পার্টির ডেপুটি প্রধান দেলোয়ার হোসেন সাইদি, সম্পাদক আলি আসহান মহম্মদ মোজাহিদ, সহ-সম্পাদক মোজাম্মদ কারুজ্জামান ও কাদের মোল্লা, মিডিয়া প্রধান মীর কাসেম আলি, গোলাম পাওয়ার ও আবদুল কালাম আজাদ (বাচ্চু), বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-র প্রাক্তন মন্ত্রী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরি ও আবদুল আলিস। জামাত-ই-ইসলামের সমর্থনে এবং জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র শিবির আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠনের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্র শিবিরের দাবি ছিল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আদালতটিকে চিরস্থায়ীভাবে বাতিল এবং জামাতের নেতাদের মুক্তি

দিতে হবে। ছাত্র শিবির ঢাকা শহর ছাড়াও বাকি বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে। সারা দেশে তারা পুলিশের উপর আক্রমণ করে, আইনমন্ত্রী সহিফুল আহমদের উপর আক্রমণ করে, পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ করে লুটপাট চালায়, প্রচুর সংখ্যক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

৪.২ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া

১. আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু)

আবুল কালাম আজাদ দেশব্যাপী পরিচিত ইসলামি ধর্মপ্রচারক এবং সাবেক জামাত-ই-ইসলামের সদস্য। গণহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, বন্দি করে অত্যাচার চালানো ইত্যাদি নানা অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং পুলিশের ধারণা সে পাকিস্তানে আত্মগোপন করে আছে। ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধে গঠিত আদালত আবুল কালাম আজাদকে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে। আদালত আজাদকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার রায় প্রদান করেছে।

২. কাদের মোল্লা

মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় ২১ জুলাই ২০১০ সালে। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১-য় রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ দাখিল করে, ২৪ মে ২০১২-য় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং ৫ ফেব্রুয়ারি দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামাত ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনাল-২।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আদালত মঙ্গলবার ৫ ফেব্রুয়ারি ওই রায় ঘোষণা করে। তবে এই রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এই রায়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌসুঁলি গোলাম তারিফ বলেন, প্রত্যাশা করেছিলাম, কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড হবে। এরজন্য হতাশ তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আবার আপিল করা হবে।

৩. দেলোয়ার হোসেন সাঈদি

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মুক্তিযুদ্ধকালের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে (গণহত্যা, ধর্ষণ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, জোর করে ধর্মান্তরিত করা) জামাত ইসলামির নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আদালত রায় প্রদান করেছে। এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের তৃতীয় রায়। আর আদালত-১-এ বিচারাধীন মামলার মধ্যে এটি প্রথমবার। এই আদালত এই রায় প্রদানকালে মন্তব্য করে, এই মামলায় আসামী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদি শুধু প্রখ্যাত মওলানা নন, তিনি দুইবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। ...

আসুন আমরা ফিরে যাই ৪০ বছর আগে। তখন সাঈদি ৩০ বছরের যুবক ছিলেন। পিরোজপুরের সাউথখালি গ্রামের লোকেরা তাকে দেলু বলে ডাকত। আমরা সেই ৩০ বছরের যুবকের বিচার করছি। তার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা গ্রামের নিরীহ লোক।

এদিকে রায়ের পরপরই জামাত শিবির ব্যাপক সহিংসতা শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা পুলিশ-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলা করে। নোয়াখালিতে তারা হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন লাগায়, মন্দির ভাঙচুর করে। বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। সারাদিন শান্ত থাকলেও রাতে শিবিরের সশস্ত্র বাহিনী রাজধানীতে হামলা শুরু করে। জামাত শিবিরের এই হাঙ্গামা সত্ত্বেও দেশের মানুষ রায় ঘোষণার পর আনন্দে মেতে ওঠে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দেওয়া ফাঁসির আদেশের বিষয়টি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ হয়েছে। জামাত ইসলামির নেতা দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদির ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে সহিংসতা চালান দলটির নেতা কর্মীরা। দেশজুড়ে তাণ্ডব শুরু করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। এরপর প্রথম দিন প্রায় ৩৭ জন নিহত হয়, পরে আরও ৪০ জনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েকশো ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী।

৪. কামারুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার দায়ে জামাত ইসলামির সহকারী সম্পাদক জেনারেল মোজ্জাম্মদ কামারুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-২। বিচারপতি ওবারদুল হাসানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আদালত ২০১৩ সালে কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা করেন। কামারুজ্জামান বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'আলবদর' বাহিনীর প্রধান সংগঠক ছিলেন। এই বাহিনী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগতভাবে নিরস্ত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর নৃশণস আক্রমণ চালায়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল।

৫. গোলাম আজম

জামাত ইসলামির মতো সাবেক আমির গোলাম আজমের মুক্তিযুদ্ধকালের অপরাধে ১৬ জুলাই ২০১৩ সালে ৯০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর রায় ঘোষণা করে। ট্রাইব্যুনাল জানায় যে, গোলাম আজম মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে এই রায় প্রদান করা হল। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে শাহবাগের প্রতিবাদকারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মানবতাবিরোধী গোলাম আজমের ফাঁসির দাবিতে আবার আন্দোলন শুরু হবে বলে শাহবাগের

আন্দোলনকারীরা ঘোষণা করেন। জনজাগরণ মঞ্চে প্রতিবাদীদের মতে, যে মানুষটি বয়সে বাছ-বিচার না করে (শিশু, মহিলাদের) মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশিদের হত্যা করেছে, সেই গোলাম আজমের কোনো অবস্থায় কারাদণ্ড হতে পারে না। তার একমাত্র প্রাপ্য হল ফাঁসি। জামাতের রাজনৈতিক জোটসঙ্গী বিএনপি জামাতের সাবেক আমির গোলাম আজমের রায়ে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া প্রদান করেনি। এর কারণ অতি পরিষ্কার, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি মানবতাবিরোধীদের ফাঁসি হোক। ফলে ট্রাইব্যুনালের রায়ের পক্ষে সহমত পোষণ করে জোটসঙ্গী জামাতকে নির্বাচনে বিএনপি সমর্থন করেনি। আগামী নির্বাচনী বৈতরণী পার করা বিএনপি-র একার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদান করলে দেশের মানুষ বিএনপিকে ভালোভাবে নেবে না। তার ফলে সুবিধাজনক অবস্থান প্রতিক্রিয়া না দেওয়া। এই রায়ের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে জামাত ও তার ছাত্র সংগঠনের হিংসার বলি হন প্রায় ১০ জন ব্যক্তি।

৬. আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাদির

স্বাধীনতার ৪২ বছর পর বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রথম বিচার হল। একাত্তরের বুদ্ধিজীবী নিধনের পরিকল্পনা ও সহযোগিতা করার দায়ে ১৭ জুলাই ২০১৩ সালে বুধবার আলবদর বাহিনীর নেতা আহসান মোহাম্মদ মুজাদিরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

একাত্তরের গুপ্তঘাতক আলবদর বাহিনী ছিল জামাত ইসলামির সশস্ত্র বিভাগ। জামাত কোনোভাবেই একাত্তরের অস্ত্রসজ্জিত, ফ্যাসিস্ট এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। জামাত ইসলামির সেক্রেটারি জেনারেল আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ছোটো ছেলে তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, যতক্ষণ যুদ্ধাপরাধীদের নিঃশ্বাস বাংলাদেশের বাতাসে ঘুরে বেড়াবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মা শান্তি পাবে না।

৭. সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

ছয়বার বিএনপি (BNP) পার্টির সংসদ এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়ার উপদেষ্টা ও চট্টগ্রামের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকা চৌধুরীকে ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার করা হয়।

BNP-র অন্যতম শীর্ষনেতা সাকা চৌধুরীর গ্রেফতার খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়াও সাকা চৌধুরীর সঙ্গে ISI-এর যোগাযোগ এবং BNP সরকারের আমলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১০ লরি অস্ত্র নিখোঁজ হওয়া মামলার প্রমাণ মেলে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীর ২৩টি মামলার মধ্যে সরাসরি ৯টি মামলায় সাকা চৌধুরীর অপরাধ প্রমাণিত হয়। অবশেষে ২০১৫ সালের ২২ নভেম্বর সাকা চৌধুরীর ফাঁসি কার্যকরী হয়।

জামাতের শীর্ষনেতা মতিউর রহমান নিয়াজি, মীর কাসিম আলিকেও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশবাসীরা যে শাহবাগ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তার ফলে যে ব্যাপক আলোড়ন ও জনরোষ তৈরি হয়েছিল আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের উপর। এই জনরোষকে কাজে লাগিয়ে শেখ হাসিনা সরকার জামাত এবং BNP-র যে সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্ব মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িত ছিল, তাদেরকে অপরাধী প্রমাণ করে ফাঁসি কার্যকরী করে। ধীরে ধীরে শাহবাগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। শাহবাগ আন্দোলন ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করলেও সারা বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপকতা বা সাড়া জাগাতে পারেনি। কারণ, এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, সুশীল সমাজ ও ঢাকা শহরকেন্দ্রিক মানুষজন, যারা সারা বাংলাদেশ জুড়ে আন্দোলনের ব্যাপকতা পৌঁছে দিতে পারেনি বা সারা বাংলাদেশকে আন্দোলনের সঙ্গে জুড়তে ব্যর্থ হয়।

৪.৩ বাংলাদেশি সমাজের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া

বিগত তিন দশকে একটি উদারনৈতিক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যে পরিচিতি, তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর কারণ কট্টর ইসলামপন্থীরা তাদের সামাজিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে; সমাজের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়াকে গতি দিয়েছে এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যাতে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় যে যে মূল্যবোধগুলিকে ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও তার শাসকরা তার থেকে অনেকটা সরে এসেছে। ওই পর্যায়ে জামাত-ই-ইসলামের মতো কট্টর ইসলামিক সংগঠন, যদিও তারা নিজেদের moderate ইসলামপন্থী বলে দাবি করে, তার ভিত্তি বাড়িয়েছে ও একটি সুসৃঙ্খল ক্যাডারভিত্তিক পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের প্রায় বেশিরভাগ উগ্রপন্থী, দক্ষিণপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে এই দলের যোগাযোগ আছে। যদিও ১৯৭২ সালের সংবিধান স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের ধারণা উত্তরোত্তর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে বাঙালি জাতিসত্ত্বা ও ইসলামীয় পরিচিতির আত্মপ্রকাশের মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্রটি।

জামাত একমাত্র সংগঠন নয়, যে সংগঠন বাংলাদেশে ইসলামিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে চায়। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য সংগঠনও বাংলাদেশে রয়েছে, যদিও এদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই পরিবর্তন আনার পক্ষে, আবার কেউ-বা রক্তাক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় ধারাটির প্রবক্তারা মূল ধারার রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে, যদিও বাকিরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে গেছে। ১৯৭৬ সালে যখন ধর্মীয় সংগঠনগুলির উপর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা

প্রত্যাহিত হয়, সেইসময় থেকে প্রায় ১০০টিরও বেশি সংগঠন এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সক্রিয় হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ৩০টিরও বেশি রাজনৈতিক দল ও তাদের শাখা-সংগঠন, যাদের শরিয়তি শাসনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে, তারা ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনে অণশগ্রহণ করেছে। জামাত-ই-ইসলামকে বাদ দিলে এই সকল সংগঠনের যৌথভাবে নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট ছিল ১ শতাণশেরও কম।

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ভারতে জামাত-ই-ইসলাম সংগঠিত হয়। ১৯৫৫-র দশক থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জামাত তার রাজনৈতিক কাজকে সম্প্রাসরিত করে। মুক্তিযুদ্ধের পরে যদিও জামাতকে নিষিদ্ধ করা হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে, কিন্তু জামাত কৌশল বদল করে তার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে জারি রাখে ও পরবর্তীকালে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অণশগ্রহণ করে। আদর্শগতভাবে জামাত আল্লার অনুগ্রহ লাভের পক্ষে এবং নবির নির্দেশানুসারে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভূমিকা নিয়ে মানবসমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলে। জামাত দাবি করে যে, সে একটি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, যে সংগঠন ইসলামকে তার মৌলিক অনুপ্রেরণা মনে করে। জামাতের মতে, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ যদিও এখানে কোরান ও সুন্নাকে মৌলিক আইন হিসেবে স্বীকার করা হয়নি, কিন্তু রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ইসলামীয় সংগঠনের মতোই জামাত বাংলাদেশকে যদিও ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিবর্তনের কথা বলে, কিন্তু তা বলতে গিয়ে সে কিছু ছদ্ম আবরণের আশ্রয় নেয়। জামাত মনে করে, ইসলামীয় রাষ্ট্র হল একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং একটি বহুভাষিক বহু ধর্ম বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার অভিমুখ ইসলামীয় রাষ্ট্রের মতোই। আরও এগিয়ে জামাত বিশ্বাস করে যে, ইসলামীয় রাষ্ট্র হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আল্লা ও নবী ..... সার্বভৌমিকতার যে ধারণা প্রদান করেছেন, তাই ইসলামীয় রাষ্ট্রের অন্তর্বস্তু। সেক্ষেত্রে সংবিধান অবশ্যই পবিত্র কোরান ও সুন্নাসম্মত হওয়া উচিত। দশকের পর দশক জুড়ে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জামাত কাজ করে চলেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সমাজে জামাত গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। সাধারণত বাংলাদেশে দুই ধরনের মাদ্রাসা আছে— আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা। যেহেতু কওমি মাদ্রাসাগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ও মূলত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে থাকে, এই মাদ্রাসাগুলিকে জামাত বহুল অণশে ব্যবহার করেছে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্প্রসারণের জন্য। বিগত দশকগুলিতে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এই কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই ৩২ বছরে উচ্চ প্রাথমিক মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৩২ শতাংশ, যেখানে সাধারণ মাদ্রাসার বৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ। দাখিলা অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই বৃদ্ধি আরও মারাত্মক। এই ৩২ বছরে দাখিলা মাদ্রাসার বৃদ্ধির হার ১১০৩ শতাংশ। অর্থাৎ বার্ষিক ৮.১ শতাংশ হারে। বাংলাদেশে ইসলামিক আদর্শের বিকাশে এই মাদ্রাসাগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই মাদ্রাসাগুলিতে প্রাপ্ত অর্থের এক বৃহৎ অণশ রাজনৈতিক জিহাদের লক্ষ্যে ও

সামরিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটা অনস্বীকার্য যে, দরিদ্র পরিবারগুলি মূলত অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে থাকেন, কিন্তু এটি একমাত্র কারণ নয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্নতে যাবার সম্ভাবনা সর্বাধিক। তারা বিশ্বাস করেন, ইসলামীয় ও কোরানের শিক্ষা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য আদর্শ স্বরূপ।

জামাত দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিচ্ছবি মানুষের মধ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে যে, যেহেতু মাদ্রাসাগুলি আবাসিক এবং সেখানে সুষম খাদ্য ও শিক্ষা দুইয়েরই সুযোগ পর্যাপ্ত, ফলত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের অন্যতম আশ্রয়স্থল। অপেক্ষকৃত ধনী ও এলিট অণশের জন্য সে ইণরেজি মাধ্যম মাদ্রাসারও বিকাশ ঘটিয়েছে। এছাড়া মহিলাদের শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে জামাত পৃথক মাদ্রাসা গড়ে তুলেছে, যার মধ্যে দিয়ে কট্টরপন্থী ইসলামীয় ভাবাদর্শে মেয়েদের দীক্ষিত করা হয়।

যদিও উগ্রপন্থার বিকাশে মাদ্রাসাগুলি একমাত্র আতুরঘর নয়। ছাত্রশিবির, বিবিধ সামাজিক সংগঠন, এনজিও সংগঠন ও মূলধারার রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে জামাত এক বিপুল পরিমাণ পার্টি ক্যাডারকে যুক্ত করে। এমনকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান স্নাতক ছাত্রদের মধ্যে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যলয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জামাতের ব্যাপক সংগঠন রয়েছে, যা সে গড়ে তুলেছে তার নিবিড় নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতাদর্শগতভাবে প্রভাবিত করে তাদের মাধ্যমেও এক বিশাল সংখ্যক রিক্রুটকে যুক্ত করা ও প্রশিক্ষিত করার কাজ জামাত অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরে জামাত তার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সেই প্রভাবকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে কাজে লাগাতে সে তৎপর। কৃষি দপ্তরের সরকারি আধিকারিক, যারা গ্রামে কাজ করেন, তাদেরকে জামাত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে গ্রামাঞ্চলে ইসলামিক আদর্শ সম্প্রসারণের জন্য। এছাড়া পুলিশ বিভাগের মধ্যে জামাত মেরুকরণ করতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষত বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রাক্তন উগ্রপন্থীদের এক বৃহৎ অণশকে সে সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ করতে সফল হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম বাংলাদেশে 'আন্নার দল' নামক একটি অতি উগ্রপন্থী সংগঠনকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে জামাতের নাম উঠে এসেছে বার বার। সামরিক বাহিনীর মধ্যে জামাত সফলভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, সেনাবাহিনীর প্রায় ১০ শতাংশ জামাতের ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এমনকী কুখ্যাত রাজাকার গোলাম আজমের পুত্র সেনাবাহিনীর এক মেজর জেনারেল। জামাতের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত বহু সেনা উচ্চপদস্থ বিভিন্ন পদে রয়েছেন। বহুক্ষেত্রে তথ্যসূত্র এটা ইঙ্গিত করে যে, সেনার পদস্থ অফিসাররা উগ্রপন্থীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশ যে স্বপ্নের সঞ্চার করেছিল, তা প্রতিমুহূর্তে ব্যর্থ হওয়ায় ধর্মীয় উগ্রপন্থার বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তীব্রতম বেকারত্ব, দারিদ্র, দুর্নীতি, পরিবেশের অবক্ষয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এই পরিস্থিতি নির্মাণ করেছে। জামাতের মতো

রাজনৈতিক সংগঠনের এক বহুমাত্রিক সামাজিক রাজনৈতিক এমনকী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর নেটওয়ার্ক রয়েছে। ফলত রাষ্ট্র যেখানে প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ হয়েছে ও কোনো বিকল্প শক্তি উঠে আসেনি, সেখানে বিকল্প সংগঠন হিসেবে জামাত তার জায়গা করে নিয়েছে এবং পরিবর্তে সে ছড়িয়ে দিয়েছে ইসলামিক ভাবাদর্শ। আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংগঠন ও এনজিওগুলির থেকে জামাত এক বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে। সূত্র অনুসারে সেই অর্থে পরিমাণ প্রতিবছর প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে সে দেশে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির বার্ষিক মুনাফা হল ২০০ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া দরিদ্র জনসাধারণকে জামাত এক বিপুল পরিমাণে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে ও বিদেশে সাগরপারে চাকরি পাওয়ার বিষয়টিকেও তদারকি করে। উচ্চশিক্ষিত ও চাকুরিরত এক বিপুল সংখ্যক রাজকর্মচারী ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে জামাতকে এক বিপুল পরিমাণ জাকাত প্রদান করে থাকে, যা স্থানীয় ধর্মীয় ও কওমি মাদ্রাসার উন্নয়নকার্যে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য ইসলামিক গ্রুপগুলির সঙ্গে মিশে জামাত বাংলাদেশি জনগণের বহুজাতিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অনুভবকে ব্যবহার করে। যেমন, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন ইস্যু, কাশ্মীর ইস্যু, বাবরি মসজিদ ধ্বণস, ইজরায়েলকে মার্কিন সমর্থন ও আফগানিস্তানে ও ইরানে ধ্বণসলীলা ইত্যাদি ঘটনাকে জামাত তার সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করেছে। এছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে এক যুদ্ধ জিগিরকে সে উত্থাপন করে ও ভারতের সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

জামাতের বর্তমান রাজনৈতিক রণনীতি হল মূলধারার দুটি প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনকে ব্যবহার করা। বিএনপি-র সঙ্গে জামাতের যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান। আওয়ামি লিগের সঙ্গে এই যোগাযোগ অনেকটাই অপ্রত্যক্ষ ও ইস্যুভিত্তিক। জামাত এও দাবি করে যে, ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর আওয়ামি লিগ তাদের সমর্থন প্রত্যাশা করেছিল।

রাজনৈতিক বৈধতা লাভের একটি প্রক্রিয়ার অণশ হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান ধর্মীয় সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, জামাতের মতো রাজনৈতিক সংগঠন বিএনপি-র মধ্যে তার আদর্শগত বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিল। এই বন্ধুত্ব আরও বিচক্ষণ রূপ নেয় যখন শেষ পর্যায়ে জামাত ও ইসলামিক ঐক্য-জোট ৪ পার্টির সমঝোতা গড়ে তোলে।

সাধারণভাবে বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ পরিচিত তার ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় সে এই সকল ধর্মীয় উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী মুক্তিযুদ্ধের পরেও শেখ মুজিবর রহমানও জামাত ও অন্যান্য ইসলামীয় সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এছাড়াও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সময়কালে আওয়ামি লিগ যুদ্ধপরাধীদের বিচারেরও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জামাতের নেতারা এটাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ১৯৮০ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা ১৯৯০ সালে

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরির আন্দোলনকালীন সময়ে আওয়ামি লিগ ও জামাত নেতৃত্বের বোঝাপড়ায় কখনোই কোনো সমস্যা থাকেনি।

আওয়ামি লিগ যদিও দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি, এমনকী যে Vested Property Act হিন্দুদেরকে তাদের জমি ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল, তার সংশোধনের ক্ষেত্রে কার্যকরী কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। একইসঙ্গে ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে যখন আওয়ামি লিগ একটি উগ্র দক্ষিণপন্থী সংগঠন খিলাফৎ-এ-মজলিস-এর সঙ্গে জোট বাঁধে, তখন শুধু ধর্মনিরপেক্ষ জনতাই নয়, আওয়ামি লিগের নিজস্ব সদস্য ও সমর্থকগণও বিভ্রান্ত হয়। অভিযোগ ওঠে যে, ধর্মীয় ইসলামীয় নেতৃত্ব এক বিপুল অর্থের বিনিময়ে এই জোটকে সম্ভবপর করে তুলেছিল।

২০০৫ সালের গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের পর যে সাত জন গ্রেপ্তার হয়েচিল, তাদের প্রত্যেকেই ছিল জামাত-উল-মুজাহিদিনের সদস্য। এরা প্রত্যেকেই হয় জামাতের পূর্বতন সদস্য বা ইসলামিক ছাত্র শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিস্ফোরণের সূত্রে যখন ইসলামিক অ্যাকাডেমির পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মৌলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদকে হেফাজতে নেওয়া হয়, তখন ঢাকা আদালতে তিনি শিল্পমন্ত্রী ও জামাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মতিউর রহমান নিজামিকে অভিযুক্ত করেন। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সূত্রের মতে, জেএমবি ও জামাত-ই-ইসলামের মধ্যে কোনো কার্যকরী সাংগঠনিক পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব রাজনৈতিক লাভ ও ক্ষমতার প্রয়োজনে জামাতই আবদুর রহমান থেকে বাংলাভাই-এর মতো সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম দিয়েছে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট জেএমবি ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় মূলত স্থানীয় জেলা প্রশাসনিক ভবন ও আদালতগুলিতে। এই বিস্ফোরণের পর যে সকল প্রচারপত্র তারা বণ্টন করেছিল, তাতে বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে সমস্ত মামলা ও বিচারকদের সরকারি পদ প্রত্যাখ্যান করা ও সরকারি অফিস বয়কট করার কথা বলা হয়েছিল। ২০০৫ সালের ৩ অক্টোবর চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও লদীপুরের জেলা আদালতের বিচারকরা আবার বোমা বিস্ফোরণের মুখোমুখি হন। ১৮ অক্টোবর সিলেটে বিপ্লব গোস্বামী নামে এক বিচারক আক্রান্ত হন এই ধারাবাহিক আক্রমণের মুখে, এমনকী SAARC-এর বৈঠকও স্থগিত হয়ে যায় সাময়িকভাবে। কিন্তু বৈঠকের অব্যবহিত পরে ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠিতে দু-জন বরিষ্ঠ বিচারক নিহত হন ও ৩ জন আহত হন আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ফলে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিনেতা মামুন আলি নিজেকে জেএমবি-র সক্রিয় সদস্য বলে দাবি করে এবং ঘোষণা করে যে, আল্লার ইচ্ছা ও কোরানের আইনই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে একমাত্র প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশগুলি বাংলাদেশে ইসলামীয় জঙ্গিদের তৎপরতার ক্ষেত্রে বার বার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই দুই দেশে বিশেষত ইংল্যান্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকরা দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিলেন। এক অংশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে ও অন্য অংশ জামাতের আদর্শগত অবস্থানের পক্ষে। ব্রিটেন আরও উদগ্রীব ছিল যে কারণে তা হল, বেশ কিছু ব্রিটিশ নাগরিক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে

গিয়েছিলেন। এই উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পায় যখন সিলেটে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের ভ্রমণকালে তাকে আক্রমণের মধ্যে পড়তে হয়। জামাত নেতৃত্ব পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রায়শ যাতায়াত করত এক বিপুল পরিমাণ তহবিল সংগ্রহের জন্য। এমনকী ২০০৫ সালের ৭ জুলাই বোমা বিস্ফোরণের পরও বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী দেলওয়ার হোসেন সাইদি যে প্রকাশ্য ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রচার করত, তাকে ব্রিটেনে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জামাত নেতৃত্ব মার্কিন দূতাবাসে বিভিন্ন কূটনৈতিক নিমন্ত্রণে অণশগ্রহণ করতেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে মূলধারার একটি প্রকাশ্য গ্রহণযোগ্য দল হিসেবে জামাত নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

জামাতের মতো সংগঠন, যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং নিজের দেশের জনগণের উপর অপরিসীম সন্ত্রাস চালিয়েছিল, দেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত সুকৌশলে তারা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতার বৃদ্ধি ঘটায়। যদিও বর্তমানে জামাতের নেতৃত্ব ও কর্মীদের এক অণশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মজবুত সংগঠন যেমন আজও অটুট, তেমনি বাংলাদেশের সমাজজীবনে ইসলামিক ভাবাদর্শের যে প্রচার জামাতের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে, তাকে উপেক্ষা করা কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকী উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি যাদের উপর বাংলাদেশ আর্থিকভাবে বহু অণশে নির্ভরশীল সেই সকল রাষ্ট্রও জামাতের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ কখনোই সহ্য করবে না। এছাড়া প্রশাসনিক স্তরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে যে সমর্থন জামাতের রয়েছে, সরকারের পক্ষে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্পত্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অধিকারের বিষয়টি যখন আইনে পরিণত করার দাবি ওঠে, তখন জামাতের বিরোধিতায় তা স্থগিত হয়ে যায় ও তা রিভিউ কমিটিতে পাঠানো হয়। ইসলামীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে কোনো বিকল্প রাজনৈতিক সংহতি গড়ে তোলা সহজসাধ্য নয়।

যদিও এই সন্ত্রাসবাদের সমস্যা বাংলাদেশের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যা, কিন্তু ভারতের উপর এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে। বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও সীমান্ত রাজ্যগুলিকে সন্ত্রাসবাদীরা যে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করে, তা সুপ্রষ্ঠিত। বিশেষত দুটি সংগঠন এই সকল ইসলামীয় সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করে ভারতে তার জাল বিস্তার করেছে। ধর্মীয় ইসলামপন্থীদের লক্ষ্য হল ভারতবর্ষ ও মায়ানমারের মুসলিম জনসাধারণকে সমাবেশিত করে একটি বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠন করা। এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ থেকে ধারাবাহিকভাবে অভিবাসী প্রেরণ করা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

বাংলাদেশে ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের বিকাশ পাকিস্তানের আইএসআই-এর পক্ষে উর্বর জমি তৈরি করেছে ভারতবিরোধী পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে। ভারতীয় ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে আইএসআই ও বাংলাদেশের Directorate General of Forces Intelligences-এর মধ্যে এক মজবুত সম্পর্কের কথা বার বার উঠে এসেছে। এই দুই শক্তি যৌথভাবে এক স্বাধীন ইসলামীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায়, যার অণশ হবে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা সহ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি

ও কোচবিহারের জেলাগুলি। এছাড়া আলফা সহ অন্যান্য ভারতীয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক সুবিদিত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলি ভারত সম্পর্কে বিবিধ মতামত পোষণ করে। যদিও আওয়ামি লিগের মতো শক্তি, যারা অতীতে খিলাফত মজলিসের মতো ইসলামীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আওয়ামি লিগ যে সম্পূর্ণ ভারতবিরোধী, তা বলা যায় না। আওয়ামি লিগের বৈশিষ্ট্য হল, তারা এমন একটি রাজনৈতিক দল, যার উদ্ভব ঘটেছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এবং স্পষ্টত তার সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে বিএনপি-র মতো শক্তির, আওয়ামি লিগের প্রতিক্রিয়ায় যার উৎপত্তি। ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ঘটে চলা প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপর নিজেদের দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখা দরকার, কারণ সমাজজীবনে ইসলামের ভিত্তিতে মেরুকরণ হলেও গোটা সমাজ ও সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে ইসলামীয় ভাবাদর্শে মুড়ে ফেলার ক্ষেত্রে আওয়ামি লিগই হল একমাত্র বাধা। এবং সেই জন্য ভারতের স্বার্থে একটি শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামি লিগের রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠা জরুরি।

বাংলাদেশকে একটি ইসলামীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা জামাতের Grand Narative-এর অণশ। এই উদ্দেশ্য পূরণে সে গণতান্ত্রিক সরকার ও সামরিক সরকার, দুইয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। যদিও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রারম্ভিক বছরগুলিতে রাজনৈতিক ইসলামের নির্মাণ একটি কঠিন বিষয় ছিল, কিন্তু যত সময় গেছে, দিশাহীন ও বিকল্পহীন চলতি শূন্যস্থান পূরণের জন্য কট্টরপন্থী ধর্মীয় ভাবাদর্শকেই আবাহন করেছে।

যদিও জামাতের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংশয় ও উদ্বেগ আজও বিদ্যমান, কিন্তু বাস্তব সত্য হল, মজবুত সংগঠনের ভিত্তিতে অত্যন্ত সুকৌশলে জামাত তার নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটিয়েছে। কিন্তু, সর্বাপেক্ষা যা গুরুত্বের বিষয় তা হল, নিরবচ্ছিন্ন হামলা ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে দিয়ে ভয় ও ভীতির পরিবেশ তৈরি করে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিস্মৃত করে এক সামাজিক বৈধতা নির্মাণ অবশ্যই সম্ভব করে তুলেছে এই ইসলামিক শক্তিগুলো।

বাংলাদেশের সমাজ তার সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে এই মেরুকরণের সামনে একটা ঢাল হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তি বহুল অণশে জনবিচ্ছিন্ন। একইসঙ্গে জামাত কিন্তু রাজ্য প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে নিজের বিশ্বস্ত সংগঠন ও সমর্থকদের প্রবেশ করিয়ে চলেছে, যাতে প্রতিমুহূর্তে তারা নতুন যুবশক্তিকে আকর্ষিত করতে পারে। প্রগতিশীলতার স্তম্ভ বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন বহু অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী রয়েছেন, যারা মনে করেন ইসলামীয় শাসন বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ইসলামি ভাবাদর্শের সম্প্রসারক হিসেবে ইসলামীয় জঙ্গিদের এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, তারা

যেন কোনো ন্যায়যুদ্ধে শামিল যোদ্ধা। জামাতের নিজস্ব দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা ইসলামিক ভাবাদর্শের প্রচার করে। বিগত দশকগুলিতে যে ধারাবাহিকভাবে বিচারক ও বিচার বিভাগের উপর আক্রমন চালানো হয়েছে, তার কারণ এটাই যে ভয়, ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে এক নিরপেক্ষ বিচার প্রণালীর পরিবর্তে ইসলামীয় ভাবাদর্শে ও শরিয়তি আইন অনুসারে বৈধ নীতিকে বিচার ব্যবস্থার মৌলিক নীতি হিসেবে গড়ে তুলতে জামাত সচেষ্ট।

আন্তর্জাতিক জনমত ও আন্তর্জাতিক চাপ নিঃসন্দেহে একটি দেশের গণতন্ত্রীকরণের ভূমিকা নেয়, কিন্তু রাজনৈতিক ইসলামের অভ্যুদয় একটি জটিল ও কঠিন ঘটনা। এই গতিশীল বহুমাত্রিক শক্তিশালী ভাবাদর্শকে পরাস্ত করতে পারে একমাত্র একটি সাযুজ্যপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। এই শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলিকে এবং নিশ্চিত করতে হবে যাতে জামাতের কাঁধে চড়ে কেউ বাঘের পিঠে না চড়ে। জামাতের সঙ্গে সুবিধাবাদী জোট ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মানসজগতে জামাতের অনুপ্রবেশ যথেষ্ট শক্ত করে দিয়েছে, যা আগামী দিনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুঠার আঘাত করবে। জামাতের লক্ষ্য silent Islamization, যা আপাতভাবে তালিবান বিরোধী হলেও মূল উদ্দেশ্য একই। আর তা হল ইসলামীয় আইনের ভিত্তিতে একটি মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

বিগত দশকগুলিতে বাংলাদেশে অন্যতম ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বহুল অণশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দু মন্দির ভাঙচুর সহ পুরোহিত সম্প্রদায়কে আক্রমণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এক অভূতপূর্ব মাত্রায়। এমনকী হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক প্রকোপ বেড়েছে ও সারা দেশজুড়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হিণসার ঘটনা ঘটেছে। অতি সাম্প্রতিককালে কুমিল্লা জেলায় দুর্গাপুজোর মণ্ডপে কোরান রাখার ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয় এবং চাঁদপুর, নোয়াখালি, ঢাকা সহ অন্যান্য জেলা ও সদর শহরে হিন্দুদের উপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটে।

যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলার মধ্যে ২২টি জেলাতে প্যারামিলিটারি ফোর্স নিয়োগ করেন এবং হিন্দুদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা যথেষ্ট ছিল না। বরণ এই ঘটনার রেশ ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরা ও আসামে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আঘাত নেমে আসে, যার নেতৃত্ব দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকাতে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এই আক্রমণ ও তার আগের দশকগুলিতে ঘটে চলা একের পর এক হিণস্রতার ঘটনাগুলি কোনোদিকেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা সম্ভব নয়, বরণ দুই দেশেই বহুত্ববাদী রাজনীতিকে ধ্বণস করে সংখ্যাগুরুবাদের যে আধিপত্য ও সংখ্যাগুরুর ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে বৃহত্তম পরিকল্পনা, এইগুলিকে তারই অণশ বলা যায়। ক্রমভঙ্গুর রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতায় এই মৌলবাদী রাজনীতির পক্ষে ধীরে ধীরে জমি তৈরি করছে। এই প্রক্রিয়ার সূচনাপর্ব বলা যায় ৯০-এর দশকের প্রারম্ভে, যখন গোটা উপমহাদেশ

জুড়ে একদিকে উদার অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয় ও অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি ডানা মেলতে থাকে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে ও তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘু মুসলিমরা আক্রান্ত হন। দুই দেশেই সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যত বেশি আসীন হয়েছে এবং অন্যদিকে ভোটের স্বার্থে সংখ্যালঘু তাসকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়ায় এই হিংস্রতা ছিল অনিবার্য। অতি সাম্প্রতিককালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে আরও একবার এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ঘটনা ঘটে, যার তীব্রতা দুই দেশেই অনুভূত হয়।

৯০-এর দশকের প্রারম্ভের দিক থেকে ভারতবর্ষে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার যে যাত্রা শুরু হয়েছে, উপমহাদেশে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যে সর্বাধিক, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিগত ২০ বছরে এই সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা শুধু শক্তিবৃদ্ধিই করেনি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ও আসীন হয়েছে। সংখ্যাগুরুত্ববাদের এই যে প্রকল্প তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভারতবর্ষকে একটি হিন্দু প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা, যা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এবং অতীত হিন্দু ঐতিহ্যের উপর নির্মাণ হবে। এই প্রকল্প স্পষ্টতই নেহরুর বহুত্ববাদী ধারণা ও জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনন ও চিন্তাবিকাশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার বিরোধী। এই ভারততত্ত্ব বা 'The Idea of India' প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশের জন্ম দিয়ে চলেছে, তার ফলে দেশের সংখ্যালঘু সমাজ এক ক্রমবিপন্নতার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং আত্মপরিচয়ের স্বার্থে তার ধর্মীয় পরিচিতিকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন। স্বভাবতই এই বিদ্বেষের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশেও এবং সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন আরও বেশি করে, যা ভারতবর্ষে আবার বিদ্বেষের বীজ বপন করছে। হিন্দুত্বের প্রকল্প ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপদজনক প্রকল্পে পরিণত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় মদতে ক্রিয়াশীল। বাংলাদেশেও হিন্দুদের সম্পত্তি ভাঙচুর করা ও তাদের জীবনকে অস্থিতিশীল করে তোলা ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদ এতটাই ভয়ানক চেহারা নিয়েছে যে, একটি পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতিদিন প্রায় ৬৩২ জন হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে প্রায় ৩৬৭৯টি আক্রমণ সংগঠিত হয় বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। ভারতবর্ষে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রনৈতিক দলটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ প্রচার করে এবং মুসলিম জনবসতিপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গেও কূটনৈতিক স্বার্থ গড়ে তুলতে চায়। যদিও নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ সমাজে গণতান্ত্রিক পরিসর যদি বৃদ্ধি না পায়, তবে উপমহাদেশে অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন প্রায় অসাধ্য।

সাম্প্রতিক অতীতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মধ্যে দিয়ে আসামে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে। এই ঘরছাড়াদের এক বড়ো অংশ দেশের বৈধ নাগরিক, যাদের অনেককেই আইনের বলে নাগরিকত্ব হারিয়ে যেতে হয়েছে Detention camp-এ। বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষেরা যখন এদেশে ধরা পড়ে শাস্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরও ঢাকা তাদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয় না।

নিউ দিল্লি এবং ঢাকা দু-পক্ষকেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতির জন্য ধর্মীয় হিংসায় লাগাম পরাতে হবে। নিজ নিজ দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সংখ্যালঘুদের জীবন ও নিরাপত্তার পক্ষে স্থিতিশীল এক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন বোধ না করে। এছাড়া ভারতবর্ষকে অবশ্যই কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে সীমান্ত এলাকার রাজ্যগুলিকে শামিল করতে হবে, যাতে যেকোনো বোঝাপড়া সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এছাড়া পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং সুনিশ্চিত করা দরকার যাতে কোনো শর্তেই দুই দেশের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

৪.৪ খাগড়াগড়

২০১৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী G. Krishan Reddy অভিযাগ করেন যে, বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন বা JMB পশ্চিমবঙ্গের কিছু নির্দিষ্ট মাদ্রাসাকে তাদের সদস্য সংগ্রহ ও প্রচার কাজের জন্য ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করছে। এই দাবির এক সপ্তাহ পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারজন JMB সদস্য গ্রেপ্তার হয়।

২০১৪ সালের খাগড়াগড়ে একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ এখনও কোনো বড়ো সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মুখোমুখি হয়নি। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য সে সময় পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়েছিল, কিন্তু যে বাস্তবতা থেকে এই উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা অস্বীকারযোগ্য নয়। বাংলাদেশের ইসলামপন্থী উগ্র যে সকল সংগঠন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ পশ্চিমবঙ্গে তাদের ডানা বিস্তার করেছে, তার মধ্যে JMB অন্যতম। JMB-এর আল-কায়দা পন্থী ও ISIS পন্থী দুই সংগঠনই যে পশ্চিমঙ্গে তার নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনবসতি সম্পর্কে জেলাগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের এক দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তের সবটাই যে সীমান্তরক্ষীবাহিনীর উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও তদারকির আওতায় রয়েছে, এমন নয়। দু-পারের সীমান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক বৈবাহিক যোগাযোগ রয়েছে। এর ফলে JMB-র মতো সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে তাদের আশ্রয় গড়ে তুলতে পারে।

কাশ্মীরকে মুক্ত করার জন্য, রাজনৈতিক হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার জন্য ও ইসলামীয় খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল সংগঠনগুলি ধারাবাহিকভাবে বাংলার মুসলিম যুবশক্তিকে অনুপ্রাণিত করার উদ্যোগ নেয়। বাংলার জেলার এক প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যে মুসলিম যুবকেরা কেউ কেউ সামরিক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছে, তাও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে অবিদিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার যে এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য দীর্ঘ সময় উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেনি, তা এক প্রমাণিত সত্য। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থ এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করেছে। দিল্লির অভিযোগ মূলত ভোটের স্বার্থেই এই সংখ্যালঘু তোষণ নীতি, যা উগ্রপন্থার বিকাশকে কমিয়ে দেখে ও দেশকে নিরাপত্তাহীনতার

দিকে ঠেলে দেয়। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে এক চমকে দেবার মতো বিস্ফোরণ ঘটে। দুই জঙ্গি মারা যায় ও তিনজন আহত হয়। পুলিশ ৫৫টি উন্নত RDX, ঘড়ি বোমা ও বহু বেআইনি সিম কার্ড ও বেআইনি ধর্মীয় প্রচারপত্র উদ্ধার করে। মধ্যাহ্নে দুপুর ১২টা নাগাদ খাগড়াগড়ে নুরুল হাসান চৌধুরি, যিনি স্থানীয় তৃণমূল নেতা ছিলেন, তার বাড়িতেই এই বিস্ফোরণটি ঘটে। একই বাড়িতে স্থানীয় তৃণমূল পার্টি অফিসের মতন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল। বাড়ির দ্বিতলটি জনাব নুরুল হাসান চৌধুরি জনৈক শাকিল আহমদকে মাসিক ৪৭০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছিলেন।

বিস্ফোরণের অবহিত পরেই পুলিশ আসে, যদিও বিস্ফোরণ স্থলে দাঁড়িয়ে দুই মহিলা পুলিশকে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন এবং বহুবিধ প্রমাণ নষ্ট করেন। শাকিল আহমদ নদীয়ার করিমপুরের বাসিন্দা ছিল, যে এই বিস্ফোরণে মারা যায়। এছাড়া আহত দুই ব্যক্তি, একজন সোহম ও অন্যজন আবদুল হাকিম, যার মধ্যে সোহম মণ্ডল পরে মারা যায়। তারা দুজনেই মুর্শিদাবাদের লালগোলা এলাকার বাসিন্দা ছিল। এদের স্ত্রী ও দুটি শিশু যদিও অক্ষত ছিল। পুলিশ অনতিবিলম্বে এই দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। এদের থেকে জাল পাসপোর্ট, বিভিন্ন ভাষায় ডিভিডি ম্যাপবুক, RDX, সিমকার্ড ও বহু বেআইনি প্রচারপত্র উদ্ধার হয়। ৩ অক্টোবর National Investigation Agency-র একটা টিম বর্ধমানে আসে এবং NIA ও রাজ্য CID দু-পক্ষই আল-জেহাদ নামক একটি গ্রুপকে এই ঘটনার ক্ষেত্রে দোষী বলে চিহ্নিত করে। Central Forensic Research Laboratory-র ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এর পর বর্ধমানে আসেন এবং এই ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় মুজাহিদিনের যোগাযোগ সূত্র আবিষ্কার করেন।

পূর্বভারতে JMB-র যোগসূত্র আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়নি। JMB-র পশ্চিমবঙ্গে কার্যকলাপের ধরনই হল ছোটো ছোটো স্থানীয় স্লিপার সেলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা এবং ভারত ভূখণ্ড থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত রসদ যোগাযোগ সহ সন্ত্রাসের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক তৈরি করা। JMB স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, ভারতবর্ষ হবে তার আগামী দিনের রণক্ষেত্র এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মূর্তিপুজোকে উৎখাত করে মুসলিম জনবসতি সম্পন্ন এলাকাকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসা তার রাজনৈতিক লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গে JMB উদ্যোগ সম্প্রসারণের অন্যান্য আরও কারণও রয়েছে— তার মধ্যে অন্যতম হল বাংলাদেশে ধারাবাহিক গ্রেপ্তারি ও পুলিশি চাপ এড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

খাগড়াগড়ে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, পুলিশের মতে তাদের লক্ষ্য ছিল উৎসবমুখর সময়ে সামরিক আক্রমণ চালিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা। এছাড়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমর্থনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রচার চালানো, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা ও আগামী দিনে দক্ষিণ ভারতেও নিজেদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করা।

এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য যেমন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনই ভারতবর্ষে মুসলিম যুব সম্প্রদায় যাতে এই বিপজ্জনক পথে না শামিল হয়, তার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা, চাকুরি ও জীবিকার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রয়োজন মাদ্রাসা শিক্ষার পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ। শুধুমাত্র পুলিশি উদ্যোগ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাড়াবে ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করবে।

৪.৫ বাংলাদেশে ও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তার জৈব বৈচিত্র্যের জন্য Hydor-energy-র অভূতপূর্ব উৎস হিসেবে কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে যেমন সম্পূর্ণ তেমনই এক অনির্বচনীয় নৈসর্গিক পটভূমির ক্ষেত্র। এইসকল কারণে বাণিজ্যক্ষেত্র হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকশিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। একইসঙ্গে এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদী। কিন্তু এই সকল সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবার জন্য যে দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক মসৃণ হওয়া প্রয়োজন, তার নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও মানসিক নৈকট্য রয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের ৪০০০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ১৮৭০ কিলোমিটার রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম— প্রতিটি রাজ্যেরই বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত অংশীদারিত্ব রয়েছে। সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দুই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ডেকে আনতে পারে।

চৈনিক আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের মধ্যে সুস্থিতি থাকা জরুরি। মায়ানমারকে ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগরে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন যে ভূ-রাজনৈতিক দখলদারি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, ভারতের পক্ষ থেকে তা প্রতিহত করতে গেলে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখা জরুরি। একটা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারগুলি এই প্রশ্নে বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। যদিও শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে। বিশেষত চট্টগ্রাম বন্দরে প্রভাব ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বাড়ানো, যার ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিনিময় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও যে অভিবাসী প্রশ্নকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জর্জরিত, তার স্থায়ী মীমাংসা না হলে এই সম্পর্ক মজবুত হওয়া সম্ভব নয়।

২০১১ সালের ১১-১৪ ফেব্রুয়ারি দুই দেশের উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক স্তরে যে দৌত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার ফলে স্থলসীমান্ত সমস্যা, জলবণ্টন, ছিটমহল সমস্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ই আলোচনায় উঠে আসে ও বেশ কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠক বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুলভ, যার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশে। আবার বাংলাদেশ থেকে তৈরি পণ্য এক বড়ো পরিমাণে আমদানি করে ভারতবর্ষের এই সকল রাজ্যগুলি। কাঠ,

বালিপাথর, চুণ, সুড়কি, বাঁশ ইত্যাদি উত্তর-পূর্বাঞ্চল রপ্তানি করে এবং আমদানি করে সিমেন্ট, সিনথেটিক বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য ও বস্ত্রসম্ভার।

১৯৯২ সালে পি.ভি. নরসিমা রাও-এর সময় থেকে Look East Policy ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির এক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এই ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মনমোহন সিং। ৯০-এর দশক থেকে শুরু করে একমেরু বিশ্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রভাব বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যদি বিনিয়োগ আহরণ করতে হত, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মানুষের সঙ্গে ভারতের যে জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে, সেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরও স্থায়ী উন্নয়ন ছিল জরুরি আর বাংলাদেশের সহযোগিতা ছাড়া এই উন্নতি বাস্তবায়িত হওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না। ১৯৯৭ সালে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড সহযোগে BIMSTEC গড়ে তোলা হয়, পরে ২০০৫ সালে যে সংগঠনে যুক্ত হয় মায়ানমার, ভূটান ও নেপাল। ২০০১ সালে BIMSTEC-এর Vin-tiane ঘোষণাপত্র অনুযায়ী বাণিজ্য পরিকাঠামোয় উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য যে সকল বোঝাপড়া স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অনিবার্যভাবে এসে পড়ে।

স্থলসীমান্ত সমস্যা ও অভিবাসী সমস্যার সমাধানে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও নিবিড় হতে পারে। '৯০-পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে বহুদলীয় জোট সরকার কার্যকরী থেকেছে। ফলত বহুক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা বাধ্যবাধকতা হিসেবে থেকেছে। আবার অন্য দিকে, বাংলাদেশ এক জটিল ..... সময়ে অস্থিতিশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। যার ফলে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ পূর্ণমাত্রায় সম্ভব হয়নি ও বহুবিধ কায়েমি স্বার্থ বাধাস্বরূপ কাজ করেছে। এই বাধাগুলিকে দূর করা সম্ভব হলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই সম্পর্ক যেমন একদিকে চৈনিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করবে, তেমনই বাস্তবায়িত করবে Look East Policy-কে।

৪.৬ বেআইনি বাণিজ্য

উত্তর ২৪ পরগণার এক স্থানীয় যুবক এই গবেষককে জানাচ্ছেন যে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গোরু পাচারের সঙ্গে দীর্ঘকাল তিনি যুক্ত ছিলেন এবং শুধু নিজে নয় স্থানীয় বহু যুবককে শামিল করেছিলেন, যদিও বর্তমানে তার থেকে সরে এসেছেন। ধরা পড়া, অসম্মানিত হওয়া, বিপুল পরিমাণ বেআইনি জরিমানা ও অনিশ্চিত জীবন তার সরে আসার অন্যতম কারণ।

স্থানীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাকেই গোরু পাচারের বিরুদ্ধে অন্যতম পোস্টার বয় হিসেবে যুক্ত করেছে। এদের এক অংশ এই বেআইনি বাণিজ্য ছেড়ে যেমন পশ্চিম এশিয়ায় শ্রমিক হয়ে কাজ করতে গেছেন, তেমনই সিভিক পুলিশ ভলেন্টিয়ার হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে বহু জন। বনগাঁ-র মিলন দত্ত সৌদি আরবে প্রতিমাসে ১৭০০০

থেকে ২১০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন। আর অন্যদিকে গোরু পাচারের ব্যবসায় যুক্ত থেকে তার আয় ছিল মাসিক ২০০০০ টাকা। যদিও সৌদি আরবে গিয়ে তার আয় খুব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি, কিন্তু তারপরেও BSF-এর হাতে ধরা পড়ার ভয় ও নির্ঘুম রাত কাটানোর যন্ত্রণার থেকে বর্তমান পেশা তার কাছে অনেক অণশে সম্মানের। একসময় সীমান্ত এলাকায় এক-একটি এলাকা দিয়ে দুই থেকে আড়াই হাজার গোরু পাচার হত প্রতিদিন। এই সংখ্যা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ৫০০-রও কম।

রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে বিপুল পরিমাণ গোরু কেনা হয়। সেই গোরু, যা কৃষি উৎপাদন ও গৃহপালনের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এবং সেই বিপুল পরিমাণ গোরুকে নিয়ে আসা হয় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। স্থানীয় অধিবাসীদের সামান্য পরিমাণে অর্থ দেবার মধ্যে দিয়ে তাদেরকেও এই বাণিজ্যে জড়িয়ে নেওয়া হয় এবং খুব স্বাভাবিকভাবে BSF-এর সৈনিকরা যখন খোঁজ করতে সেই গ্রামগুলিতে আসে, তখন গ্রামবাসীরা গো-সম্পদকে নিজেদের বলে দাবি করে।

অদ্ভুত বিষয় হল, সমস্ত সম্প্রদায়গত ট্যাবুর ঊর্ধ্বে উঠে গো-পাচারের বিষয়টি ঘটে। যেহেতু হিন্দু ধর্মীয় পরিচিতিতে গোরুকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্থানীয় চোরাকারবারীরা ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। কারণ এর ফলে তাদের পক্ষে পুলিশি ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজর এড়ানো সম্ভব হয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতীয় আইন ব্যবস্থার যে ফাঁক, তাকে ব্যবহার করে এই গো-পাচার চলে। কারণ, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে গোরু নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা নেই। আইনে বলা আছে যে, ট্রাকে করে ৯টির বেশি গোরু নিয়ে যাওয়া যাবে না। চোরাকারবারি সেই জন্য ছোটো গাড়ি ব্যবহার করে এবং ৬-৭টি গোরু পরিবহন করে। নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্রের কাছে এই খবর সাধারণত থাকে না যে, কতগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই গোরু পাচারের হাত বদল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ ছাড়াও মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে এই গোরু পাচার হয়ে থাকে। যদি কোনো ট্রাক হাইওয়েতে ধরাও পড়ে, সেক্ষেত্রে চালক স্বাভাবিকভাবে জানায় যে, স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য এই গোরুগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদি ট্রাকে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত গোরু থাকে, তবে উৎকোচ প্রদান করে বিষয়টি মিটিণয়ে ফেলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর প্রতিটি গোরুর গড় মূল্য দাঁড়ায় ৩৫০০০ থেকে ৪০০০০ হাজার ভারতীয় টাকা।

Customs Department-এর অফিসারদের মত অনুসারে গোরু পাচারের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২০০০০ কোটি টাকা বাৎসরিক। যদিও ভারতে গো-হত্যার কারণে জেলযোগ্য শাস্তি বরাদ্দ। বেশ কিছু রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ এবং গো-মাণসের বাণিজ্য বেআইনি, কিন্তু তার পরেও গো-মাণসের রপ্তানি করে প্রতিবছর ৩০০০০ কোটি টাকা আয় হয়। বাংলাদেশে গো-মাণসের চাহিদা যদিও সর্বাধিক, কিন্তু সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। যদিও বাংলাদেশে গো-পাচার কোনো বেআইনি বাণিজ্য নয়। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ এই বিষয়ে আইন করে এবং এদেশে গো-পাচারকারীরা বাংলাদেশে ব্যবসায়ী হিসেবে আইনি স্বীকৃতি পায়।

পরিস্থিতির যদিও বদল ঘটে ২০১৫ সালের পরবর্তীকালে। এই পর্যায়ে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং সীমান্ত এলাকায় আসেন এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে গো-পাচার বিষয়ে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন ও পাচারকারীদের স্বার্থে zero-tolerance নীতি গ্রহণ করার পক্ষে সায় দেন। এর বছর দুয়েক আগে NIA ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গো-পাচারকারীর ছদ্মবেশে থাকা বেশ কিছু হিজবুল মুজাহিদিনের সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

গো-পাচারের পরিমাণ যদিও আগের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কমেছে, কিন্তু তার পরিবর্তে সোনা, ড্রাগ, জাল নোট ইত্যাদির কারবার বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ডিউটিরত এক সার্কেল ইনস্পেক্টর এই গবেষককে জানিয়েছেন যে, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল গো-মাংসের ব্যবসাকে ভারতে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া। যদিও ধর্মীয় কারণে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়।

৪.৭ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবাবেগ বৃদ্ধির প্রভাব

দক্ষিণ-এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নটি ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সেই ঔপনিবেশিক সময় থেকে। কারণ, উপনিবেশের শাসক পরাধীন ভারতে এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক পরিচিতিকে ব্যবহার করে তার বিভক্ত করা ও শাসন করার নীতিকে অনুসরণ করেছিল। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভাজন এই বিষয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। একদিকে দেশভাগ দুই দেশের মানুষের মধ্যে যেমন অসহিষ্ণুতার পরিবেশকে শক্তিশালী করে ও সদ্য স্বাধীন দুটি দেশকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করায়, তেমনই দুই দেশেরই ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষজন অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হন। ধর্ম ও রাজনীতির এই সম্পৃক্ততা দক্ষিণ এশিয়ার জাতি-রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও এই সমস্যার উৎস মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি; ধর্ম নয়।

বাংলাদেশ মূলগতভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালের সেন্সাস অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মুসলিম অনুপাত ৮৮.৩ শতাংশ, হিন্দু ১০.৫ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.৫৯ শতাংশ, খ্রিস্ট ০.৩২ শতাংশ এবং অন্য সম্প্রদায় ০.২৬ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষজন জনবিন্যাসের এই অনুপাতকে ভুল বলে মনে করেন এবং সংখ্যালঘুদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি যে অনেকটাই বাড়িয়ে দেখানো ও ইচ্ছাকৃত, তেমনটাই তাদের বিশ্বাস। সরকারি তথ্য ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টের মধ্যে তাই বহুসময় ফারাক লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু দুইয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বেশিরভাগ বাঙালি। রাজনৈতিক শাসকরা সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে শক্তিশালী করার যে দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস নিয়েছেন, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন এলিটতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে বিষয়টিকে আমরা তাই দুটি ভাগে ভাগ করব। প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে ধর্মীয় আদর্শ ও প্রতীকগুলির ব্যবহার রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশকে সুগম করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখব, কীভাবে বৈষম্যমূলক আইন এই বিভাজনের রাজনীতিকে বৈধতা দিয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আধুনিক রাষ্ট্র সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো বহু ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদের অধীনে সমস্ত ধরনের সংস্কৃতি, ভাষা ও লোকায়ত ধর্মকে সমসত্ত্বকরণের যে প্রক্রিয়া নিয়েছে, তা নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু আরও বেশি প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যদিও শুরুর পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে তার যাত্রা শুরু করে, কিন্তু রাজনীতির প্রাঙ্গণে ধর্ম অতি দ্রুত তার দাবিসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়।

এর আগে ১৯৪৯ সালে তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বাংলাভাষার ইসলামিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও দেবনাগরির পরিবর্তে আরবি লিপিতে বাংলাভাষাকে সাজিয়ে তোলার আবশ্যকতার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''Not only Bengali literature, even the Bengali alphabet is bulk of idolatry. Each Bengali letter is associated with this or that God or Goddess of Hindu Pantheon ... Pakistan and Devnagari script cannot co-exist. It looks like defending the frontier of Pakistan with Bharatiya soldiers! ... To ensure a bright and great future for the Bengali language it must be linked up with the holy Quran ... Hence the nceessity and importance of Arabic script."

পূর্ববঙ্গের বাঙালি ধর্মীয় প্রতীকের এই ব্যবহারকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন এবং এই ইসলামীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় এক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে এই নব্যবাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বশাসনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা শুরু করে এবং জীবন ও যাপনের সমস্যা ক্ষেত্র থেকে উর্দুভাষী এলিট পশ্চিম পাকিস্তান নেতৃত্বকে বাদ দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের জাতির জনক মুজিবর রহমান এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন,

> Secularism does not mean the absence of religion. Hindu will observe their own; Christians and Buddhist will observe their religions. No one will be allowed to interfere in other's religions. The people of Bengal do not want any interference in religious matters. Religion cannot be used for political ends ...

উপরোক্ত ভাবনাকে প্রয়োগ করার জন্য সংবিধানের ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রযুক্ত হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন

১) সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করা হবে;

২) যখন রাষ্ট্রের দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টি বন্ধ করা হবে;

৩) রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার সুযোগ যখন থাকবে না; এবং

৪) কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে তাকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ ও বস্তুগত পরিবেশ থাকবে না।

একই সংবিধানের ৩৮ নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে,

> No perosn shall have the right to from or be a member or otherwise take part in the activities of, any communal or other association or union which in the name or on the basic of any religion has for its object or pursues a political purpose.

আশ্চর্যের বিষয়, যে মুহূর্ত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে নিয়ন্ত্রণের ভীতি আর বাংলাদেশের মানুষের মনে আর আগের মতো থাকল না, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে বাঙালি পরিচিতির পরিবর্তে মুসলিম পরিচিতি আবার নতুন করে তার জায়গা ফিরে পেতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের স্বকীয় ভূমিকা ও আওয়ামি লিগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে হিন্দু আধিপত্যের ভীতিকে পুনঃজাগরিত করে। বাংলাদেশ সম্পর্কে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন, ''Secularism in Bangladesh did not reflect its societal spirit.'' এমনকী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধে জেতার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লার করুণা প্রার্থনা করতেন। ১৯৬৯ সালে আওয়ামি লিগের অবস্থান ছিল পাকিস্তানের সংবিধান কোরান ও সুন্নার বিধি অনুসরণে তৈরি হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বেশিরভাগ সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে গণমাধ্যম ও শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে থেকেছে জাতীয়তাবাদের ধারণাটির বিকাশে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশন পাকিস্তান আমল থেকে চলে আসা একটি নিয়মকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তা হল যেকোনো অনুষ্ঠান শুরুর আগে কোরান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার পরিবর্তে সত্যের জয়কে ঘোষণা হিসেবে রাখা হত। শেখ মুজিবর রহমান এই ধর্মমুক্ত পক্ষপাতহীন অবস্থানকে বর্জন করেন এবং ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুষ্ঠান শুরুর সময় আবৃত্তির নির্দেশ দেন। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ও হিন্দু ধর্মীয় উৎসবগুলির ব্যাপকতম প্রচার সাধারণ ধর্মভীরু মুসলিম জনগণের মধ্যে ব্যাপকতম প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

শিক্ষা-সম্পর্কিত যে সকল নীতি প্রাথমিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে নেওয়া হয়, পরিস্থিতিকে জটিল করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। অবিভক্ত পাকিস্তানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা বা ইসলামিয়ত ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাধীনতার পরেও শিক্ষামন্ত্রক এই নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মুজিব সরকার যদিও ১৯৭২ সালে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং এই কমিশন ১৯৭৩ সালে যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে সমস্ত ধরনের শিক্ষা থেকে ধর্মকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনমত কোন পক্ষে তা উপলব্ধি করার জন্য সরকার এই কমিশনের প্রস্তাবকে ব্যাপক আকারের মানুষের মধ্যে বিলিবণ্টন করে ও প্রশ্নপত্রেরমাধ্যমে জনমত উপলব্ধির চেষ্টা চালায়। এই সমীক্ষায় প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে মত

প্রকাশ করেছিলেন। ২১ শতাংশ মানুষ বিপক্ষে ছিলেন। নতুন শিক্ষানীতির এই সমীক্ষা তৎকালীন বাংলাদেশি সমাজের মানসিক অবস্থা ও শেখ মুজিবরের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির মধ্যে যে যোজন ফারাক তা প্রমাণ করে। ধর্মীয় শিক্ষার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ পবিরর্তন হয় যখন মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ ইসলামিক একাডেমিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের জন্য এই একাডেমিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম পরিচিতি সত্ত্বার মধ্যে সংঘাতের আরও উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার আগেই শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তার সামরিক বাহিনীর অফিসার দ্বারা এক নৃশণস হত্যাকাণ্ডে নিহত হন।

ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় অভিমুখে তার যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে। মুজিবকে হত্যা করে যারা সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন, পূর্ণমাত্রায় তাদের লক্ষ্য ছিল জনমতকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং জনগণ সেই পর্যায়ে নিশ্চিতভাবে ছিল ইসলামি ভাবাদর্শের অনুসারী। অভ্যুত্থানের নেতারা তাই নিজেদের প্রভাবকে সংহত করার কাজে ইসলামকে ব্যবহার করেন এবং আগস্ট ১৯৭৫ সালে তারা বাংলাদেশকে একটি ইসলামীয় প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন। যদিও খন্দকার মুস্তাক, যিনি মুজিব জমানায় একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন ও অভ্যুত্থানের পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন, তিনি তার প্রথম জনসমাবেশে বাংলাদেশকে একটি গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। যদিও সেই ভাষণে বারণবার ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার ও ব্যঞ্জনা এটা নিশ্চিতভাবে লিখিয়ে দিয়েছিল যে, আগামী দিনে বাংলাদেশের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি কোনদিকে মোড় নিতে চলেছে। বাংলাদেশ এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আড়াল ছেড়ে ইসলামিকরণের দিকে অগ্রসর হয়।

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি একদিকে ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী ও অন্যদিকে স্বাধীনতাসংগ্রামী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বড়ো বেশি করে লালন করতেন। কিন্তু জিয়া অতি দ্রুত উপলব্ধি করেন, মুজিবপন্থী জাতীয়তাবাদ, যা স্বাধীন বাংলাদেশে পল্লবিত হয়েছে, তা বাংলাদেশ পূর্ব অবিভক্ত পাকিস্তানে রাজনীতির ধারাবাহিকতা। সে কারণেই জিয়া বাঙালিদের জন্য এক নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিলেন, যা দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ধর্মের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ততার মধ্যে দিয়ে জিয়ার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এভাবে যাত্রা শুরু করে। নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য তার দুটি কেন্দ্রের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। যার একটি হল জনগণ ও অন্যটি সামরিক বাহিনী। ইসলামিকরণের দিকে যাত্রা একদিকে যেমন এই দুটি কেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারত, তেমনই এর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আওয়ামি লিগ থেকে নিজের শাসনকে এক উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরনের শাসন বলে পরিগণিত করতে প্রয়াসী হন। জিয়ার রাজনৈতিক দল BNP বা Bangladesh Nationalist Party তাই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে,

> Religious belief and love for religion are a great and inperishable characteristic of the Bnagladeshi nation ... the vast majority of our people are followers of Islam. The fact is well reflected and manifested in our stable and liberal national life.

বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ আসলে আঞ্চলিক। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির সঙ্গে পার্থক্যরেখা সূচিত করার জন্য এর উৎপত্তি। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের জন্য মুসলিম পরিচিতির আত্মঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সময় গণমাধ্যমে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সংবিধানের আইন পরিসরে এই জাতীয়তাবাদের ধারণাকে ব্যবহার করা শুরু হয়।

গণমাধ্যমে এই ব্যবহার যথেষ্ট দৃষ্টিকটুভাবে শুরু হয়। রেডিও বা টিভিতে প্রতি ৫ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর পবিত্র কোরান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া, অনুষ্ঠান শেষের পর্যায়ে কোরান ও হাদিসকে ব্যবহার করা শুরু হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামিয়তকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে এবং নবম ও দশম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৭ সালের সংবিধান সংশোধনীতে প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ হি রহমান-ই রহিম' ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের অষ্টম ধারার পরিবর্তে ঘোষণা করা হয়,

> The principles of absolute trust and faith in the Almighty Allah, nationalism, democracy and socialism meaning economic and social justice, together with the principles derived from them ... shall constitute the fundamental principles of state policy.

সংবিধানের ১২ নং ধারায়, যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, তা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের ৬ নং ধারা অনুসারে স্থির হয় যে, বাংলাদেশের মানুষরা এখন থেকে বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন। সংবিধানের ৯ নং ধারা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভিন্ন বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার কথা বলা হয়েছিল, তা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৭ সালের ৫ এপ্রিল সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এই সকল পরিবর্তনকে বৈধতা দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৭৯ সালের ২১ মে পার্লামেন্টের যে অধিবেশন বসে, সেই অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র কোরানকে সম্মান জানিয়ে ও আবৃত্তি করে। প্রেসিডেন্ট জিয়া অবাঙালি শব্দগুলিকে ধীরে ধীরে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। জয় বাংলা স্লোগানটি অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভারতীয় জয় হিন্দ-এর প্রতিরূপ মনে হওয়ায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (যেহেতু জিন্দাবাদ একটি উর্দু শব্দ এবং পাকিস্তান জিন্দাবাদের প্রতিরূপ) বলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ জুম্মার নমাজের পবিত্র দিনকে অর্ধদিবস ছুটির দিন ঘোষণা করা হয় জিয়ার শাসনকালে। নিজের শক্তিকে জিয়া যত বেশি সংহত করতে থাকেন ও মুসলিম আত্মপরিচয়কে ব্যবহার করতে শুরু করেন, তত বেশি পূর্ববর্তী মুজিব শাসন ভারতপন্থী হিসেবে তকমা পেতে থাকে।

১৯৮১ সালে সামরিক অফিসারদের হাতে জিয়া নিহত হলে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের চেতনা জিয়ার উদারপন্থী ইসলামিক জাতীয়তাবাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামীয় জাতীয়তাবাদের দিকে যাত্রা শুরু করে।

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলে এই নব্য জাতীয়তাবাদ আবার নিজের দিক পালটায়।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের এই মডেলকে এরশাদ গ্রহণ করেন এবং তাকে আরও নিয়ন্ত্রণবাদী চেহারা দেন। এর কারণও ছিল। যেহেতু এরশাদের মুক্তিযুদ্ধে অণশগ্রহণের কোনো গর্ব করার মতো ইতিহাস ছিল না, ফলত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী আঘাত আসে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালে। এরশাদ এই বিশেষ দিনটিতে শহিদ মিনারের সামনে নজরকাড়া আলপনা আঁকার যে রেওয়াজ, তাকে ইসলামীয় অনুশীলন বলে চিহ্নিত করেন এবং ফতোয়া দেন, এই বিশেষ দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে গেলে কোরান থেকে বিশেষ পণক্তি পণক্তিগুলিকে আবৃত্তি করতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী দিনে ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপন হবে ইসলামীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তীব্র বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে যদিও এই নীতি অনুসৃত হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের সমাজের ইসলামীয়করণ সম্পূর্ণ করার জন্য এরশাদের হাতিয়ার ছিল মোটামুটি দুটি—

১) মসজিদকেন্দ্রিক সমাজের বিকাশ ঘটানো; এবং

২) রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের ঘোষণা।

১৯৮৬ সালে এরশাদ গোটা বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। সরকারি স্তরে মসজিদ নির্মাণের জন্য যেমন অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তেমনই পুরোনো মসজিদগুলো সংস্কারের জন্য বিদেশি অনুদানকারী সংস্থার অর্থগ্রহণও শুরু হয়। নিয়ম করে এরশাদ বিভিন্ন মসজিদে শুক্রবারে ভাষণ দিতেন এবং বিভিন্ন মুসলিম পীর ও ধর্মগুরুর সঙ্গে তার সাক্ষাতের খবর ফলাও করে গণমাধ্যম ও অন্যান্য জায়গায় পরিবেশিত হত।

১৯৮৮ সালের ৭ জুন বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এরশাদ তার ধর্মাশ্রিত রাজনীতিকে প্রবেশ করান। ১৯৮৩ সালে তিনি ইসলামীয়ত্বের সঙ্গে আরবি ভাষা শেখাকে বাধ্য বলে ঘোষণা করেন। ব্যাপকহারে তার সময় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন শুরু হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমতুল বলে ঘোষণা করা হয়। এরশাদ জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচিতে ইমামদের শামিল করার লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। শুক্রবারের জুম্মার নামাজের দিন পুণ্যদিবস ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়। বাঙালি সমাজের ইসলামীয়করণের যে প্রক্রিয়া এরশাদ নিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে ইসলাম নিবিড়ভাবে প্রবেশ করে। এমনকী ১৯৯০ সালে যখন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদকে উচ্ছেদ করা হয়, তার পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই ধর্মীয় প্রতীকগুলিকে ব্যবহার করা শুরু করে।

দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী অনুষঙ্গে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভাজন ও দুটি নতুন জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দুই দেশের সংখ্যালঘু মানুষের জীবনে এক অবর্ণনীয় অভিশাপ হয়ে সামনে এসেছিল। যদিও ভারত নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিল এবং পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র না হওয়ার, কিন্তু বিভাজন-পরবতী দু-দেশের রাজনীতিতে ধর্ম গভীরভাবে ছায়া বিস্তার করতে থাকে এবং

নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সমস্ত স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন দুই দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। অবিভক্ত পাকিস্তানের ইসলাম যতই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে, অমুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে হিন্দুরা ততই প্রান্তিক হতে থাকেন এবং একই পরিস্থিতি তৈরি হয় ভারতীয় মুসলিমদের ক্ষেত্রেও। পাকিস্তানে ওই পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়, যখন রাষ্ট্র অমুসলিম জনতাকে আইনি ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকদের এই পদ্ধতিকে পরবর্তীকালে গ্রহণ করে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

পূর্বতন শত্রু সম্পত্তি আইন বা Enemy Property Act, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে Vested Property Act বলে পরিচিত হয়, তার অন্যতম প্রধান ফলাফল— সেই দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন সরকারি ও প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত বাসস্থানের। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন কার্যকরী হয় এবং বলা হয়েছিল যে, মেয়াদ হবে মাত্র তিন বছর। পূর্ববঙ্গের বিধানসভার হিন্দু সদস্যরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, অধিগ্রহণের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে প্রকৃতপক্ষে এই আইন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। তাদের আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৫১ সালে East Bengal Evacuees (administration of inmovable Property) Act পাস হয়। এই আইনের বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে সকল হিন্দু পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা শুরু হয়।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে The Defence of Pakistan Ordinance আইন পাস হয়। এই আইন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ উপায় গ্রহণের কথা বলে। জরুরি অবস্থা জারি হয়। জরুরি অবস্থার অণশ হিসেবে Defence of Pakistan Rules ঘোষণা করা হয়, যার অধীনে শত্রুর সম্পত্তির আইন পাস হয়। এই আইনে ঘোষিত হয়—

1. India was declared as an enemy country.
2. All interests of the enemy (i.e., the nationals/ citizens of India, those residing in the territory occupied/ caputred/ controlled by India) in firms and companies, as well as in the lands and buildings situated in Pakistan, were to be taken over by the custodian of Enemy Property for control or management.
3. The benefits arising out of trade, business or lands and buildings were not to go to the enemy, so as to not affect the security of the state of Pakistan or impair its defence in any manner.

যদিও ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এই সমস্ত আইন এর পরেও জারি থাকে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কোনো পরিবারের সম্পত্তি একবার শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হলে, চিরজীবনের জন্য তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। এই আইন শুধু বৈষম্যমূলকই ছিল না, একদিক থেকে এটি ছিল দেশের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশের মানুষের প্রতি

চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিও এই আইন জারি রাখে ও সামান্য পরিবর্তন করে এর নাম হয় Bangladesh Vesting of Property and Assets Order। এই সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে ও স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তার পরও এই সাম্প্রদায়িক আইন অক্ষুণ্ণ থাকে এমন একটা সময়, যখন ভারতের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। যদিও এই আইন পাঠ করলে যে কারও অনুভব হবে যে, ভারত ও বাংলাদেশ দুটি রাষ্ট্রই যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে Vested Property Act প্রত্যাহার করা হয় এবং Vested Property Return Bill নামে একটি নতুন বিল আসে। এই বিলে বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র সেই সকল সম্পত্তি প্রত্যাহার করা যাবে, যেগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বা দখলে রয়েছে এবং অভিযোগকারীকে তার সম্পত্তির উপর অধিকার কায়েমের জন্য নিজের স্থায়ী নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাতে এই সম্পত্তি প্রত্যাহার কার্যের জন্য বিশেষ Tribunal গঠন করা হবে, যেখানে উপযুক্ত মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করে প্রকৃত মালিকরা ৯০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। ট্রাইবুনালকে ১৮০ দিনের মধ্যে সমস্ত কেসের নিষ্পত্তি করতে হবে। এই বিল অনুসারে, যে সকল সম্পত্তির উপযুক্ত প্রমাণপত্র মিলবে না বা বৈধ প্রমাণ দাখিল করার জন্য কেউ অনুপস্থিত থাকবে না, সেই নির্দিষ্ট সম্পত্তি সরকার লিজ দিতে বা বিক্রি করতে পারবে। হাইকোর্ট থেকে যে সম্পত্তির অধিকারের জন্য ইতিমধ্যে ডিক্রি জারি করা হয়েছে বা যে সম্পত্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে লিজ দেওয়া হয়েছে, সেই সম্পত্তি এই বিলের আওতায় আসবে না। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষই মনে করতেন যে সম্পত্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত এই বিল আদতে তাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ জমি থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাদের জমি ও সম্পত্তির বেদখল যে বহাল তবিয়তে আছে, তার কারণ রাষ্ট্র ও সরকারপক্ষ থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব। হিন্দুরা মনে করেন যে, ব্যবসা থেকে চাকুরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক মনোভাব, তার কারণ রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক। শুধুমাত্র আইন বদল করে এই অসম সম্পর্কের কোনো ধরনের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলে আসা এই অনিশ্চয়তার বাতাবরণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যখন ভারতবর্ষে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। এই পর্যায়ে সারা দেশ জুড়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত দাঙ্গা শুরু হয়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে মন্দির ধ্বংসের ঘটনা, মন্দিরগুলিতে আক্রমণ ও গণহারে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা এক-একটি এলাকায় তুমুল রূপ নেয়। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নরসিংহি, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, গাজিপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ি, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাথ, সিলেট, কুমিল্লা, লকিমপুর, ফেণী,

চাঁদপুর, নোয়াখালি, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, সুনামগঞ্জ, মৌলবিবাজার, হবিগঞ্জ, ভোলা, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পোটুয়াখালি, খুলনা, মাগুরা, বরগুণা, সিরাজগঞ্জ, পাবদা, কুষ্টিয়া, নাটোর, ঠাকুরগাঁ, রণপুর, নওগাঁও, দিনাজপুরে আক্রমণের ঘটনাগুলি ঘটে। এই দীর্ঘ তালিকা দেখিয়ে দেয় যে, দাঙ্গার ঘটনাগুলি ছিল পরিকল্পিত ও জাতীয় স্তরের, কোনো বিচ্ছিন্ন বা একক ঘটনা নয়। রাজনৈতিক প্ররোচনা ছাড়া এত বড়ো আকারে আক্রমণের ঘটনা কখনোই সংঘটিত হতে পারত না। সরকার নিশ্চুপ ছিল। প্রশাসনিক পক্ষপাত ছিল দাঙ্গাকারীদের পক্ষে। গোটা দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোবল ব্যাপক ধাক্কা খায়। বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পরে বড়ো আকারে দেশ ছাড়ার ঘটনা এই সময় থেকে আবার নতুন আকারে শুরু হয়।

একদিকে রক্তাক্ত এই অভিজ্ঞতা, ও অন্যদিকে নিষ্ক্রমণ ও বড়ো আকারের অনুপ্রবেশের ঘটনা ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষে সোচ্চার হয়, তাদের মুসলিম বিরোধী প্রচার আরও বৃদ্ধি পায়, যা রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও বিষিয়ে তোলে। ভারতবর্ষে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে, যার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে হিন্দুরাও আক্রান্ত হন।

Vested Property Act বাংলাদেশে হিন্দু জনসম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার অন্যতম বড়ো কারণ। হিন্দুরা একে কালা আইন বলে মনে করেন। এই আইনের বলে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে দেশ ছাড়ার ঘটনা ঘটেছে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সরকারি হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ৭০৩ জন এবং ১৯৬৪ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ৫৩৮ জনকে হিসেবে ধরলে এই গোটা পর্বে প্রায় ৫৩ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়েছেন। এই আইনের বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন জমি বা সম্পত্তি কিনতে ভীত থাকেন এবং নিজ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হন। ২০০১ সালের অক্টোবরের সংসদীয় নির্বাচনে গণতন্ত্রের আদর্শ আরও একবার ভূলুণ্ঠিত হয়। সংখ্যাগুরুর গণতন্ত্র জাতীয় সংসদে যে সংখ্যালঘুর কণ্ঠস্বরকে অনুমোদন করবে না, তা খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ সভায় ৩০টি আসন ছিল একসময় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। যদিও ২০০১ সালে সেই সংরক্ষণের মেয়াদ শেষ হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়কালে সংসদের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ছিল আট (৮) জন সংসদ এবং তিন (৩) জন ছিল চাকমা সম্প্রদায়ের। আওয়ামি লিগ সংরক্ষিত মহিলা আসনে যে তিনজনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ২ জন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং ১ জন রাখাইন। ২০০১ সালে সংসদীয় নির্বাচনে যে সাতজন সংখ্যালঘু সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে তিন (৩) জন আওয়ামি লিগের এবং দুই (২) জন বিএনপি-র, একজন চাকমা সম্প্রদায়ের ও একজন মারমা সম্প্রদায়ের। এই নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ এক তীব্র রাজনৈতিক রূপ নেয়। যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আওয়ামি লিগের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে থেকেছেন। ফলত বিএনপি-র সদস্য ও তার শরিক দলগুলির হাতে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হন। কোনো কোনো এলাকায়, যেখানে আওয়ামি লিগের স্থানীয় নেতৃত্ব মনে করেছেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের প্রতি বিরূপ এবং তাদের ভোটদানের বিরুদ্ধে, সেখানে আওয়ামি

লিগের হাতে সংখ্যালঘুরা আক্রমণের স্বীকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিও এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করেছে ও ব্যাপকতর লুট ও হত্যা সংগঠিত করেছে।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রায় দিন ১৫ আগে থেকে হিংসাত্মক ঘটনাগুলি শুরু হয়, যা গোটা পুজো পর্ব জুড়ে চলে। এই পর্যায়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়। প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, যুগান্ত, সময়, বাংলা বাজার, ইনকিলাব, Daily Star, ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ— এইসব প্রথম সারির সংবাদপত্রের হিসেব ধরলে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে প্রায় ৩৩০টি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ধর্ষণ, হত্যা, পারিবারিক নিগ্রহ, লুঠ, ভীতি প্রদর্শন, চুরি, বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ও সম্পত্তি ধ্বংসের মতন একের পর এক ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষজন নির্বিচারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যেহেতু পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই যুদ্ধকে সাম্প্রদায়িক রণ দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করার জন্য এই যুদ্ধ আসলে হিন্দু ভারতের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ফলত সেই সময় প্রায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন আক্রান্ত হন। আগস্ট ১৯৭১ সালে প্রায় ছয় (৬) লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনতা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাই সমাজের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া ও সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সতত চিন্তিত। বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ইসলামীয় পরিচিতি সত্ত্বার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ এবং জাতীয় রাজনীতিতে ভারত কার্ডকে ব্যবহার করার যে খেলা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি খেলছে, তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বিপর্যয় বেড়েছে শুধু। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী, যাতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে, তা এই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এক তীব্র আঘাত। এই ঘটনার পরেই এই সম্প্রদায়ের মানুষ জোরালোভাবে ঐক্যবদ্ধ হন। গড়ে ওঠে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'। যদিও এই সংগঠনটির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর বিলুপ্তি, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে সমস্ত ধরনের বৈষম্যমূলক আইন ও অনুশীলনকে বাতিল করার জন্য এই সংগঠন দাবি জানিয়েছে ও তার জোরালো স্বর উত্থাপন করেছে।

দৈনিক সংবাদপত্রগুলিও সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে জোরালোভাবে প্রকাশ করেছে ও সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক জনমতও সোচ্চার হয়েছে এর ফলে। কয়েক বছর আগে ঐক্য পরিষদের নেত্রী প্রিয়া সাহা-র সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর সাক্ষাৎ-এর পর সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রকাশ্য নিন্দা করেন এবং এই নির্যাতনের সঙ্গে তুলনা করেন জার্মানিতে ইহুদিদের উপর নিপীড়নকে। বিভিন্ন অসরকারি সংস্থা, এনজিও, মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের অধিকার নিয়ে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন গ্রুপ আক্রান্ত এলাকাগুলিতে বার বার তথ্য অনুসন্ধানে টিম পাঠিয়েছে এবং সত্যকে উন্মোচন করেছে। আইন ও সালিশী কেন্দ্র, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, নিজেরা করি, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারী উদ্যোগ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, Bangladesh

Legal Aid and Services Trust এবং Society for Environment and Development-এর মতো সংগঠন ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। নিরন্তর প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সাংবাদিক বৈঠক করে আক্রান্ত পরিবারগুলিকে সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির করে এই সকল সংগঠন ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় থেকেছে এবং সরকারের উপর চাপ তৈরি করেছে, যাতে প্রশাসন নিরাপরাধীকে ছাড়তে বাধ্য হয় এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ আক্রান্তের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি যাতে গতি পায়। সরকার যাতে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে এবং রাজনীতিক পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, রাজনীতির স্বার্থে মানুষকে ব্যবহার করার প্রক্রিয়ার যাতে গতিরোধ হয়, তার জন্য এই সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে নিরন্তর জনস্বার্থ মামলা হয়েছে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি পথে একে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ও হিংসার যে কারণ, তার বীজ নিহিত আছে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই। যে জাতি-রাষ্ট্র একক পরিচিতি সত্ত্বার প্রশ্নকে সামনে রেখে বাকি সমস্ত স্বরকে মুছে ফেলে ও গণতন্ত্রের স্বরকে করে সংকুচিত। যার ফলে রাজনীতির এক অমানবিক রূপ আমরা দেখতে পাই। পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি নিঃসন্দেহে আজকের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যার ফলে ব্যাপক মানুষের জীবন ও জীবিকার অধিকার হয়ে পড়ছে ক্রমসংকুচিত। রাষ্ট্রীয় স্তরে যে সকল বৈষম্যমূলক আইন ও নীতিমালা গড়ে উঠেছে সেগুলিও এই বিভাজনের ক্ষেত্রটিকে বৃদ্ধি করেছে আরও সুগভীর ভাবে। রাজনীতির নামে গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও স্বশাসনের পরিবেশকে হরণ করছে ও মানুষকে ভোট নামক একটি নিছক সংখ্যায় পরিণত করেছে মাত্র। সামগ্রিক দায়বদ্ধতার অভাব ও অস্বচ্ছতা এই পরিবেশকে আরও বিষাক্ত করে তুলছে।

নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে তাই কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে ও প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে গণ্য করতে পারে না। সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কারণ এর গভীরে নিহিত থাকে। তাকে অগ্রাহ্য করে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধান না করে যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামরিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে কোনো এক সময় নিঃসন্দেহে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশ— উভয় রাষ্ট্র যদি তার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উপযুক্ত নিরাপত্তা দানে সমর্থ হয়, তাদের অসন্তোষগুলি যথাবিহিত সমাধান করে ও সমাজের নীচের তলায় গণতন্ত্রের প্রসার ঘটায়, তবে সমাজের সকল শ্রেণির, ধর্মের ও পরিচিতির মানুষ রাষ্ট্রের জন্য এক মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে। এইজন্য দুই দেশকে তার সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ও ভাষাগত বিভিন্নতাকে মর্যাদা দিতে হবে এবং ধর্মীয় উন্মাদনা যাতে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে বিপথে চালিত করতে না পারে, তার সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার এক সংকটকালীন সময়ে রোহিঙ্গা মুসলিম জনতাকে আশ্রয় দিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারত আফগানিস্তানে নিপীড়িত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের দেশে ফিরিয়ে যেমন মানবিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে, তেমনই নিজ নিজ দেশে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও অপর

হিসেবে চিহ্নিত না হন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা, চর্চা ও ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের বাতাবরণ। সমাজের গণতান্ত্রিকীকরণের এই প্রয়াসে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকেও সমান তালে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে একটি অণশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় ও সমাজ এক সুস্থায়ী বিকাশের দিকে তার যাত্রা শুরু করে।

৪.৮ সামরিক ও রণনীতিগত দিকসমূহ

প্রায় ৫০ বছর পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অণশীদার। বলাই বাহুল্য ভারতের স্বয়ংক্রিয় সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার কারণেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভবপর হয়, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে যার তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। জন্মের পরের মুহূর্তে ভারত প্রায় ২৫ বছরের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (Treaty of Friendship and Cooperation) স্বাক্ষর করে বাংলাদেশের সঙ্গে। বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক স্তরে ভারত ও বাংলাদেশ কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিবিধ চুক্তিতে আবদ্ধ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম এবং ভারতের 'Neighbourhood First Policy'-র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এক চিরন্তনী স্থায়ী রণনৈতিক মিত্র হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে গণ্য করে। এই পর্যায়ে ভারত বাংলাদেশকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য করেছে এবং ভারত-বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর মধ্যে মৈত্রীর নিদর্শন স্বরূপ ভারত বাংলাদেশ বাহিনীকে ১২০টি নতুন মর্টার প্রদান করেছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ১২২ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অণশগ্রহণ করে। দুটি ভারতীয় নৌবহর INS Kulish এবং INS Sumedha ওই বছরই ৮ থেকে ১০ মার্চ বাংলাদেশের মণলা বন্দর পরিভ্রমণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি প্রয়োজন, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য রণনৈতিক মিত্র হিসেবে ভারতেরও লক্ষ্য বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে গড়ে তোলা। ভারতের নতুন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল মনোজ পাড়ে তার বাংলাদেশি সহযোদ্ধা জেনারেল এস.এম. সইফুদ্দিনের সঙ্গে এক ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া আরও বেশি বাড়ানোর বিষয়টির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুই সেনাপ্রধানই আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে নিজস্ব মতামত বিনিময় করেছেন।

ভারত এবং বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রেরই এক দক্ষ ও পেশাদার সৈন্যবাহিনী রয়েছে, যা এই এলাকাটির পূর্ব প্রান্তের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত। বেশ কিছু বছর ধরে দুই সৈন্যবাহিনীর যৌথ মহড়া, যৌথ প্রশিক্ষণ, প্যারেড এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ২০১৭ সালে শেখ হাসিনা যখন ৪ দিনের জন্য ভারত ভ্রমণ করেন, তখন সেই পর্যায়ে দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম চুক্তির মাধ্যমে সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুত হয় বাংলাদেশি বাহিনীকে ট্রেনিং এবং প্রশিক্ষণ দিতে

এবং দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বিষয়ক উৎপাদনের অস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তি নির্মাণ ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তার বিষয়ে দুই দেশ চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঋণ ও অনুদানের নীতি প্রথম যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভারত গ্রহণ করেছে, সেই দেশটির নাম বাংলাদেশ।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, প্রাকৃতি দুর্যোগের বিরুদ্ধে ভূমিকা ও মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার প্রধান M.M. Naravane বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আজিজ আহমদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিন হন এবং তথ্য ও ডেটা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্মত হন। মায়ানমার সরকার তাদের দেশের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ গ্রহণ করলে সম্ভাবনা দেখা দেয় যে, এই সকল জঙ্গি কার্যকলাপের পরিধি ভারত ও বাংলাদেশে সম্প্রসারিত। একে রোখার জন্য দুই দেশই যৌথ বোঝাপড়ার নীতি গ্রহণক রে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় বিদেশসচিব হণসবর্ধন শ্রিণলা এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মিত্র হিসেবে বাংলাদেশকে ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে যান এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে মিলিত হন।

দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে দুই দেশের অণশগ্রহণ। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী মোকাবিলার ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ এবং বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ রুখতে দুই দেশই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাটিতে যে জঙ্গি কার্যকলাপের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, তার উল্লেখ করতে গিয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ভূ-রাজনৈতিক দখলদারির ক্ষেত্রে এক আগ্রাসী শক্তি হিসেবে যখন চীন তার প্রভাব বিস্তার করছে এবং ভারতের প্রতিবেশী প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রকে ঋণ ও অনুদানের জালে আবদ্ধ করে ঘেরাও নীতি অনুসরণ করতে চাইছে, তখন দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক, সামরিক মিত্র হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা ভারতের কাছে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, তাই স্বাভাবিক। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে আমরা দেখব রণনীতির ও নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে এই দুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কে বিবর্তনের ইতিহাস।

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ভারত আজ পর্যন্ত তার প্রতিবেশীদের বিষয়ে কোনো ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থিতিশীল নয়, সংঘাতে ভরা। এক সম্প্রসারণবাদী চরিত্রের কারণে ভারতীয় শাসকদের চিন্তাকাঠামো, বৃহৎ শক্তি হিসেবে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা, বহুজাতিক বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে জটিল ও উত্তেজনাপ্রবণ করে তুলেছে। প্রায় সময়ই লক্ষ করা যায়, ওই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির থেকে ভারতীয় শাসকদের প্রত্যাশা এতটাই বেশি যে, তা সেই দেশের জনগণের মধ্যে এক মানসিক চাপ ও ভারত সম্পর্কে বিরূপতা তৈরি করে। বহু ক্ষেত্রে এই সব দেশের জনগণের

ধারণায় ভারতরাষ্ট্র বন্ধু হিসেবে প্রতিভাত হয় না। তবে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্ক ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে একই প্যাটার্ন অনুসরণ করেনি। যে সকল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্পর্ক উত্তেজনাপ্রবণ থেকেছে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অন্যতম।

সাধারণত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কিত আলোচনা মূলত বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ভারতীয় শাসকশ্রেণির বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা আলোচনার বাইরে থেকে যায়। অথচ এই চিন্তাভাবনা বা 'টাইপ' ধারণাগুলির বাংলাদেশ সম্পর্কিত ভারতীয় নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভারতের দিক থেকে প্রত্যশা পূরণের বিষয়ে চাহিদার পারদ বেশি থাকে, তেমনই ন্যায্য প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে ভারতীয় শাসকদের উদাসীনতা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি করে। এই হতাশা ও ক্ষোভের বিস্ফোরণকে অনেকেই 'ভারত বিরোধিতা' বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে ভারত রাষ্ট্রের কাছে কৌশলগতভাবে লাভজনক ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার আধিপত্যকামী শক্তিতে পরিণত হবার যে আকাঙ্খা, তা এই জয়ের মধ্যে দিয়ে গতি পায়। বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগ এবং ভারতবর্ষের শাসকদল কণগ্রেসের মধ্যে মতাদর্শগত মিল দুই দেশের মধ্যে এক ইতিবাচক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। কিন্তু সম্পর্কের এই স্বাভাবিক মাত্রা বজায় থাকেনি।

এই সম্পর্ক কেন স্বাভাবিক গতিতে চলল না, তার উত্তর খোঁজা দরকার। ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তন হয়ে বাংলাদেশে যে নতুন নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসল, তারা কি ভারতীয় সহযোগিতার কথা বিস্মৃত হলেন? অথবা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের উর্বরভূমি হিসেবে দেখার ভারতীয় 'স্টিরিওটাইপ' ধারণাগুলি মুখ্য ভূমিকা রাখল? নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির উদাসীনতা কি এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে নষ্ট করেছে না কি বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকারগুলির প্রতি সংবেদনশীল হতে ভারতীয় শাসকদের ব্যর্থতা এই সম্পর্কের চলনকে আর গতি দিতে পারেনি?

প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা দরকার এবং এই প্রশ্নগুলি বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ উত্তর পাওয়ার উপর নির্ভর করছে ভারত-বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নটির যথোপযুক্ত সমাধান ও দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই দুই দেশের রণনৈতিক সম্পর্কের বিন্যাস। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আলোচনায় ১৯৭৫ সালকে একটি বিভাজন রেখা হিসেবে দেখানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বলা হয় যে, এই সময় থেকে সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটেছিল। কিন্তু তথ্যগতভাবে এই ধরনের যুক্তি ভুল বলে প্রমাণিত হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা গিয়েছিল।

বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোনো সরলরেখা নয়, অনেকটাই আঁকাবাঁকা পথে এগিয়েছে। দুই দেশের ক্ষমতায় আসীন সরকারগুলির মধ্যে কখনো মতাদর্শগত মিল, কখনো-বা ভিন্নতার কারণে সম্পর্কে এই ধরনের চেহারা নিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা আওয়ামি লিগকে আস্থাভাজন বলে মনে করে থাকেন। ফলত

আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় থাকলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ইতিবাচক পরিণতি লাভ করে। আওয়ামি লিগ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে ভারতীয় শাসকরা স্বস্তি লাভ করে। আবার বৈদেশিক নীতিতে শেখ মুজিব পরবর্তী কালে ভারত-সোভিয়েত ঝোঁকের পরিবর্তে জিয়াউর রহমান মুসলিম বিশ্ব ও চীনের সঙ্গে আদান-প্রদান শুরু করলে ভারত শঙ্কিত হয়ে পড়ে। জিয়ার সামরিক শাসন ইন্দিরা গান্ধী তথা ভারতীয় শাসকদের বিতৃষ্ণার কারণ ছিল। এই কারণে '৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বিএনপি-র রাজনৈতিক চিন্তাধারা কণগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং বিএনপিকে সাম্প্রদায়িক ও তার বিপরীতে আওয়ামি লিগকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে দেখার প্রবণতা শুরু হয়। এই প্রবণতা আজও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন যেকোনো সরকারই এই গুরুত্বকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে। এই গুরুত্বের পেছনে ভূগোলই একমাত্র কারণ নয়, ইতিহাস-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণগুলিও রয়েছে। স্বাধীনতার চার দশকেরও বেশি সময় শাসকদলগুলোর রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে বাংলাদেশ কখনো ভারতের ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আবার কখনো দূরত্ব তৈরি হয়েছে। লক্ষ করা যায়, আওয়ামি লিগ ও বিএনপি সীমান্তের এই প্রতিবেশীর বিষয়ে ভিন্ন ধরনের বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় দলই ভারতের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে থাকে। সুতরাণ এই কথা বলা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হবে না যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-কৌশলগত পরিবেশে ভারতকেন্দ্রিক না হয়ে প্রণীত হওয়া সম্ভব নয়।

বাংলাদেশকে নিয়ে সাধারণভাবে ভারতবর্ষে কতগুলি স্টিরিওটাইপ চিন্তা লক্ষ করা যায়। এই ধারণা অনুসারে বাংলাদেশ ইসলামীয় রাষ্ট্র, ইসলামীয় জঙ্গিবাদের চারণভূমি, ভঙ্গুর রাজনীতির দেশ, ভারতবিরোধী পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর তৎপরতার স্থল বাংলাদেশ ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বিচ্যুত বাংলাদেশ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি, বিশেষত হিন্দুদের প্রতি অসহিষ্ণু বলে ভারত মনে করে। এছাড়া ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহারের কারণে ভারত দেশটির প্রতি নীতিবাচক মনোভাব পোষণ করা হয়। এই সব স্টিরিওটাইপ নিঃসন্দেহে তথ্য বিভ্রান্তির ফল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সে দেশে স্রোতের ন্যায় ভারতীয় অতিথিরা আসতে থাকেন। এদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা। পাকিস্তানি 'দালাল' মুসলিম লিগ ও জামাতের সদস্যরা ছাড়া সে সময় আপামর বাংলাদেশি জনগণের ভারত নিয়ে আবেগ এতটাই তীব্র ছিল যে, তারা এই আসা-যাওয়া, ভারত সরকার ও জনগণের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধান্বিত হননি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দুই দেশের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কিছু দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্বেগ ও অস্বস্তির প্রকাশ ঘটেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ও শিল্প-কারখানার কাঁচামাল ভারতে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রাথমিকভাবে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। পরে এই তালিকায় গঙ্গার জলের অণশীদারিত্ব, স্থলবাণিজ্যের আড়ালে চোরাচালান বৃদ্ধি, রক্ষীবাহিনীর পোশাকের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর

পোশাকের মিল-এর মতো বিষয় জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপন করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রয়াত সামসুল হকের ভাষায়, ''স্বাধীনতার পর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত উষ্ণ, আন্তরিক ও প্রায় গতিময় ছিল। স্বাভাবিক কারণে আবেগের দ্বারা কোনো সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এবং ওই জাতীয় সম্পর্কের এক যুক্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল ভিত্তি থাকতে হবে। সম্পর্কের এই ধরনের রূপান্তর এমনকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সময়েই নানান চড়াই-উতরাইয়ের মাঝে শুরু হয়েছিল।''

অবশ্য বাংলাদেশিদের এই জাতীয় ক্ষোভকে ভারতের সরকারি ও জনগণের পর্যায়ে ভুলভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটাকে সাম্প্রদায়িকতা ও অকৃতজ্ঞতা হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশের জনগণের মনস্তত্ত্বকে অদ্ভুতভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন ভারতীয় লেখক মন্তব্য করেছিলেন যে, পাকিস্তান আমলে সরকার সাম্প্রদায়িক হলেও জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর যদিও বাংলাদেশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছিল, কিন্তু জনগণ সাম্প্রদায়িকে পরিণত হয়। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও ঢাকার উপ হাই কমিশনার জে.এন. দীক্ষিত কূটনীতিক হিসেবে তার স্মৃতিকথায় এই ভারতীয় সরকারি ভাষ্যটি সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছিলেন। দীক্ষিত বিশ্বাস করেছিলেন যে, সময় অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ এক ইসলামি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে। কিন্তু এটা ভোলা কখনো উচিত হবে না যে, এই জাতীয় পদক্ষেপ প্রথম নিয়েছিলেন শেখ মুজিব নিজেই, যিনি ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে অণশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে বৈদেশিক নীতি বিষয়ক তার প্রকাশ্য ঘোষণায় তিনি বলেছিলেন যে, ''যদিও বাংলাদেশ তার ভাষাগত সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে, তার পরও এটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি একটি অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র।''

দীক্ষিত-এর মতে, ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে হলে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের দুটি স্বত্ব পূরণ করতে হবে— ভারত থেকে কিছু পরিমাণে দূরত্ব বজায় রাখা এবং ইসলামিক পরিচয়কে ধরে রাখা। তিনি মনে করেন, এই স্বত্বগুলি বাংলাদেশের আঞ্চলিক নীতিতে ভীষণ প্রভাব ফেলে এবং ১৯৯১-এর মধ্যে এই দুটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রে কাজ করছে।

যদি বাংলাদেশে OIC-র সদস্য প্রাপ্তি এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ঢাকা সফরকালে তাকে দেওয়া বিপুল সংবর্ধনা নিয়ে ভারতীয় নীতি নির্ধারক পর্যায়ে হতাশা ছিল। তথাপি দুই পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু মুজিব হত্যা, সামরিক সরকারের দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে মুছে ফেলা এবং সমাজের ইসলামিকরণ বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। এরশাদ কর্তৃক ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা এই অবিশ্বাসের মাত্রাকে আরও গভীর করে তোলে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, বাংলাদেশে ইসলামিকরণ বিষয়ে ভারতের মনোভাবের মধ্যে অতিরঞ্জন রয়েছে। পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা শুধুমাত্র প্রতীকী। স্লোগান কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলি নির্বাচনে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ফল দেখাতে পারেনি। ইসলামি জঙ্গিবাদ ও রাজনীতির প্রধান স্রোতধারায় কোনো ভূমিকা না রাখা সত্ত্বেও তা নিয়ে ভারতে অতিরঞ্জিত মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অভিবাসন নিয়ে ভারতের এক শ্রেণির রাজনীতিবিদ লেখক ও সাংবাদিকদের এক নির্দিষ্ট ধরনের মত প্রকাশ করতে দেখা যায় এবং তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল যে, পরিকল্পিত অবৈধ অভিবাসন ভারতে অবৈধ ভোটবাক্সকে শক্তিশালী করবে, জনসংখ্যার প্যাটার্নকে বদলে দেবে এবং ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক ভূমিকা পালন করবে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের মর্মান্তিক হত্যার পর বাংলাদেশের সামরিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপটে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া ও এমনকী শেখ হাসিনার শাসনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ভারত বিরোধিতা ও ইসলামিকরণ দৃঢ়ভাবে প্রতীত হয়েছে এবং তার দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনী ও BDR, যা বর্তমানে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ ও মানসিক ওরিয়েন্টের মাধ্যমে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যে, তাদের কাছে ভারত হল চরম শত্রু।

নিজ নিরাপত্তা ও আঞ্চলিকতা অখণ্ডতা বজায় রাখা ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি কেন্দ্রীয় বিষয়। এটা যেকোনো দেশের জন্য সত্য হলেও ভারতের ক্ষেত্রে এর ব্যঞ্জনা ভিন্ন। দেশটির পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারকদের কাছে ভারতের সন্নিহিত অঞ্চল সবসময়ের জন্য নিরাপদ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিলাষ হিসেবে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যতে বিশ্বশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে ইচ্ছুক ভারত তাই দক্ষিণ এশিয়ার অধিপতি হিসেবে নিজেকে রূপান্তরিত করতে চায়। যেকোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনাকে তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো অঞ্চল বহির্ভূত শক্তিকে ভারত সহ্য করেনি। ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ ঘটনায় ভারতের দিক থেকে হস্তক্ষেপের বহু নজির রয়েছে। অন্যতম উদাহরণ শ্রীলঙ্কা। ৪০০০ কিলোমিটারের অধিক সীমান্তের অংশীদার বাংলাদেশ ভারতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনায় স্থান পেয়ে থাকে। একজন ভারতীয় বিশ্লেষক লিখেছেন, ভারত চায় এমন এক ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, যা তার জন্য কোনো নিরাপত্তার হুমকি হবে না। যে রাষ্ট্র তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ট্রানজিট দেবে এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলির সমাধান চাইবে। (S.S. Patanayak, *Indian Neighbourhood Policy perception from Bangladesh Strategic Analysis*, Vol. 35, Issue 1, January 2011, pp. 71-78)

ভারতীয় শাসকদের দিক থেকে বাংলাদেশকে নিয়ে সবচেয়ে বড়ো নিরাপত্তার হুমকি হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাধীন বাংলাদেশের অধিকার ভারতীয় শাসকদের কাছে একটি অন্য লাভ হিসেবে ওই এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বন্ধ করার সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। এবং শুরুতে ভারতের এই লক্ষ্য সহজে পূরণও হয়েছিল। কিন্তু মুজিবের হত্যার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং সেইসময় কাদের সিদ্দিকিকে ভারত তার মাটিতে আশ্রয় দিয়েছিল সামরিক তৎপরতা চালানোর জন্য। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বিদ্রোহীদের ভারত আশ্রয় দিয়েছিল। পরস্পরের বিদ্রোহীদের নিজ নিজ মাটিতে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাসের বাতাবরণ আরও পোক্ত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের মাটি থেকে আল কায়দা ও ISI-এর ভারতবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তোলে। ২০০২ সালে এই বিষয়ে দুই দেশের সম্পর্ক এতটাই চরম তিক্ততায় পৌঁছেছিল যে, ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী একই ভাষায় ওই অভিযোগ উত্থাপিত করেছিলেন। বাংলাদেশ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলেও পরের বছর প্রধানমন্ত্রী একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রকাশ্যে বলেন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানি ISI-এর গোয়েন্দা ও আল কায়দার সদস্যদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশও ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানের অভিযোগ তোলে।

২০১১ সালে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তার *How to Wipe out Islamic Terror* শীর্ষক লেখায় ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার উপায় হিসেবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড দখল করার প্রস্তাব দিয়ে বিতর্কিত হয়েছিলেন। ২০১৪ সালের ১৯ এপ্রিল আসামের গুয়াহাটিতে আবার একই ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবি করে স্বামী বলেন, ''বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াণশ মানুষ ভারতে থাকে। যদি বাংলাদেশ তার লোকজনকে ফেরত না নিতে চায়, তবে ভূখণ্ড দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।'' ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাদেশ ও অবৈধ অভিবাসী ইস্যুটিকে বার বার ব্যবহার করেছে। দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি এক ভাষণে ১৬ মে সকল অভিবাসীকে বাণলদেশে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে বলেন।

দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অবৈধ অভিবাসীদের প্রশ্নটিকে রুটিনমাফিক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো সমাধান বের করা যায়নি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের বিদ্রোহীদের সহায়তা করার অভিযোগ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ২০০৯ সাল আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় এসে আলফার নেতাদের ভারতের হাতে সমর্পণ করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় শাসকদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারিতে দিল্লি সফরের আগে এই হস্তান্তর পর্ব সম্পন্ন হওয়ায় ভারত সরকারের জন্য তা স্বস্তিদায়ক ছিল। হাসিনার সফরকে সফল করতে ও ভারতে বাংলাদেশ নিয়ে আস্থা তৈরির উপায় হিসেবে একে দেখা হয়েছিল। সফরকালীন যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার একটি সন্ত্রাসবাদ ও অন্যগুলি ছিল সংগঠিত অপরাধ দমন ও অবৈধ মাদক দ্রব্য চালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত।

১৯৭৭ সালে ভারতে জনতা পার্টির নেতৃত্বে জোট সরকার ক্ষমতায় আসায় দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক খানিকটা ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। দু-পক্ষই বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিশেষ করে গঙ্গা নদীর জলের ভাগের বিষয়টির সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। এই সময় ভারত কাদের সিদ্দিকিকে সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়, যা দুই দেশের মধ্যে আস্থাজ্ঞাপক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বাংলাদেশও সার্ক-এর প্রস্তাবটি সামনে রেখে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করা, বিশেষ করে ভারতকে লক্ষ্য করে সহযোগিতার এক কাঠামো সূচনার চেষ্টা করেছিল। তবে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক যেকোনো আলোচনায় শক্ত অবস্থান নেয়নি তাদের মিত্র আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত। আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর

দুটি বড়ো ইস্যু— এক. গঙ্গা নদীর জলবণ্টন চুক্তি (১৯৯৬) এবং দুই. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (১৯৯৭) বিরোধ-বিসংসবাদের ঊর্ধ্বে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত অভিবাসী ইস্যুটি ভারত সরকার আর উত্থাপন করেনি। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এটি আবার বিরোধ হিসেবে দেখা হয়। পুশব্যাক-পুশ ইন করার মধ্যে দিয়ে দুই দেশের সমীান্ত এলাকায় উত্তেজনা তখন চরমে উঠেছিল। মাঝে মাঝে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্রের নিশানা করে কূটনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছিল। এছাড়া বিএসএফ-এর হাতে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশিদের হত্যাকাণ্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়, যা আজও বহাল আছে। ভারতের পক্ষ থেকে হত্যকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের গোরুচালানকারী, শিশুপাচারকারী ও মাদকপাচারকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

২০১৩ সালে Border Guard Bangladesh (BGB)-র সাংবাদিক সম্মেলনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত ১৪ জন, ২০১২ সালে ৩৪ জন, ২০১১ সালে ৩৯ জন, ২০১০ সালে ৬০ জন এবং ২০০৯ সালে ৬৭ জন নিরীহ বাংলাদেশি নাগরিক সীমান্তে নিহত হয়েছেন। সীমান্ত হত্যাকাণ্ড বিষয়টি মানবিকতার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যখন ২০১১ সালে কুড়িগ্রাম সীমান্তে ফেলানি নামের এক কিশোরীকে কাঁটাতারের উপর গুলি করে মারা হয় এবং লাশটি কয়েক ঘণ্টা ধরে বেড়ার উপর ঝুলে ছিল।

২০১০ সালে শেখ হাসিনার সফরের পর মনমোহন সিং ফিরতি সফরে যান। তখন তিস্তাচুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় এবং ১৯৭৪ সালের সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো সময়সীমা টানতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের প্রত্যাশা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শেষ মুহূর্তে তিস্তা চুক্তির খসড়ায় রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে না বলে সফর থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। এই পর্যায়ে শেখ হাসিনা সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে তার হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন।

২০১২ সালের জানুয়ারিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমন্ত্রিত হয়ে শেখ হাসিনা তার আগরতলা সফরের সময় সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের কাছে জানিয়েছিলেন, ''আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় বলে আমরা জানি দুই দেশের জন্য শক্তিশালী সহযোগিতা প্রয়োজন এবং অর্থপূর্ণ সহযোগিতা তখনই সম্ভব, যখন রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। বড়ো রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে তার প্রতিবেশীদের ব্যাপারে অধিক নমনীয় হতে হবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথে যেসব বিষয়গুলি বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল প্রচলিত মাইন্ডসেট বা চিন্তাকাঠামো। ভারতের জন্য বাংলাদেশ ট্রানজিট ও বিদ্যুৎ করিডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্য যা প্রয়োজনীয়, তা রূপায়ণে ভারতীয় শাসকদের অনীহা থেকেই এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারি সিদ্ধান্ত রূপায়ণে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ভারতে থাকা সত্ত্বেও তার শ্লথগতি ও কোনো কোনো সময়ে নেতিবাচক মনোভাব সম্পর্কের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে দাঁড়ায়। ইতিবাচক মনোভাবের অনুপস্থিতি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাবের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে এণ ভারতবিরোধী শক্তিগুলিকে সুযোগ দেয়

তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে। এই সকল অমীমাণসিত বিষয়ই ভারতীয় শাসক ও বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান কারণ, যা নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর রূপ দিয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে Security Studies ও Strategic Studies সম্পর্কিত আলোচনা বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত নবীন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই এই সম্পর্কিত চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টির পর্যালোচনা ও গবেষণার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু ১৯৭৮ সালে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত এই সম্পর্কিত চর্চা সীমায়িত ছিল। কিন্তু বর্তমানে একাধিক সরকারি ও সেরকারি সংস্থা এই বিষয়ের চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অভিমুখ থেকে দেখার ফলে এই সম্পর্কিত আলোচনার পরিসরও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি।

যে সকল মূলগত তাত্ত্বিক প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা যায়, তা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হল—

১. **নিরাপত্তা কাদের জন্য**— জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় বরাবরই নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে থেকেছে রাষ্ট্র। ঐতিহ্যবাহী ওয়েস্টফেলীয় ধারণায় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নটিকে নিরাপত্তার এক ও একমাত্র বিষয় হিসেবে ধরা হয়। এই ধারণা অনুসারে, ব্যক্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত হলে।

২. **নিরাপদ সংক্রান্ত মূল্যবোধের প্রশ্ন**— জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নটি ঐতিহ্যবাহী যে ধারণাসমূহের ভিত্তিতে এতকাল গড়ে উঠেছে, তা হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং কূটনৈতিক স্তরের স্বশাসন। আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রশ্নটি ঘুরপাক খেয়েছে মূলত এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্তের বিশুদ্ধতা রক্ষাকে কেন্দ্র করে।

৩. **কার থেকে নিরাপত্তা**— ঐতিহ্যশালী ধারণার ভিত্তিতে জাতীয় নিরাপত্তার বিপদ হিসেবে বহিঃশক্তির হুমকি ও আক্রমণকেই মূলত দেখা হয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে যেভাবে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া ও আফগানিস্তান আক্রান্ত হয়েছে, পশ্চিমি বিশ্ব জোটের দ্বারা, তাতে এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মতন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অর্থনৈতিক শক্তির বিচারে যার আয়তন প্রতিবেশী ভারতের থেকে অনেক পিছনের সারিতে, তার আক্রান্ত হবার চিন্তা তাই অমূলক নয়।

৪. **নিরাপত্তা ও হুমকির প্রশ্ন**— সামরিক আক্রমণ ও পরিকল্পিত বলপ্রয়োগ যেকোনো রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিকোণ অনুসারে সামরিক শক্তির বিকাশ রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৫. **কার দ্বারা নিরাপত্তা—** ওয়েস্টফেলীয় মডেল অনুসারে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদানের একমাত্র বিধেয়ক হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই সুরক্ষা দেবার অধিকারী। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার তাৎপর্য হল রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা। যদিও বর্তমান ধারণা অনুসারে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ, অণশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত স্তরে জনগণের অণশগ্রহণ যত সুনিশ্চিত হবে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ভার হবে তত বেশি।

৬. **কোন পদ্ধতিতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে—** ঐতিহ্যবাহী ধারণা নিরাপত্তার বিষয়টিকে সমরশক্তির সঙ্গে যেহেতু এক করে দেখে, এই ধারণাকে গ্রহণ করলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক লড়াই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, একটি ক্ষুদ্রশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

কম সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিজ নিজ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পেশাদারি সমরকুশলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কুশলী প্রশাসক ও উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে শিখতে হবে কীভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে কাজ করা যায় ও নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়। কূটনৈতিক স্তরে সমস্যা মোকাবিলার অনেক বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পরস্পরের পরিপূরক। একদিকে কূটনীতির আঙিনায় সেই সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে এসে ফেলা, যা হুমকির পরিবেশ তৈরি করতে পারে ও নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারে। আর অন্যদিকে বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হবে আলোচনার মধ্য দিয়ে এর সমাধান।

দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ ১,৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড, যাকে ভারতরাষ্ট্র ঘিরে আছে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে, যার সীমারেখা হল ৪,০৯৫ কিলোমিটার। দক্ষিণে বাংলাদেশের সীমানা শেষ হয় ভারত মহাসাগরে, যে এলাকা জুড়ে রয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিশালী উপস্থিতি। এইজন্য অনেকে বাংলাদেশের অবস্থানকে India-lock বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। এই ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা শুধু নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত রণনীতির ক্ষেত্রেও ভারতরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিবেশী। সার্ক জনসংখ্যাভুক্ত দেশের সামগ্রিক ভূখণ্ডের ৭২ শতাংশ এবং জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ ভারতের অধিকারভুক্ত। ওই একই হিসেবে প্রায় ৮১ শতাংশ অরণ্য এবং ৭৯ শতাংশ সেচ জমি ভারত নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রেও এই চিত্র অনুরূপ। সার্কভুক্ত সমস্ত দেশের সামগ্রিক GNP ভারতের GNP-এর সমান। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনী ভারতের নিয়ন্ত্রণে। অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই প্রতিবেশী দেশ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা এবং এই সবকিছুকেই যদি হিসাবে রাখা হয়, তবে নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক স্তরে ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের শক্তি ও ক্ষমতা সহজেই অনুমেয়।

জাতিসত্তাগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সমস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্র। জনসংখ্যার ৯৯.৫ শতাংশ বাঙালি। যদিও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই ওই রাষ্ট্র বার বার তার সংখ্যালঘু সমাজকে মূল ধারার সঙ্গে সমন্বিত করা প্রয়াস করেও ব্যর্থ হয়েছে। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠী। যারা মূলত চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকাতে বসবাস করে থাকেন এবং যে এলাকার আয়তন বাংলাদেশের সামগ্রিক আয়তনের ৯ শতাংশ। উপরের বাস্তবতাকে যদি বিচার করা হয়, তবে ভারতের মতন কোনো দেশই বাংলাদেশের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক ঐতিহাসিক কাল ধরে চলে আসা দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক তাকে বিবেচনায় রেখে এর গুরুত্বকে পর্যালোচনা করতে হবে। একই ভাষা জাতিগত উৎস ছাড়াও দুই দেশের মানুষের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বহুল সাদৃশ্য রয়েছে এবং একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে দুই দেশের মানুষ যে দীর্ঘকাল বসবাস করেছে, সেই সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য এক অনন্য সম্পদ। নিরাপত্তা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বগুলির সমাধানে ব্রতী দুই দেশের রাজপ্রধানরা এই সাধারণ ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের যে ভারতীয় আকাঙ্খা, তার শিকড় অনেক গভীরে। এই ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে যেমন এক কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তেমনি এক কেন্দ্রীভূত ঔপনিবেশিক কাঠামো এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় শাসকরা এই চিন্তা থেকে একেবারেই মুক্ত নন এবং আঞ্চলিক স্তরে ভারত যাতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তার জন্য বেশ কিছু শক্তিশালী লবি দিল্লিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল। বর্তমান শাসক ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার নেতৃত্বের বক্তব্যে বহু সময়ই এই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে অঙ্গীভূত করে একটি অখণ্ড হিন্দুস্থান গড়ে তোলা তাদের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক লক্ষ্য। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিন্যাস যদি এই চিন্তা কাঠামোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তবে কখনোই সম মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে চৈনিক অনুপ্রবেশ ক্রমবর্ধমান। ভারতের সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে ঢালাও ঋণ ও অনুদান দিয়ে সড়ক, বন্দর, পরিবহন ও পরিকাঠামো খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও বিগ ব্রাদার সুলভ আচরণের বিপরীতে চীনের লক্ষ্য হল এক নির্ভরযোগ্য কৌশলগত মিত্র হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করা ও নিজের প্রভাব বলয়ের বৃদ্ধি ঘটানো। বাংলাদেশ সহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সামনে এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দক্ষিণ-এশিয়ার এই দ্বিমেরু রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্য দর কষাকষির মধ্যে দিয়ে নিজস্ব ভূমিকার বৃদ্ধি ঘটানোর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতা কী চেহারা নেবে তা নিঃসন্দেহে দেখার। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব আঞ্চলিক শক্তিজোটের মধ্যে দিয়ে ভূ-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও ভারসাম্য বজায় রাখার প্রকরণ সমূহ।

পঞ্চম অধ্যায়

আঞ্চলিক জোট— সার্ক-বিমসেক ও দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক রণনীতি

(Regional Alliances— SAACR, BIMSTEC and the Geo-Political Strategy of South Asia)

ভূমিকা

বিশ্বদরবারে বৃহৎ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে যেগুলি সুপরিচিত, সেই দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণত এক দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি ও বিদেশনীতি ও কূটনীতি প্রস্তুত করে থাকে। এই ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন তখনই আসে, যখন দেশের অভ্যন্তরে ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। '৯০-এর দশকের প্রথম অর্দ্ধে ভারত রাষ্ট্র যে নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক এক সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হয়। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নেতৃত্ব অনুভব করে, আগামী দিনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ভারত রাষ্ট্রের সামগ্রিক দক্ষিণ এশিয়া নীতির পুনর্বিবেচনা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্বায়ন যে নতুনতর পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের সামনে নিয়ে আসছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রয়োজন আঞ্চলিক স্তরের বিদেশনীতির নির্মাণ। এই পর্যায় থেকে উপমহাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যেই জোরালো দাবি উপস্থিত হতে থাকে। যদিও এই দাবি সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা ছিল পূর্ববর্তী দশকগুলিতে ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অসন্তোষ। এই পর্যায় থেকে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য সেই রাষ্ট্রগুলির শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত হয়। ভারত এই পর্যায় থেকে একটি বহুমাত্রিক অবস্থান নিতে শুরু করে; এমনকী চীন, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশকেও একটি আঞ্চলিক জোটে পর্যবেক্ষক হিসেবে মেনে নিতে স্বীকৃত হয়।

ভারত বর্তমানে বেশ কিছু আঞ্চলিক ও আন্তঃমহাদেশীয় শক্তিজোটের সদস্য। ভারতের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটাও বাস্তব যে, বিশ্ব পরিস্থিতিকে হিসেবে রেখে নিজস্ব স্বার্থে তার অনুকূলে শক্তি সমাবেশ কীভাবে ঘটাতে পারে। একদিকে ভারত রাষ্ট্র বিশ্বস্তরে তার দাবিসমূহের সফলতার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে অণশগ্রহণ করছে, একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে নিজের দাবিসমূহকে সামনে রাখছে এবং যে কারণে তার প্রয়োজন পড়ছে বিভিন্ন বহুজাতিক ও অধিজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব। ভারত ও গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের এই ভূমিকা থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, একুশ শতকে বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য আগামী দিনে মূলত হতে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে। যদিও অনেকেই এই বিশ্লেষণকে অস্বীকার করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তির ভারসাম্যে যে এক বড়ো ধরনের পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে, তা অস্বীকার করার কোনো

উপায় নেই। বিগত দুই দশকে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের সর্বজনগ্রাহ্য মান্যতা ছিল, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে উঠে আসছে নব্যশক্তি হিসেবে ভারত ও চীনের ভূমিকার প্রশ্ন।

যদিও অন্যান্য বৃহৎ শক্তির মতো আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ও সদিচ্ছা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু তবুও আন্তর্জাতিক স্তরে বহুমুখী বাণিজ্য ও আবহাওয়া ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইস্যুগুলিতে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু একদিকে যখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রভাব ও কর্তৃত্ব বাড়ানোর প্রয়াস ক্রমবর্ধমান সেই প্রভাবকে সংহত করার জন্য আঞ্চলিক স্তরে ভারসাম্য বজায় রাখার যে কাজ, সেক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অনেকটাই অস্থিতিশীল। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল বৃহৎ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে আঞ্চলিক শক্তিজোটকে সংহত করে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে এবং তার পর নিজেদের প্রভাব বলয়কে তারা সম্প্রসারিত করেছে। দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি ভূ-রাজনৈতিক এলাকা, যেখানে প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে সার্ক-এর মতো একটি আঞ্চলিক শক্তিজোট কার্যকরী থাকার পরেও কোনো অভিন্ন সার্ক কর্মসূচি সেভাবে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতার দায় অনেকটাই ভারতের উপর বর্তায় এবং যেখানে ভারত দক্ষিণ এশিয়াবাদ দিয়ে অপরাপর এলাকাতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কে লিপ্ত, সেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি অভিন্ন স্বার্থের স্বপক্ষে শক্তি সমাবেশ ছাড়া আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

৫.১ আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক জোট

আঞ্চলিক জোট সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আঞ্চলিকতা সম্পর্কে বোধের জায়গাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। ইতিহাস হোক বা রাজনীতি বা সমাজতত্ত্ব, 'অঞ্চল' (region) বিষয়ক চর্চা ভিন্ন ভিন্ন স্তরেই হয়ে থাকে। যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকরা 'অঞ্চল' সম্পর্কিত ধারণাটিকে একটি সামাজিক নির্মাণ বলে ধারণা করে থাকেন। Hettue যেমন বলেছিলেন, "All regions are socially constructed and hence politically contested." যেহেতু অঞ্চল বা আঞ্চলিকতা একটি সামাজিক নির্মাণ, তাই রাজনৈতিক শক্তিবর্গ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কীভাবে ক্রিয়াশীল, তার সাপেক্ষে আমরা আঞ্চলিকতাকে বুঝতে সক্ষম হই। অনেকেই মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রযুক্তির বিবর্তন যেভাবে ঘটে চলেছে, তাতে 'অঞ্চল' সংক্রান্ত ধারণায় আরও পরিবর্তন আসবে এবং হয়তো আগামী পৃথিবীতে আমরা এমন অনেক virtual region-কে দেখতে পাব, যেখানে অভিন্ন স্বার্থ ও বিশ্বাসের অণশীদার মানুষজন, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে তার বাস হোক না কেন, তারা প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করে নিজস্ব 'অঞ্চল' গঠন করবেন। ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া কোনো সমসত্ত্ব এলাকা নয়, অর্থাৎ কোথায় এর শুরু আর কোথায় এর শেষ, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যে কারণেই অনেকেই বর্তমানে ভৌগোলিক সীমারেখার পবিরর্তে রাজনৈতিক ও আদর্শগত বন্ধনকে আঞ্চলিকতার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলে মনে করেন। দক্ষিণ এশিয়া গড়ে উঠেছে তার সদস্য রাষ্ট্রের, বহু ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক ও

রণনৈতিক এই বিভিন্নতার প্রভাব তিন দশক পরেও সার্ক সংগঠনে ক্রিয়াশীল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই দক্ষিণ এশিয়াকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করা অনেকটাই অলণকারিক। সার্কের উপস্থিতি একটি অঞ্চল হিসেবে একে স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রগুলির অসমসত্ত্বতা বহুক্ষেত্রে একে নাকচ করে।

কোপেনহেগেন স্কুলের 'Regional Security Complex Theory' (RSCT) অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক জটিলতার ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানই নির্ধারক। সময়ের যাত্রাপথে এই ধারণা যে খুব বেশি বদল হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভারতীয় স্বার্থ অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় তার পরিধি বেড়েছে। Asian Super Power হিসেবে বিকশিত হওয়ার যে আকাঙ্খা ভারতীয় শাসকগণ লালন করেন, তার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতা সম্পর্কিত ভারতীয় ধারণা মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দ্বিমেরু রাজনীতির দ্বারা। যদিও সে সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় ভারতীয় কূটনৈতিকদের বিশ্লেষণে আঞ্চলিকতা সম্পর্কিত বক্তব্য অত নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না, যদিও ভারতীয় নেতৃত্ব গোটা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে নিজস্ব প্রভাব বলয় বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৪০ ও '৫০-এর দশকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও অণশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশ কিছু রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৪৭ সালে নয়াদিল্লিতে Asian Relations Conference, ১৯৫৪ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত Colombo Conference এবং ১৯৫৫ সালে বান্দুণ (Bandung)-এ অনুষ্ঠিত Asian-African Conference। এই পর্যায়ে আঞ্চলিকতা সম্পর্কিত ভারতীয় ধারণা যে ভাবনার দ্বারা মূলত পুষ্ট হয়েছে, তা হল এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নেওয়া। যদিও এই পর্যায়ে কোনো আঞ্চলিক শক্তি জোটের উদ্ভব হয়নি, কারণ এশিয়া স্তরে আঞ্চলিকতা নিয়ে ভারতীয় ধারণা ছিল মূলত রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্তরে। কোনো ধরনের অর্থনীতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের আকাঙ্খা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল না। Muni লিখেছেন, ''At times inadvertently displayed a tendency to take the smaller neighbours for granted ... Nehru seldom thought in terms of assiduously building a community with the smaller immediate neighbuors. If at all, be thought that such a community would be encompassed within the broader goal of Asian solidarity.''

নেহরুর আঞ্চলিকতা সম্পর্কিত ধারণার ভিত্তি ছিল এটাই যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের ভূমিকা যত শক্তিশালী উঠলে ভারতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে এশীয় আঞ্চলিকতা। ফলত নেহরু যখন South Asia Federation গঠনের ডাক দেন, তখন তার দক্ষিণ এশিয়ার ধারণার মধ্যে ছিল আফগানিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক সহ সবচেয়ে দূরবর্তী দেশটিও। যদিও সেই পর্যায়ে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। যদিও '৭০-এর দশকের শেষ থেকে এই প্রশ্নের চিন্তা ঘনীভূত হতে শুরু করে। একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তিজোট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় শাসকবর্গের প্রাথমিক সংশয় ছিল মূলত দুটি কারণে— প্রথমত, ভারত

রাষ্ট্র মনে করত, আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠলে নিকটবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে আলাদা আলাদা ভাবে দ্বিপাক্ষিক স্তরে সংকট নিরসনের যে সুযোগ ও সম্ভাবনা তার সামনে এতদিন খোলা ছিল, তা দূরীভূত হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের আশঙ্কা ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতার ভিত্তিতে নেওয়া আঞ্চলিক জোটের যেকোনো সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে তার বিদেশনীতিতে প্রভাব ফেলবে। কিন্তু যখন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে সার্ক গঠনের দাবি জোরালোভাবে সামনে আসতে থাকে, ভারত তার সংশয় নিয়ে এই শক্তিজোটে প্রবেশ করে। দ্বিপাক্ষিক স্তরে এতদিন ধরে চলে আসা রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আলোচনার পথকে খোলা রেখে। যদিও সার্কের জন্ম দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন স্তরের আঞ্চলিকতার জন্ম দেয়। সাতটি রাষ্ট্রকে নিয়ে গড়ে ওঠা এই জোটই ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আঞ্চলিক শক্তিজোট। পরবর্তীকালে ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে মার্কিন-ভারত-চীন ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বেশ কিছু শক্তিজোট ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠলেও সার্ক-ই ছিল প্রথম।

নিকটবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যদিও ভারতের এক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বার বার প্রশ্নচিহ্ন হিসেবে হাজির হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক। সার্ককে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব স্বার্থও রয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্র সার্ক সম্পর্কে খুব গভীরভাবে আস্থাশীল। বরণ তার থেকে বড়ো বিষয় যে, সার্কের অস্তিত্ব না থাকলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে ভারতের নীতি আরও বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এবং ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ধাক্কার মুখে পড়বে। আই.কে. গুজরাল প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় যে Gujral Doctrine তৈরি হয়, তাতে সার্ক সম্পর্কে ভারতের এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অতীতে ভারত যে সার্কের ক্ষেত্রে অতিসক্রিয়তা গ্রহণ করেনি, তার আরও একটি কারণ ছিল। নেতৃত্ব মনে করত যে, সার্কের বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লাভ বা অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু '৯০-এর দশকের প্রথম থেকে আঞ্চলিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে যে বিষয়টি এসে হাজির হয়, তা হল যৌথ সমৃদ্ধি। এই সময় থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বক্তব্যে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে আঞ্চলিক স্তরে সংহতির ক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে।

আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে এই যৌথ বোঝাপড়ার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়, যখন ১৯৯৭ সালে সার্ক সদস্যভুক্ত চারটি দেশ বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল ও ভারত মিলিত হয়ে South Asia Growth Quadrangle (SAGQ) তৈরি করে। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট Project ভিত্তিক কাজকে ত্বরান্বিত করা। ২০০০ সালে গড়ে ওঠে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC)। Asian Development Bank-এর সহযোগিতা নিয়ে এই সংগঠন যে যে ক্ষেত্রগুলিতে মূলত মনোনিবেশ করে, সেগুলি হল পরিবহন, বিদ্যুৎ শক্তি, পর্যটন, পরিবেশ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র। এই পর্যায়ে ভারত সার্ক বহির্ভূত অন্যান্য আঞ্চলিক জোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যে বছর SAGQ প্রতিষ্ঠা হয়, সেই একই বছরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার বেশ কিছু সদস্য রাষ্ট্র, যথা বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation বা BIMSTEC তৈরি করে। বঙ্গোপসাগরকে নিশানায় রেখে BIMSTEC-এর অন্যতম কাজের পরিধি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্যচাষ, পরিবহন, তথ্যপ্রযুক্তি ও বস্ত্র শিল্পকে।

একুশ শতকের শুরুতেই ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে আরও একটি উপ-আঞ্চলিক জোটে অণশগ্রহণ করে। ২০০০ সালে ভারত, থাইল্যান্ড, লাওস, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম একত্রে Makong-Ganga Cooperation (MGC) গড়ে তোলে। ওই একই বছরে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিলিত হয়ে Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-AIRC) তৈরি করে, যার অন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলি ছিল ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইয়েমেন, তানজানিয়া, মাদাগাসকার, মোজাম্বিক। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, ভারত এই পর্যায়ে '৯০-এর দশক থেকেই একের পর এক আঞ্চলিক জোটে অণশগ্রহণ করতে শুরুকরে, যার লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। Muni-র মতে, ''The Indian policy makers came to accept with various degrees of candour that India has a greater responsibility to work for the evolution of constructive and cooperative neighbourhood relationshuips, not only because it is big, but also because it is more resourceful. Furthermore, India would, perhaps, recap greater advantages in its overal foreign policy initiatives, if it enjoy a greater support and understanding of its neighbours and its efforts and attention is not unduly trapped within the South Asian region."

'৯০-এর দশকের প্রারম্ভে যে ভারতের দিক থেকে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক জোটে অণশগ্রহণের উদ্যোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মূলত দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, যে অর্থনৈতিক সংস্কার এই পর্যায় জুড়ে শুরু হয়, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতীয় আয় ও আর্থিক বৃদ্ধির তা একটি বড়ো কারণ ছিল। আঞ্চলিক স্তরে স্থিতিশীল ছাড়া এই উন্নয়নের শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারত। দ্বিতীয়ত, রণনৈতিক কারণটি অবশ্যই চীন প্রশ্নে। যেহেতু দক্ষিণ এশিয়া ও তার বাইরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তার প্রভাবকে সম্প্রসারিত করে, তাই নিজস্ব প্রভাব পরিধি থেকে সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে হারানোর ভয় ভারতকে আরও বেশি বাধ্য করে আঞ্চলিক সমীকরণকে মেনে নিতে।

Gujral Doctrine প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে এক উদারমনোভাবাপন্ন ভারতকে হাজির করেছিল। কয়েক দশক বাদে Manmohan Doctrine অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে ভারতের দায়বদ্ধতা যেহেতু একই আর্থিক নীতিতে সকলেই বাধা পড়ে আছে, ফলত লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল— প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা যেন ভারতের শ্রীবৃদ্ধিকে ব্যাহত না করে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৭ সালে ভারত ঘোষণা করে যে, সার্কের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে বাকি সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে ভারত নিজের বাজার মুক্ত করার পক্ষে। একইসঙ্গে BIMSTEC-এর মতো সংগঠনে সদস্যপদ লাভের প্রশ্নটিকে আরও শিথিল করা হয়।

ভারতের এই উদ্যোগে এবং ২০১১ সালে তৃতীয় BIMSTEC সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। নিজস্ব প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ওই পর্যায়ে যোগাযোগের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য ভারত রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সীমান্ত বাণিজ্যের পরিধি আরও বেশি প্রসারিত করে। প্রতিযোগী রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন যখন ঋণ ও অনুদানের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে ভারতের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একধরনের কৌশলগত অণশীদারিত্ব তৈরি করছে, তখন বাণিজ্য ও উন্নয়নের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে সার্ক ও সার্ক-বহির্ভূত উদ্যোগগুলির মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার ভারতীয় উদ্যম যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

'৯০-এর দশকে আঞ্চলিকতাবাদ সম্পর্কে যে নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটল, তার কারণ হিসেবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল যৌথ নিরাপত্তার প্রশ্নটি। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে যা ক্রমশই গুরুত্ব পেতে থাকে এবং ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরবর্তী পর্যায় থেকে যা এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে। এই পর্যায় থেকে ভারত ধীরে ধীরে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময় ভারত ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর যে যৌথ সামরিক অভিযান হয় মালাবার উপকূলে, তাতে আরও কিছু দেশ অণশগ্রহণ করে। এই মহড়াকে কেন্দ্র করে চীন অবশ্য অতি দ্রুত তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী ১৯৯৫ সালে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর-এর নৌ-সেনার সঙ্গে যৌথ নৌ-মহড়া সংগঠিত করে ভারত মহাসাগরে নিজস্ব প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে। এই পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে ২০০৮ সালে Indian Ocean Naval Symposium (IONS) গড়ে তোলে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এই সংগঠনে যুক্ত হতে সম্মত হয়। প্রায় ৩৬টি দেশ ভারতীয় নৌশক্তির অধীনে সমসাময়িক সমস্যাগুলির সম্পর্কে আলোচনা করতে সম্মত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবী জুড়ে শক্তির ভারসাম্য যে অবস্থায় ছিল, তাতে দক্ষিণ এশিয়ার স্বঘোষিত নেতা হতে চাওয়া ভারতের ভূমিকার মধ্যে শুধু মহৎ আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ছিল না, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও থেকেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে যে সাফল্য-ব্যর্থতা, তার অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপের মাধ্যমে ভারতীয় বিদেশনীতি অনেক বেশি পোক্ত ও বিচক্ষণ হয়েছে। Gujral Doctrine আঞ্চলিকতার যে নতুন ধারার সূচনা করেছিল, দলমতনির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই Doctrine-এর মূল বক্তব্য ছিল সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের পরিবর্তে আন্তঃসরকারি সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, আঘাত এলে প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে অভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ ও সহযোগিতামূলক বাতাবরণ তৈরির মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্ব সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া। ১৯৯৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে National Democratic Alliance (NDA) ক্ষমতায় এসে এই Gujral Doctrine-কে অনুসরণ করে এবং Track 2 Diplomacy-কে সমাধানের অন্যতম পথ হিসেবে বেছে নেয়। ১৯৯৮ সালে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণের পর যে সংকট তৈরি হয়েছিল এবং কার্গিল যুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ায় যে অস্থিতিশীলতার জন্ম দিয়েছিল, তার সমাধানের ক্ষেত্রেও ভারতীয়

বিদেশনীতি এই ধারাবাহিকতায় থাকে। ২০০৪ সালে প্রথম ইউপিএ সরকার কণগ্রেসের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসার পর পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী নির্দেশিত বিদেশনীতি ও শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান। ২০০৪ সালে South Asia Free Trade Agreement ভারতের উদ্যোগে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০০৬ সালে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার জন্য যে Joint Machanism for Counter Terrorism গড়ে তোলা হয়, তার ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আরও অভিন্ন বোঝাপড়ায় আসে। এই পর্যায়ে বিদেশ সচিব শিবশঙ্কর মেনন ভারতীয় বিদেশনীতির তিনটি লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা যেভাবে করেছিলেন, তা হল— প্রথমত, ভারত রাষ্ট্রের চারপাশে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে গড়ে ওঠে, তা সুনিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রশক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা এবং তৃতীয়ত, যে সকল বিষয় আগামী দিনে ইস্যু, যেমন খাদ্য নিরাপত্তা, জল, শক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়, সেগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা। পরবর্তী দশকগুলিতে সাফল্য-ব্যর্থতা সত্ত্বেও এর ধারাবাহিকতা থেকেছে, যার ফলে ভারত যেমন বিশ্বরাজনীতিতে তার নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে, তেমনই দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক শক্তি ও নেতৃত্ব হিসেবে তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে আরও।

আঞ্চলিক জোট হিসেবে সার্কের সীমাবদ্ধতা যত বেশি প্রকট হতে থাকে, দক্ষিণ এশিয়ার অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে সার্ককে টিকিয়ে রেখে ভারতের দিক থেকে অন্যান্য উপ-আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ও প্রবণতা তত শক্তিশালী হয়। এটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যৌথ বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হিসেবে BIMSTEC গঠনকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ৭ সদস্য রাষ্ট্রসহ BIMSTEC নয়াদিল্লির কূটনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে অনেকটাই অঙ্গীভূত। ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৩টি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল BIMSTEC-এর অধীন। একটি নেপাল ও ভূটান সংক্রান্ত হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা, দ্বিতীয়টি শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ সংক্রান্ত বঙ্গোপসাগর এলাকা এবং মায়ানমার ও থাইল্যান্ড সহ মেকণ তটভূমি। BIMSTEC-ই হল সেই সম্মেলন, যা ভারতের দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্বভাগকে সংযুক্ত করে। একাধারে সংশয় ও আশঙ্কার জায়গাও থেকে যায়। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রাষ্ট্র চীন ও পাকিস্তান BIMSTEC-এর সদস্য নয়। BIMSTEC-এর মধ্যে দিয়ে ভারত আরও অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী আঞ্চলিক জোটে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড ASEAN-এর সদস্য এবং Greater Mekong Sub-region-এর সদস্যভুক্ত। যেমন বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটান সার্ক ও 3 BBIN-এর সদস্য। এছাড়া বাংলাদেশ ও মায়ানমার BCIM (Bangladesh, China, India, Myanmar)-এর সদস্য যেখানে ভারত ও চীন যৌথভাবে রয়েছে। BIMSTEC-এর মধ্যে দিয়ে তাই সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত মহাসাগরীয় এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় প্রভাব বিস্তার সম্ভব।

আঞ্চলিক জোট হিসেবে BIMSTEC-এর গুরুত্ব এতটাই যে, ২০১৬ সালে BRICS-এর সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার উদ্যোগ নেয় BIMSTEC নেতৃত্বকে আহ্বান জানানোর। যেহেতু সার্কের মধ্যে

পাকিস্তানও সদস্য, তাই সার্ককে বাদ দিয়ে এই কর্মসূচি ছিল পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস মাত্র। বর্তমান পরিস্থিতিতে অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ২০১৪ সালে মোদি মন্ত্রীসভার শপথের সময় সার্কের নের্তৃত্বকে যে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তার থেকে পরিস্থিতির অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। BRICS-এর সম্মেলনে BIMSTEC-এর নেতৃত্বের আসা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে ভারতের গৌরবজনক ভূমিকাকে তুলে ধরে।

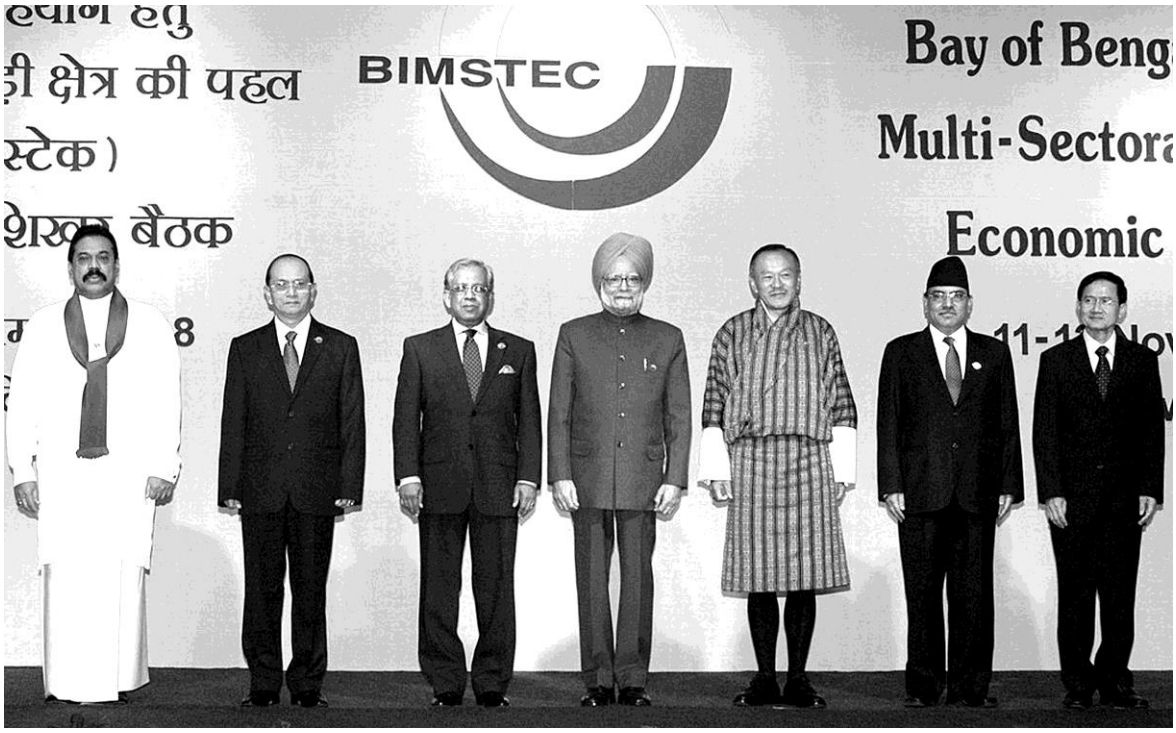

বিমসটেক সম্মেলন, নয়া দিল্লি

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। যদিও এই রণনৈতিক এলাকায় ভারতের চিন্তার অন্যতম কারণ হল ক্রমবর্ধমান চৈনিক উপস্থিতি। কেননা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল সহ ভারতের প্রতিবেশী ও ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক জোটে অংশীদার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তার Track 2 Diplomacy চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে পশ্চিমপ্রান্তে পাকিস্তান প্রতিনিয়ত অসহযোগিতা করে চলেছে ভারতের সঙ্গে যেকোনো কূটনৈতিক জোটের অংশীদার হতে। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক কূটনীতিকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে হলে ভারতের দিক থেকে আরও বেশি সাফল্যের সঙ্গে Look East Policy-কে কার্যকরী করা দরকার। স্বাভাবিকভাবে তাই BIMSTEC-এর গুরুত্ব বাড়বে। বাংলাদেশ সহ পূর্বপ্রান্তের অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার প্রবাহ নতুন দশকগুলিতে ও নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোন খাতে বইবে তাই এখন দেখার।

‘‘What look East really means is that an outward looking India, is gathering all forces of dynamism, domestic and regional, and is directly focusing on establishing synergies with a fast consolidating and progressive neighbourhood to its East in mother continent

of Asia." ভারতীয় বিদেশনীতিতে 'পূর্বে তাকাও' বা Look East Policy-র উত্থান হয়েছিল বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে। ১৯৮৯-১৯৯১ সাল পর্বে বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক ইতিহাস কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানির পুনঃঐক্য, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান। বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ভারত বাণিজ্যিক দিক দিয়ে যেমন নতুন পথের সন্ধান করেছিল, তেমনই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির নিবিড় সংযোগ স্থাপনেও সচেষ্ট হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের বিশাল চাহিদা বা বাজার ছিল। অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়। যদিও ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নতুন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার রাজনৈতিক প্রবণতার উদ্ভব হয়েছিল ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকেই। ভারত এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়ে ওঠে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর। পাশাপাশি ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রগতি ভারতের দৃষ্টি পূর্বে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। যার ফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই, ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে ভারত উদার অর্থনৈতিক বিদেশনীতি হিসেবে 'পূর্বে তাকাও নীতি' বা 'Look East Policy' গ্রহণ করেছিল। যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পূর্বের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলি অনেকটাই সফল হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংস্থা ASEAN-এর সঙ্গে ভারত যুক্ত হতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। ভারতের জাতীয় স্বার্থে এই অঞ্চলের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক উভয় গুরুত্বই রয়েছে। ভারতের পূর্বে তাকাও নীতির কৌশলগত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন যে, ''India's Look East Policy is not merely an extended economic policy; it is also a strategic shift in India's vision of the world and India's place in the evolving global economy. Most of all it is about reaching out to our civilization neighbours in South East Asia and East Asia."

ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাও সরকার আমলে যে আর্থিক সংস্কার ও উদারীকরণ প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল এবং '৯০-এর দশকের প্রথমভাগে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছিল, তাও বাধ্য করেছিল Look East Policy গ্রহণ করতে। ১৯৯১ সালে ভারতের Balance of Payment-এর অবস্থা ছিল শোচনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল মাত্র ১.২ বিলিয়ন, যা মূলত তিন সপ্তাহের আমদানির জন্য যথেষ্ট এবং দৃশ্যতই ভারত দাঁড়িয়েছিল দেউলিয়া হওয়ার মুখে। এই পর্যায়ে পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিময়ের পথ রাও সরকার খুলে দেয়। আর্থিক এই বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কূটনৈতিক দায়বদ্ধতাও ছিল। দ্রুত গতিতে চীনের বিকাশ, কম্বোডিয়ান অঞ্চল জুড়ে একের পর এক অধিজাতিক সংস্থার উত্থান ভারতকে বাধ্য করেছিল Look East Policy গ্রহণ করতে। প্রাথমিকভাবে Look East-এর ক্ষেত্রে ভারতের আশঙ্কা ছিল যতটা না সামগ্রিক এশিয়া, তার থেকে অনেক বেশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আসিয়ান (ASEAN)। এর কারণও ছিল। আঞ্চলিক জোট হিসেবে পশ্চিম ইউরোপ সহ বাকি বিশ্বের কাছে একমাত্র ASEAN-এরই কদর ছিল।

যদিও ১৯৯০-এর দশকে চীনের উত্থান ছিল একটি সম্ভাবনা মাত্র, কিন্তু তবুও ভারত বরাবরই তার নিরাপত্তার পক্ষে চীনকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় বলে মনে করত। এই পর্যায়ে একাধিক কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন যেভাবে সুকৌশলে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, সেই অভিজ্ঞতা ভারতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের কোনো সীমান্ত সমস্যা বা জমিসংক্রান্ত কোনো বিবাদও ছিল না। এই সময় ছিল এমন একটি সময়, যখন ASEAN গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিও তাদের নিরাপত্তার পক্ষে ভারতকে কোনো চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেনি। সিঙ্গাপুরের মতো কোনো কোনো সদস্য রাষ্ট্র বরং মনে করত যে, ASEAN-এ ভারতের প্রবেশ চীনের রণনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী হাতিয়ার হতে পারে। যদিও সামরিক শক্তিতে চৈনিক প্রভাব ও ভারতীয় বাস্তবতার মধ্যে বহু পার্থক্য এবং ICBM হোক বা অন্যান্য দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র হোক বা স্থলযুদ্ধ— চীনা বাহিনীর যে দক্ষতা তা প্রশ্নাতীত; ফলত প্রথম থেকেই ভারতের বিদেশনীতি প্রণেতাদের লক্ষ্যই ছিল একটি ভারসাম্যের ভূমিকা নেওয়া এবং আর্থিক হোক বা সামরিক— যেকোনো ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে সরাসরি আক্রমণাত্মক অবস্থানে না যাওয়া। স্পষ্টতই ভারতীয় নেতৃত্ব এশিয়ার বুকে NATO-র মতো একটি সামরিক জোট গড়ে তোলার প্রথম থেকেই বিরোধী ছিল, কারণ এই ধরনের জোট গড়ে উঠলে তা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের ঘোষিত জোটনিরপেক্ষ অবস্থানকে খণ্ডিত করত ও তার ভাবমূর্তির সামনে একটা বড়ো সমস্যা হিসেবে হাজির হত।

বহু গবেষক মনে করেন যে, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর ভারতের নিরাপত্তার ধারণায় পরিবর্তন এসেছিল। যেমন, লিলি (Lili) মনে করেন যে, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পরই হঠাৎ করে এই পরিবর্তন আসেনি, এসেছিল পর্যায়ক্রমে। এক্ষেত্রে তিনি দুটি পর্যায়ের কথা বলেন। প্রথমটি হল ১৯৯০ দশকের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯০ দশকের শেষের দিক। G.V.C. Naidu বলেন, ঠান্ডা লড়াই পর্বে আসিয়ান ও ভারতের মধ্যে বৃহৎ শক্তি জোট নিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর সেই পার্থক্য দূর হয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর ভারত ও আসিয়ান উভয়ের নিরাপত্তা ও উদ্বেগের অন্যতম উৎস হিসেবে চীনকে আংশিকভাবে দায়ী করা যায়। তিনি আরও বলেন, আসিয়ানের নিরাপত্তা উদ্বেগের বৃদ্ধিতে চীন-ফ্যাক্টর অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৯২ সালে ফিলিপিন্স থেকে মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়া এবং দক্ষিণ চীন সমুদ্র বিতর্কের সূচনার পর উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্যপর্বে ভারতের নিরাপত্তায় উদ্বেগের অন্যতম কারণ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব বৃদ্ধি। আসিয়ানের প্রারম্ভিক পর্বে ভারত দূরে থাকায় চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আসিয়ান-ভারত সম্পর্কের উন্নতির পর ভারতও 'Look East' নীতির মধ্যে চীন প্রভাবের সঙ্গে সমতা আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। বহু গবেষক, যেমন Ismander Rehman, A.N. Ram, K. Raja Reddy, Kripa Sridharan, C. Raja Mohan প্রমুখেরা ভারতের 'Look East' নীতির কৌশলগত দিক নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করেছেন। চীন মায়ানমার সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি সামরিক দিক দিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছে। London International Institute of Strategic Studies এ বিষয়ে

মন্তব্য করে যে, ''Burma is close to the key shipping lanes in the Indian Ocean and South-East Asia and Burma could help China extend its military reach into a region of vital importance to Asian economics.''

চীন, পাকিস্তান ও মায়ানমারের ত্রিভূজাকৃতি সম্পর্ক ভারতের নিরাপত্তায় উদ্বেগের অন্যতম কারণ। যেখানে চীন পাকিস্তান থেকে মায়ানমারে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের পাশাপাশি মায়ানমারের বন্দরে নৌ-যুদ্ধ জাহাজের প্রেরণ এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিরক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৮-এর পর থেকে চীন মায়ানমারকে ভারী ও হালকা ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান সহ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। যার ফলে মায়ানমার সেনাবাহিনীর সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১,৬০,০০০ থেকে ৩,৫০,০০০-৪,০০,০০০। বস্তুত অস্ত্র সরবরাহের পাশাপাশি চীন মায়ানমারকে বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথা বলে নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা করে আসছে। কেবলমাত্র মায়ানমার নয়, ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মণিপুর রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে চীন অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। এই সমস্ত কারণে ভারতের 'পূর্বে তাকাও' বা 'Look East' নীতিতে কৌশলগত ও নিরাপত্তা সাধন বিষয়দুটিকে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। 'Look East' নীতির মাধ্যমে ভারত মায়ানমারের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক সমঝোতা স্থাপনকে প্রাধান্য দিয়েছিল, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তৃতীয় কূটনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনে সচেষ্ট হয়।

বৃহৎ স্তরে আঞ্চলিক জোট ছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত যে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের দিকে গেছে, তা এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে। স্পষ্টত পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে ভারত বর্তমানে আরও অতি সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, শুধু সম্পর্ক মজবুত করাই না, যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অপ্রতুলতা এতদিন ধরে এক স্থায়ী সমস্যা হিসেবে ছিল, তার সমাধানেরও এক উদ্যোগ গ্রহণ্য করেছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেন তার Act East Policy-র অংশ হিসেবে। এবং অত্যন্ত দ্রুত তিনি বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে। শাসনকালের প্রথম বছরেই তিনি নেপাল ও ভূটনা ভ্রমণ করেন। অর্থাৎ ভারতকে বাদ দিয়ে যে তিনটি দেশ BBIN-এর সদস্য তার প্রত্যেকটিতেই কূটনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া হয়, আস্থা ও বিশ্বাসের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে।

এই পর্যায়ে ভারতের উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি গতি পায় তিনটি দেশের মধ্যে সড়ক স্থল পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে। ২০১৫ সালের ১৫ জুন Motor Vehicle Agreement স্বাক্ষরিত হয়— আলোচ্য চারটি দেশের মধ্যে। ভূটানের থিম্পুতে BBIN-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলির পরিবহন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আমলাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওয়াবেদুল কাদের, ভূটানের পক্ষে Lyonpo D.N. Dhungyelএবং নেপালের পক্ষ থেকে বিমলেন্দ্র নিধি। এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ ও প্রকল্পের সাফল্য ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি সে সময় বলেছিলেন, ''This historic agreement will further promote our coopeeration in trade and commerce apart from further cementing our age-old

cultural ties. The MVA is the 'over arching' framework to fulfil our commitment to enhance regional connectivity. This will need to be followed through with formulation of the required protocols and procedures in the shortest time possible to realise the ultimate objective of free movement of people and goods in the region ... Taken together, this provides enormous opportunity for integration and development of our region."

স্পষ্টতই যখন Motor Vehicle Agreement-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ রক্ষায় সামঞ্জস্যকারী পরিবহন ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং প্রত্যেকটি দেশ পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে তা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। যদিও এক্ষেত্রে দায়িত্ব মূলগতভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপরই ছিল, কিন্তু South Asia Sub-regional Economic Cooperation-এর অংশ হিসেবে Asian Development Bank সহযোগী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পরবর্তী ৫ বছরে ৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যে ৩০টি সড়ক প্রকল্প গড়ে BBIN এলাকা জুড়ে নেওয়া হয় ADB-র সহযোগিতায়। ২০১৫ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ওই একই বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটি কার্যকরী পরিকল্পনা নেওয়া হয়। অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য আমলাতান্ত্রিক যে জটিলতা, তা সমাধানের লক্ষ্যে। পরবর্তী ধাপকে বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১৫ সালর অক্টোবর মাসে একটি BBIN Motor Rally-র আয়োজন করা হয়।

২০১৪ সালে ১৮তম সার্ক সম্মেলনে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে Motor Vehicle Agreement গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে এই বিষয়ে বাকি সদস্য রাষ্ট্র একমত হলেও পাকিস্তানের বাধায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে BBIN হল এমন একটি উদ্যোগ, তার লক্ষ্য হল ত্রিস্তরীয়—

১। পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্বে ভূটান ও নেপালের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করা।

২। অঞ্চলভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মনোনিবেশ করা।

৩। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের রাস্তা মুক্ত করা।

BBIN Motor Vehicle Agreement ছিল এমন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যার ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বাণিজ্য সহজতর হবে। গড়ে উঠবে নতুন নতুন অর্থনৈতিক করিডর। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক খরচের একটি বড়ো মাত্রায় সাশ্রয় হবে। তৃতীয়ত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বঞ্চনার অভিযোগ ধারাবাহিকভাবে শোনা যায়— এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, তাতে এই অভিযোগ অনেকটাই ম্লান হবে। যদিও তিন বছরের একটি নির্দেশিকা ঠিক করা হয়েছিল এটা বাস্তবায়িত করার জন্য, কিন্তু ভারত বাদ দিলে বাকি দেশগুলির আর্থিক সংকট এই শ্লথ গতির অন্যতম কারণ। এছাড়া যে ধরনের উন্নত কারিগরি দক্ষতা, প্রযুক্তি প্রয়োজন এটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের মতো

দেশগুলিতে তার অভাব রয়েছে। যে বছর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেই ২০১৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে নেপালে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। যার ফলে ১০,০০০ মানুষ নিহত হয় এবং ৪,০০,০০০ মানুষ গৃহহীন হয়।

তৃতীয়ত, সদস্য রাষ্ট্রগুলির সীমানা বরাবর উপযুক্ত চেকপোস্ট নেই। যদিও এই Agreement অঞ্চলভিত্তিক এক সংহতির পরিবেশ তৈরি করবে, কিন্তু এটি বাস্তবায়িত হলে যে বিপুল পরিমাণ অভিবাসীদের আগমন হবে, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকলে, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কখনোই সম্ভব হবে না এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে তা বিপদজনক হয়ে উঠবে।

BBIN MVA একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন এর সফলতা মূলত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে। প্রথমত, বৃহত্তম অর্থনীতির ভাগীদার হওয়ার ফলে ভারতের মৌলিক দায়িত্ব আছে ADB-র সহযোগিতায় বাকি তিনটি দেশে পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা তা দূর করার ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়ত, BIMSTEC-এর উদ্যোগের মধ্যেই ভারতকে সক্রিয় হতে হবে BBIN প্রকল্পকে নিয়ে আসা। ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের এই বিষয়ে আলোচনা চলছে।

তৃতীয়ত, যোগাযোগ ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন, তার জন্য প্রয়োজন নিবিড় ও বিপুল বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে ADB ছাড়াও অন্যান্য Bank-এর সহযোগিতা ভারতকে নিতে হবে। AIIB বা Asian Intrastructure Investment Bank-এর সহযোগিতা এক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থত, ভারত-বাংলাদেশ-নেপালের মধ্যে বাস পরিষেবা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে চারটি দেশে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি আকাশপথে কীভাবে যুক্ত হতে পারে এবং রেলপথে যোগাযোগের কোন কোন এলাকায় Rail Freight Corridor গড়ে তোলা যেতে পারে, তা বিবেচনায় রয়েছে।

পঞ্চমত, নেপাল ও ভূটান পাহাড়বেষ্টিত রাষ্ট্র। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য ভারতের বন্দরগুলির সুবিধা এই দুটি দেশ কীভাবে গ্রহণ করতে পারে তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সঙ্গে যদিও এই বিষয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ভারত ও বাংলাদেশ কীভাবে একে অপরের বাণিজ্যিক বন্দর ব্যবহার করতে পারে, সে সম্পর্কে বোঝাপড়ায় আসা গিয়েছে।

আঞ্চলিক জোটগুলির মধ্যে একদা গুরুত্বপূর্ণ সার্ক এখন অনেকটাই অসংগঠিত। BBIN-এর মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্র মূলত উদ্যোগ গ্রহণ করছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে সড়ক-রেল-আকাশ ও সমুদ্রপথে সংযুক্ত করার। BBIN-এর অসীম সম্ভাবনার ক্ষেত্র রয়েছে। সরকারগুলির পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের নিবিড় পরিবেশ তৈরি করতে পারলে এই আঞ্চলিক জোট হয়তো আগামী দিনে Asian Tiger হিসেবে পরিচিত হবে।

৫.২ ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও কৌশলগত গুরুত্বের মূল্যায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৪ সালের নভেম্বরে ভারতের 'পূর্বে তাকাও' বা 'লুক ইস্ট' নীতি বিবর্তিত হয়েছে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতিতে। উল্লেখ্য, পূর্বের 'লুক ইস্ট' নীতির সঙ্গে বর্তমান 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির কিছুটা পার্থক্য থাকওে 'অ্যাক্ট ইস্ট' হল 'লুক ইস্ট'-এর বিবর্তিত কার্যকরী ও সক্রিয় পদক্ষেপ। বর্তমান মোদি সরকারের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম দিক হল— ভারতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত অঞ্চল ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি নীতিগত দিক দিয়ে আরও সক্রিয় হওয়া। ২০১৪ সালের নভেম্বরে মায়ানমারের রাজধানী Nay Pyi Taw-এ অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ভারত-আসিয়ান সম্মেলনের উদ্বোধনী বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন,

'... Externally, India's 'Look East Policy' has become 'Act East Policy'.'

দেশের ১৪তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি শপথ গ্রহণের পর থেকে গত দুই বছরে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে উচ্চ পর্যায়ের সফর করেছেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে কীভাবে ভারত তার জাতীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করতে পারবে এবং কীভাবে আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করা যায় তার নিরীক্ষণ। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার দু-মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার, ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুরে উচ্চপর্যায়ের সফরে গিয়েছিলেন। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতিগত সক্রিয়তা এবং কূটনৈতিক সফরে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তিনি ভারতের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কৌশলগত উদ্দেশ্যের সমতা স্থাপনে যথেষ্ট সচেষ্ট। যেখানে তিনি 'Neighbourhood First' অর্থাৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন,

''A nation's destiny is linked to its neighbourhood. That is why my government has placed the highest priority on advancing frienship and co-operation with its neighbours.''

ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির উদ্দেশ্য হল Asia-Pacific অঞ্চলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বন্ধন ও কৌশলগত সম্পর্কের উন্নতি। বস্তুত, ভারত 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির মাধ্যমে সম্প্রসারিত প্রতিবেশী— জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া সহ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম প্রমুখ রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে কৌশলগত সহযোগী পর্যায়ে উন্নীত করতে সচেষ্ট। ইতিপূর্বে ২০০০ সালে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ সম্প্রসারিত প্রতিবেশী সম্পর্কে ভারতের আগ্রহের কথা বলেন, ''North of Arabian Sea to the South China Sea.'' ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, ''Our strategic footprint covers the region bounded by Horn of Africa, West Asia, Central Asia, South-East Asia and

beyond." এই সম্প্রসারিত প্রতিবেশীর ধারণাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির দ্বারা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার তিন মাসের মধ্যে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি জাপান সফরে যান। উল্লেখ্য এটিই ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদির দক্ষিণ এশিয়া বহির্ভূত প্রথম বিদেশ সফর। ভারত 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহযোগিতাকে উন্নত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারত-আসিয়ান সহযোগিতায় 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক নির্দিষ্ট করেছে। এ প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ড. ভি.কে. সিং (রিটায়ার্ড) বলেন, ''Act East Policy has placed emphasis on India-ASEAN co-operation in our domestic agenda on infrastructure, manufacturing, trade, skills, urban renewal, smart cities, make in India and other initiatives. Connectivity project, co-operation in space, S&T and people-to-people exchange could become a springboard for regional integration and prosperity."

এছাড়াও তিনি ২০১৫ সালে গৃহীত 'The ASEAN-India Plan of Action (2016-20)'-র কথা উল্লেখ করেন, যেখানে সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা রয়েছে— Political-security, Economic এবং Socio-cultural। 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতিতে দক্ষিণ-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উভয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ সহ আন্তর্জাতিক নিয়ম ও আইন অনুযায়ী সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষায় নিবিড় সহযোগিতা স্থাপনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫.৩ রোহিঙ্গা সমস্যা

মায়ানমারের পশ্চিম প্রান্তে রাখাইন প্রদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী মায়ানমারের শাসকদের দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র রয়েছে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, দীর্ঘদিন সামরিক ও আধা সামরিক শাসনের পর ২০১৬ সালে যখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মায়ানমারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতি ঘটবে, যারা দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন নির্যাতিত ও নিপীড়িত। কিন্তু National League for Democracy (NLD)-র নেতৃত্বে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার মায়ানমারের ক্ষমতায় আসীন হলেও অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের বিরূপ করে তৎকালীন সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে অঙ্গীভূত করার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। দেশের এই নাগরিকদের তারাও বহিরাগত বলে মনে করতেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করলে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে যে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ভোগ করছেন, তাতে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

ফলত সামরিক বাহিনী ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায়। বহু মানুষ নিহত হন, গ্রামগুলিকে ছারখার করে দেওয়া হয়। আক্রমণের তীব্রতা থেকে বৃদ্ধ-নারী-শিশু কেউই বাদ যায়নি। এই

পর্যায়ে প্রায় ৭ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ দেশ ছাড়েন— সংখ্যাটা অনতিবিলম্বে হয়ে দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করলে একদিকে বাংলাদেশ-মায়ানমারে কুটনৈতিক সম্পর্কে যেমন প্রভাব পড়ে, বাণিজ্য বিঘ্নিত হয় তেমনই এই বিরাট মহানিষ্ক্রমণ দুই দেশের নিরাপত্তার সামনে এক বড়ো প্রশ্নচিহ্ন হিসেবে হাজির হয়। এই প্রশ্ন আজ অবধি বিরাজমান।

বাংলাদেশ ও মায়ানমার প্রায় ২৭১ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ও জল সীমান্তের অংশীদার। উপনিবেশ-পূর্ব সময় থেকেই বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর প্রথম যে সকল রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, মায়ানমার তার অন্যতম। ১৯৭২ সালের ২১ মার্চ দুই দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা ২০১১ সালে মায়ানমারের সামরিক শাসক Thein Sein-এর শাসনকাল পর্যন্ত অক্ষত ছিল। যদিও দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি করার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ইস্যু অন্যতম বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ, পূর্বে যার নাম ছিল আরাকান অঞ্চল, সেই পশ্চিম তটভূমির প্রদেশে রোহিঙ্গাদের বাসস্থান। সংখ্যাগরিষ্ঠ মায়ানমারের জনগণ রোহিঙ্গাদের অবৈধ বাঙালি অনুপ্রবেশকারী বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য উপত্যকার মধ্যে দিয়ে রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটেছে।

১৯৮২ সালে তৎকালীন সামরিক সরকার মায়ানমারে যে নাগরিকত্ব আইন পাশ করে, তার ফলে ১৮২৪ সালের পূর্বে অর্থাৎ প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যদ্ধের পূর্বে যারা মায়ানমারে বসবাস করতেন, একমাত্র তাদেরই মায়ানমারের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই আইনের ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত হন। তাদের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র, যেকোনো স্থানে যাতায়াতের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ এমনকী স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহের অধিকার যেমন কেড়ে নেওয়া হয়, তেমনই সন্দেহের বশে যথেচ্ছ গ্রেপ্তার, বাধ্যতামূলক শ্রম, বৈষম্যমূলক কর দেওয়ার রীতি চালু হয়, অন্যদিকে আবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাও চলতে থাকে। মায়ানমারের সবথেকে অনুন্নত অঞ্চল রাখাইন প্রদেশ অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, অপ্রতুল পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তাহীন জীবন-জীবিকা সহ এমন একটি প্রদেশ, যেখানে ধর্মীয় কারণে বৌদ্ধ ও সংখ্যালঘু এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৮ এবং ১৯৯১ সালে মায়ানমার সরকার এই প্রদেশে দুটি বড়ো অপারেশন চালায়। সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজারে তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে 'De jure stateless' হিসেবে মনে করা হয়। যদিও বাংলাদেশ সরকার তাদের 'Forcibly displaced Myanmar Nationals' বলে মনে করে। অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মতো মায়ানমার জাতিসংঘে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রোটোকল রয়েছে, যেমন ১৯৫১ সালের UN Convention on the Status of Refugee বা ১৯৫৪ সালের Convention on Stateless Persons সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।

ফলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ অনুদান ও সমর্থন বা তাদের বিশেষ উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ ও সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত।

বিগত দশকগুলিতে রোহিঙ্গা প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা থেকেছে মূলত নিপীড়িত এই জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক সুরক্ষা দিয়ে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯১— এই বছরগুলিতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা জনজাতির মানুষ নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে ও পরবর্তী দশকগুলিতেও তা বজায় থেকেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের আশা ছিল যে, ২০১৭ সালেও একই ঘটনা ঘটবে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে দুই দেশ একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মধ্যে দিয়ে স্থির হয় যে, যৌথভাবে একটি কার্যকরী কমিটি গড়ে উঠবে এবং তার তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছামূলকভাবে সম্মানজনক এবং উপযুক্ত সুরক্ষা দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। যদিও চারটি মিটিং ও দুটি মিটিং-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরও ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার কোনোকিছুই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। বরং সংকট যত ঘনীভূত হতে থাকে, ততই বাংলাদেশের কূটনৈতিক আমলাদের মধ্যে এই সন্দেহ ও সংশয় ঘনীভূত হয় যে, উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের সম্মানজনকভাবে ফিরিয়ে নিতে আদৌ মায়ানমার সরকার কতটা আগ্রহী। দুই দেশের পক্ষ থেকেই পারস্পরিক দোষারোপের পালা শুরু হয়। ২০১৯ সালের জুনে দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায় যখন মায়ানমার সরকারের এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি জাপানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে এই প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হওয়ার কারণ হিসেবে বাংলাদেশকে সরকারকে চিহ্নিত করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনতিবিলম্বে উত্তর দিয়েছিলেন, ''The problem lies with Myanmar as they don't want to take back the Rohingyhas by any means.'' সরকারি স্তরে বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে তার ঘোষিত অবস্থান ব্যক্ত করে এবং মায়ানমার সরকারকে তার অবস্থান গ্রহণের দাবি জানায়। মায়ানমারের উদ্যোগে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় UN High Commission for Refugees-কে বাদ রাখা হয়। চীন আগ্রহ প্রকাশ করেছিল দুই দেশকে একই টেবিলে আনার, কিন্তু মায়ানমারের প্রতি চীনের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কারণে তা কার্যকরী রূপ পায়নি।

রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জনমতের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছে যাতে মায়ানমারের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করা যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং অসরকারি সংগঠন (NGO) উদ্যোগ নিয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর এই অবর্ণনীয় অত্যাচারকে International court of Justice বা ICJ-তে টেনে নিয়ে যাওয়ার। ২০২০ সালে ICJ মায়ানমার সরকারকে নির্দেশ দেয় দেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা প্রদানের। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যদিও এই প্রশ্নে মায়ানমারকে অতিরিক্ত চাপ প্রদান করতে পারে, কিন্তু সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে চীনের ভেটো প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে তা বাতিল হয়ে যাওয়ার।

উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মায়ানমার ও বাংলাদেশের একসঙ্গে চলার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে দুই দেশের সামরিক বাহিনী যৌথভাবে একটি ২৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়

মায়ানমারের Taung Bro থেকে বাংলাদেশের বাউলি বাজার পর্যন্ত। এই পর্যায়ে দুই দেশ Trans Asian Railway-এর অংশ হিসেবে ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রেলপথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এই পর্যায়ে ঢাকা থেকে ইয়াঙ্গন বাদ দিয়ে আকাশপথে অন্য রুট কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে চর্চা হয়। দুই দেশই যদিও আতঙ্কিত ছিল যে, যোগাযোগের উন্নতি ঘটলে হয়তো অবৈধ অনুপ্রবেশের সংখ্যা বাড়তে পারে। যদিও এই সম্ভাবনাও ছিল যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দুই দেশের মধ্যে যেমন বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, তেমনই পর্যটনের পরিমাণও বাড়বে। বিশেষত যেখানে বাংলাদেশে বহু ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলি পর্যটন আকর্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু হতে পারে এবং ওই বিষয়ে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করলে শ্রীলঙ্কা, জাপান, থাইল্যান্ড সহ অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশের বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে। ২০১৫ সালে এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিল, যার নাম ছিল, 'Developing Sustainable and inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland'। এর থেকে অনুমান করা যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কগণ দুই দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সামনে রেখে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চেয়েছিল।

বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সংখ্যাতত্ত্বই প্রমাণ করে যে, এর ওঠাপড়া ক্রমবর্ধমান। ২০১১-১২ সালে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যেখানে ৮৪ মিলিয়ন ডলার, তা ২০১২-১৩ সালে নেমে আসে ৪২ মিলিয়ন ডলারে। ২০১৩-১৪ সালে এর পরিমাণ হয় ৭৫ মিলিয়ন ডলার এবং ২০১৫-১৬ সালে হ্রাস পেয়ে ৩৩ মিলিয়ন ডলার ও ২০১৬-১৭ সালে ৪৪ মিলিয়ন ডলার। সরকারি স্তরের বাণিজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বেসরকারি স্তরে বিবিধ বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলে। যদিও একটি পূর্ণ বিকশিত বাজার গড়ে না ওঠার কারণে মায়ানমারের কিছু নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মায়ানমারের ব্যাঙ্ক ও বিমা ক্ষেত্র যথেষ্ট সংকুচিত। ভারতের Look East Policy-র কারণে যেহেতু বাংলাদেশেরও বাণিজ্যিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য মায়ানমার বাংলাদেশের কাছে একটি নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে বলেই দুই দেশই তাদের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের Department of Narcotics Control-এর মতানুসারে, মায়ানমার সীমান্ত হল বাংলাদেশে অবৈধ ওষুধ চোরাচালানের একটি বড়ো কেন্দ্র। এই অপরাধের সূত্র ধরে বিগত পর্যায়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের একটি বড়ো অংশ উচ্ছেদ হওয়া রোহিঙ্গা মুসলিম। ২০১৭-১৮-র মধ্যে বাংলাদেশ সরকার অন্ততপক্ষে ১০০ জন রোহিঙ্গা ড্রাগ পাচারকারীকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলিতে অবর্ণনীয় পরিবেশে রোহিঙ্গাদের থাকতে বাধ্য হওয়া, শিক্ষা ও জীবিকার কোনো সুযোগ না থাকা, উচ্ছেদ হওয়া রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষকে যে ধারাবাহিক অপরাধমূলক কার্যকলাপের দিকে ঠেলছে, তা বলাই বাহুল্য। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ যদিও ড্রাগ চোরাচালানের যে সোনালি ত্রিভূজ (মায়ানমার-লাওস-থাইল্যান্ড), তার অন্যতম transit পয়েন্ট এবং এই অপরাধের কেন্দ্রে রয়েছে রোহিঙ্গারা।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিকে কেন্দ্র করে মানব পাচারের একটি বড়ো চোরাচালান চক্র গড়ে উঠেছে। যা প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকভাবে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অসরকারি সংগঠন ধারাবাহিকভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শ্রমিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের বেগার চোরাচালান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং দুর্বল অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশের উপরও অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগরের ভাসান চর সহ অন্যান্য কিছু নির্দিষ্ট এলাকাতেও স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

রোহিঙ্গা জঙ্গি গোষ্ঠিগুলিও বাংলাদেশের নিরাপত্তার পক্ষে একটি বড়ো চিন্তার কারণ। যদিও এদের প্রত্যেকের ঘাঁটি এলাকা মূলত মায়ানমারে, কিন্তু বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের মধ্যে এইসকল গোষ্ঠির এক বড়ো সংখ্যায় সদস্য ও সমর্থক রয়েছে। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (BGB) ও মায়ানমার পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করে থাকেন। অন্যান্য সংবেদনশীল বিষয় অর্থাৎ সীমান্ত মাদকের চোরাচালান হোক বা ভুল সন্দেহের ফলে কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির আটক হোক, সবক্ষেত্রেই দুই দেশের কর্তাদের এই উচ্চপদস্থ বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। দুই দেশের কূটনৈতিক স্তরে বিবিধ অবিশ্বাস ও ভুল ধারণা সংশোধনের জন্য এই ধরনের বৈঠক আরও বেশি অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, যার মধ্যে দিয়ে পার্থক্যগুলি নির্মূল হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান নিঃসন্দেহে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। রাষ্ট্রীয় স্তরে আঞ্চলিক যে সমস্ত সংগঠন রয়েছে, সেগুলিও এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মায়ানমার ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রই যৌথভাবে যেমন একদিকে BIMSTEC-র সদস্য, তেমনি চীনের Belt and Road-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশ ASEAN-এর সদস্য হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে এবং ইতিমধ্যে সে Asian Regional Forum (ARF)-এ যোগদানও করেছে। এই সকল আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিক গোষ্ঠী ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উন্নত রেল-সড়ক ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন গড়ে তুলতে পারে, তেমনই প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তির উৎস সন্ধানে আরও বেশি বিনিয়োগ বাড়াতে পারে। দুই দেশেই বাণিজ্য বিনিয়োগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি উন্নতি ঘটে, তবে নতুন ধরনের বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র দুই দেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে, উন্নতমানের আমদানিযোগ্য পণ্য দুই দেশই আহরণ করতে পারবে এবং জীবিকা ও চাকুরির নতুন নতুন সুযোগের সমাবেশ ঘটবে। ত্রিমাত্রিক ও বহুমাত্রিক আঞ্চলিক গ্রুপগুলি তাই বাণিজ্য সম্পর্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

BIMSTEC বা ASEAN— কোনো সংগঠনের সেই আইনি বা রাজনীতিক পরিকাঠামো নেই, যার মধ্যে দিয়ে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে বা যারা আশ্রয়প্রার্থী, তাদের কার্যকরীভাবে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। ASEAN রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র ফিলিপাইনস ও কম্বোডিয়া জাতিসংঘের ১৯৫১ সাল ও ১৯৬৭ সালের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত প্রোটোকলকে গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি ASEAN-এর ২০০৭ সালের সনদ

অনুযায়ী অভিবাসী শ্রমিকদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে, যার অধীনে রোহিঙ্গারা আসে না। আন্তর্জাতিক বিশ্বে ASEAN যদিও বার বার সমালোচিত হয়েছে— মায়ানমারের উপর উপযুক্ত চাপ তৈরি করে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রসঙ্গে অবস্থান না নেওয়ায়। শেষপর্যন্ত Linjock Hoi-এর নেতৃত্বে ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ টিম পাঠানো হয় মায়ানমারের অফিসারদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে। এই টিমের সদস্যরা তাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ২০১৯ সালের মে মাসে দু-বার রাখাইন প্রদেশ ভ্রমণ করে। যদিও সমালোচকরা মনে করেন, এই টিমকে ASEAN-এর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কার্যকরী কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি এবং একইসঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে রোহিঙ্গাদের বক্তব্য কী, তা তুলে ধরার অবকাশ এই টিমের ছিল না। এই দৌত্য ব্যর্থ হয়, কারণ মায়ানমার প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার কোনো গ্যারান্টি দিতে সম্মত হয়নি।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমি বিশ্বের পক্ষ থেকে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মতো রাষ্ট্রগুলির থেকে নিন্দাসূচক মন্তব্য এলেও কার্যকরী কোনো চাপ তৈরি করা যায়নি। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো রাষ্ট্র কূটনৈতিক পথে সমাধানের কথা যেমন বলেছে, তেমনই অন্যদিকে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইনসের মতো রাষ্ট্র মায়ানমার সরকারকে সমর্থন করেছে। BIMSTEC সংগঠনের সমস্যা হল, যেহেতু এটি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার নিরিখে গড়ে ওঠা একটি মঞ্চ, তাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, সংবেদনশীলতার সঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না হলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হবে, তাতে BIMSTEC-র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদিও মায়ানমার ও বাংলাদেশ— কোনো সদস্য রাষ্ট্রই BIMSTEC-র সম্মেলনে রোহিঙ্গা ইস্যুকে সামনে আনেনি। ২০১৯ সালের নভেম্বরে কলকাতায় BIMSTEC-র যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে Secretariat Body দাবি তোলে, যদি বাংলাদেশ রাষ্ট্র মনে করে, তবে রোহিঙ্গা ইস্যু সম্মেলনে আলোচিত হতে পারে। এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ, অর্থনৈতিকভাবে রাখাইন প্রদেশ যদি সমৃদ্ধ হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি BIMSTEC উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়, তবেই রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরার উল্লেখযোগ্য সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। রোহিঙ্গা সমস্যা তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, বৃহৎ আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিক সংগঠনগুলি কীভাবে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং ASEAN হোক বা BIMSTEC— কেউই সদর্থক কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি।

দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র চীন ও ভারত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারত। কারণ, মায়ানমার ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সহযোগী হিসেবে দুই রাষ্ট্রেরই ভূমিকা রয়েছে। যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তার কারণ মায়ানমারের সঙ্গে চীনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বহু কোটি

বিলিয়ন ডলার মূল্যের China-Myanmar Economic Corridor। মায়ানমারের বন্দর ও পরিকাঠামো নির্মাণে যেমন চীন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, তেমনই বাংলাদেশেও অন্যতম বিনিয়োগকারী রাষ্ট্র হল চীন।

চীনের মতোই মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও মধুর। বহু মিডিয়া রিপোর্ট থেকে এর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, চীন একদিকে যেমন রোহিঙ্গা ইস্যুতে মায়ানামারকে সমর্থন জানিয়েছে, তেমনই আরাকান আর্মি সহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতাও করেছে। যার ফলে চীনের প্রতি মায়ানমারের বিরূপতাও রয়েছে। ভারত ও মায়ানমার যৌথভাবে যে বৃহৎ প্রকল্প গড়ে তুলেছে, তা হল মিজোরামের সীমান্তে Kaladan Multi-modal Transit Transport Project। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মায়ানমার ভারতের অন্যতম সহযোগী। মায়ানমার একদিকে তাই চীন ও ভারত উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কৌশলগত অংশীদারিত্ব বজায় রেখেছে। BIMSTEC-র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভারতও তার নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে মায়ানমারের উপর যথোপযুক্ত চাপ তৈরি করেনি।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাই বাংলাদেশ ও মায়ানমার দুই রাষ্ট্রকেই যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে, তেমনই বৃহৎ শক্তিধর দুই রাষ্ট্রকেও তাদের বাণিজ্যিক ও রণনৈতিক স্বার্থের বাইরে গিয়ে এই মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ নিতে হবে। নয়তো অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা প্রশ্ন গোটা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতাবস্থা, শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

৫.৪ রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন রিপোর্ট

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মায়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচার ১৯৭৮, ১৯৯১, ১৯৯৫, ২০১৬-১৭ সালে নানা পর্যায়ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। তবে ১৯৯৫ সালে ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয়গ্রহণ করে। দু-দশক পরে ২০১৭ সালে মায়ানমার সেনাবাহিনী ব্যাপক অত্যাচার শুরু করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর। তার ফলে বিপুল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ রাতারাতি নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ২০১৬ থেকে শুরু করে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের Refugee Relief and Repatriation Commissioner, Cox's Bazar-র সরকারি হিসেবে প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষজন রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বেসরকারি রিপোর্ট অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ।

২০১৯ সালের ১৬ ও ১৭ অক্টোবর আমি কক্সবাজারের কুতুপালং ইউনিয়নের কুতুপালং ১ এবং ২ নং রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যাই— আমার গবেষণার কাজে। এই ক্যাম্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজের ডা. অভিজিৎবাবু ও তার সহযোগী দেবাংশুবাবু আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে অভিজিৎবাবুর অনেক ডাক্তার বন্ধু রিফিউজি ক্যাম্পে চাকুরিরত ছিলেন। ফলে আমার পক্ষে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে ওঠে। আমি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থিত— Food distribution Centre, অস্থায়ী স্বাস্থ্য

কেন্দ্র, শিশুদের জন্য অস্থায়ী বিদ্যালয়, BRAC-র অফিস ও ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থিত দোকানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে মিলিত হই। ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থিত BRAC-র অফিস থেকে একজন দোভাষীকে প্রদান করা হয়, যাতে আমি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সঠিকভাবে কথোপকথন করতে পারি। এই সমস্ত বিষয়গুলির Recording CD/DVD-তে আমার গবেষণা পত্রটির সঙ্গে যুক্ত করা আছে।

কক্সবাজার থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুতুপালং ক্যাম্প। পাহাড়ি টিলা ও বনভূমি দ্বারা বেষ্টিত কুতুপালং এলাকা। পাহাড়ি টিলা ও বনভূমি দ্বারা বেষ্টিত কুতুপালং এলাকা। এই অল্প জায়গার মধ্যে বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্যাম্প করে অবস্থান করছে। ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে মানুষজন বসবাল করছে। বিপুলসংখ্যক মানুষের চাপে বনভূমি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষময় হয়ে উঠেছে। একটি ঘরের সঙ্গে অপর একটি ঘর যুক্ত হওয়ায় হাওয়া-বাতাসের প্রবেশ প্রায় বন্ধ। এই অবর্ণনীয় পরিবেশের মধ্যে মানুষজনের বসবাস। বেসরকারি সূত্র অনুসারে প্রায় ২০ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ সমগ্র কক্সবাজারে অবস্থান করছে। ক্যাম্পগুলিতে যে মানুষেরা অবস্থান করছে, তাদের পরিচয়পত্র সঠিকভাবে থাকলেও কক্সবাজার সদর এবং সংলগ্ন এলাকাতে অনেকেই অবস্থান করছে যাদের সঠিক কোনো পরিচয়পত্র নেই। যাদের বেশিরভাগই বেকার। তার ফলে গত কয়েক বছরে কক্সবাজার এলাকায় চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেছে। এছাড়া সবথেকে বড়ো সমস্যা হল এদের বেশিরভাগই ড্রাগ চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত, যা কক্সবাজার সহ বাংলাদেশ প্রশাসনের মাথাব্যথার বড়ো কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিঙ্গা রিফিউজিদের সঙ্গে,
রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প (কুতুপালং, কক্সবাজার)
নিজস্ব চিত্র

ইউনিসেফ স্কুল, রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প
(কুতুপালং, কক্সবাজার)
নিজস্ব চিত্র

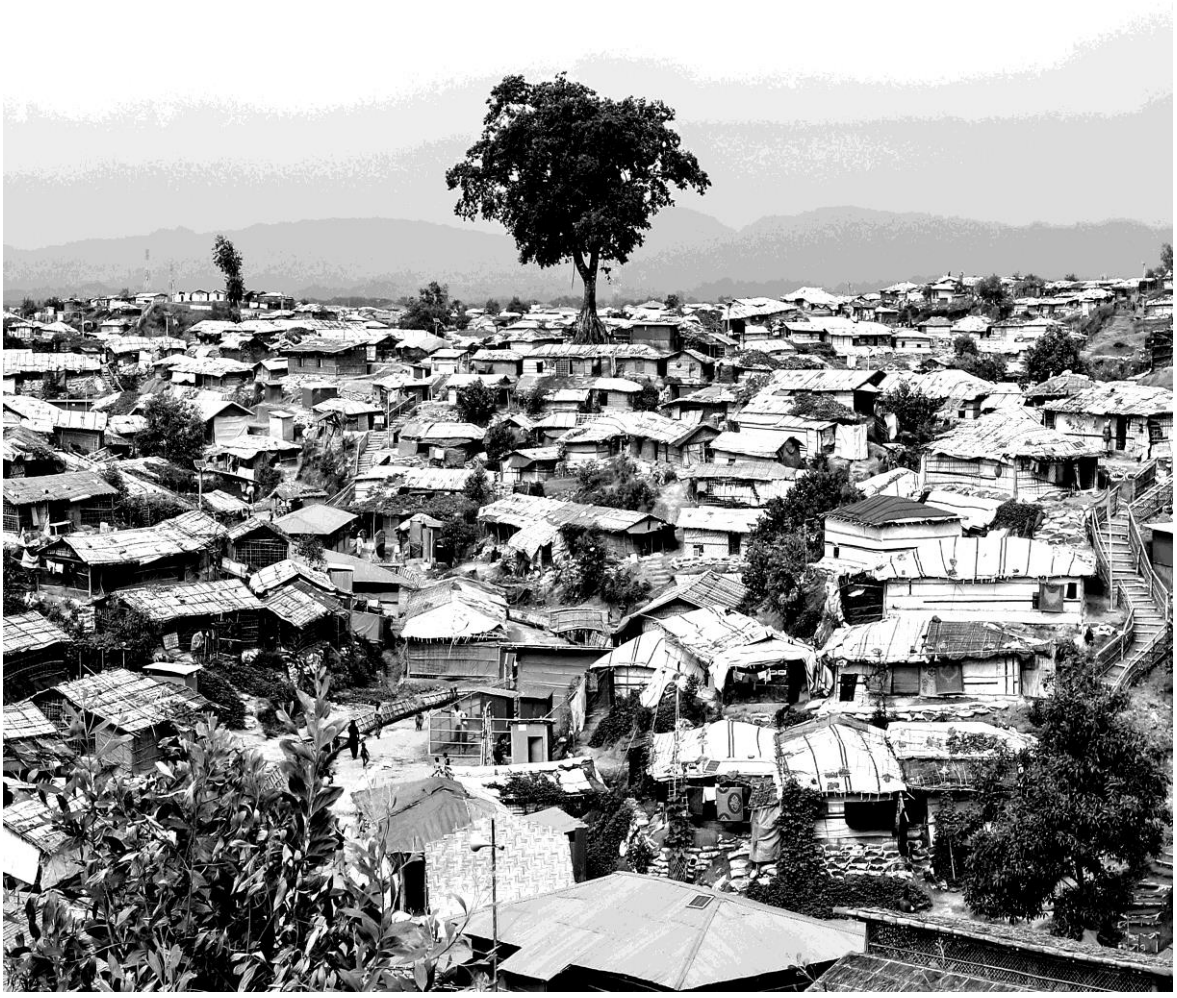

রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প (কুতুপালং, কক্সবাজার)
নিজস্ব চিত্র

উপসংহার

(Conclusion)

উত্তরে চীন, দক্ষিণে ভারত, পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সমুদ্র সীমান্তে জুড়ে থাকা বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারত ও চীন উভয় রাষ্ট্রের কাছে। Anderson-এর মতে, বাংলাদেশের রণনৈতিক অবস্থান এমনই যে, বিভিন্ন বিবদমান পক্ষগুলিকে জুড়ে শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে এই দেশ একটি রণনৈতিক ভূমিকা নিতে পারে। বঙ্গোপসাগরে জাপানের উদ্যোগে 'Industrial Growth Belt Initiative' বা চীনের 'Belt and Road Initiative' (BRI) বা ভারতের 'Sagar Mala' উদ্যোগ— সবকটিতেই বাংলাদেশকে শামিল করার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন এই দেশটির সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়, তেমনই এই কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বিগত দুই দশকে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও অর্থনীতিতে একটি গতিসঞ্চারী শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় এক দীর্ঘ সময় ধরে ভারতই ছিল নীতি নির্ধারক ও নির্ণায়ক প্রভাবশালী শক্তি। বিগত দশকগুলিতে চৈনিক প্রভাব যদিও ধাপে ধাপে বেড়েছে। অর্থনীতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা একদিকে যেমন ভারতের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, তেমনই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। এইসকল দেশে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিনিয়োগে অন্যতম সাহায্যকারী হিসেবে উঠে এসেছে চীন। চীনের BRI প্রকল্প এমনই একটি প্রকল্প, যা বর্তমানে ভারতের শিরঃপীড়ার কারণ।

কূটনৈতিক স্তরে বাংলাদেশ ভারত ও চীন দুই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পছন্দ করে। যদিও ২০২২ সালের আগস্ট মাসে মূলধারার বেশিরভাগ সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান সময়টি হল ভারতের সঙ্গে সোনালি সম্পর্কে পর্যায়কাল। বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে বাংলাদেশ যদিও তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে— ভারত ও চীনের সম্পর্ক কিন্তু এক ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়েই সন্দেহ, অবিশ্বাস, অনাস্থা ও বিরূপতায় পূর্ণ। সাম্প্রতিক অতীতে ডোকলাম ও অরুণাচল প্রদেশকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক আরও তীব্র রূপ নিয়েছে। যেহেতু দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে দুই দেশেরই প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ করা যায়, ফলত এশীয়-প্যাসিফিক পুরো এলাকা জুড়েই দুই শক্তির দ্বৈরথ সর্বজন বিদিত। একদিকে Belt and Road Initiative (BRI) এবং অন্যদিকে Indo-Pacific Strategy-র মতো উদ্যোগ এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এইরকম এক পটভূমিতে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সামনে আসে, তা হল—

১। ভারত-চীন দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ডেকে আনতে পারে।

২। কী কী উপায়ে বাংলাদেশ এই সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে।

৩। দুই দেশের সঙ্গে রণনৈতিক সম্পর্ককে বাংলাদেশ কীভাবে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্তরে উন্নীত করেছে।

ভারত-চীন দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের জন্য এইসকল তাত্ত্বিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে গেলে একদিকে যেমন ভারত-চীন যুদ্ধের গতি প্রকৃতিকে বুঝে নেওয়া দরকার, তেমনই বাংলাদেশের বিদেশনীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্কেও তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন। কেননা, কয়েক দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের এই সকল নীতির খসড়া রচিত হয়েছে।

যেহেতু বিদেশনীতির প্রথমেই আলোচনায় আসবে, বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মৌলিক ধারণা হল সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও কারও প্রতি বিরাগ পোষণ না করা। জন্মমুহূর্তের প্রথম বছরগুলিতে (১৯৭২-৭৫) শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এইভাবে সতর্কতার সঙ্গে তার জোট নিরপেক্ষ নীতিকে প্রয়োগ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এবং বিশেষত ৯/১১ ঘটনা পরবর্তী সময়ে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মূলত এক বাস্তববাদী অভিমুখ থেকে পরিচালিত হয়েছে। এই বাস্তববাদীতার কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলির সঙ্গে কোনো দীর্ঘমেয়াদি বোঝাপড়াতে যায়নি। বাংলাদেশের বিদেশনীতির নির্ধারকরা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্তরে শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তারা মনে করতেন, দ্বিমেরুকরণই ঠান্ডাযুদ্ধের পটভূমিতে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সবথেকে বড়ো বাধা। যদিও ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও আলোচনা, সেখানে বাংলাদেশের কূটনৈতিকরা ধীরে ধীরে ভূমিকা নিতে শুরু করে।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক বোঝাপড়া বার বার প্রভাবিত হয়েছে শাসক গোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন যে রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি তার চিন্তাধারা বিদেশনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক এলিটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অভিমুখ বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর এক অংশ কর্তৃক অন্য অংশকে 'pro-India' বলে অভিহিত করা এবং অন্য অংশটির দ্বারা 'pro-China' তকমা পাওয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালে যদিও এমন দ্বিমাত্রিক চিন্তার কিছু পরিমাণ অবসান হয়েছে, কিন্তু এর অবশেষ ও রেশ আজও বিদ্যমান। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল বাংলাদেশের ধর্মীয় পরিচয় সত্তাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে এক শক্তিশালী জনসমর্থন ও শাসকগোষ্ঠীর অবস্থান।

ভারত-চীন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ার ধরন মূলত দুটি— অবস্থানগত ও আচরণগত। নিজস্ব আত্মস্বার্থ ও বাস্তববাদিতার এক সুন্দর মিশেলের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ এই দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত দশকগুলিতে ভূমিকা নিয়েছে। যদিও এটা বলা বাহুল্য, আজকের বহুমেরু বিশ্বে ও বিশ্বায়িত দুনিয়ায় ভারসাম্য বজায় রাখার কাজই হল অন্যতম কঠিন কাজ। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক স্তরে বাংলাদেশের কূটনৈতিক

সাফল্যের ইতিহাস কম নয়। বিদেশনীতিতে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের নীতি ভারত ও চীনের মতো দুই বৃহৎশক্তির দ্বৈরথের মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশকে তার স্বাধীন অবস্থান নিতে সাহায্য করেছে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের সূচনা পর্ব মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠলাভের পূর্ব থেকে হলেও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে দীর্ঘ সামরিক শাসন ভারতের সঙ্গে বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও উত্থান ও পতন নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এক উল্লেখযোগ্য মাত্রায় গড়ে ওঠার পর্যায় আবার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর্ব থেকে। ২০০৯-১০ সালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টের তথ্য অনুসারে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই সময় থেকেই ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিপাক্ষিক স্তরে সমস্ত উদ্যোগে বাংলাদেশকে শামিল করে থাকে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে যখন শেখ হাসিনা দিল্লি আসেন, তখন এই সম্পর্কের আর এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। একদিকে আগরতলা-আখড়া রেল যোগাযোগ যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনই চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর যে দুই রাষ্ট্রই পরস্পরের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারবে, তা স্থির হয়। বাংলাদেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সহযোগিতায় ভারত ১ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য করবে তা স্থির হয়। এছাড়া ভারত বাংলাদেশকে প্রায় ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করবে তা নিশ্চিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে যান, তখন আরও কিছু বোঝাপড়ার উন্নতি হয় ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'Framework Agreement on Cooperation for Development; pro to col to the Agreement concerning the Demarcation of the Land Boundary between India and Bangladesh and Related Matters; Addendum to the Memorandum of Understanding (MOU) between India and Bangladesh to facilitate overland Transit Tariff between Bangladesh and Nepal.'

২০১৪ সালে নৌ-সীমান্ত সংক্রান্ত দুই দেশের দ্বন্দ্বের যেমন সমাধান হয়, তেমনই ২০১৫ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তিটিকে নবীকরণের মধ্যে দিয়ে আরও উন্নত করা হয়। এছাড়া 'Development Partnership' এবং 'Security and Strategic Partnership'-এর ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্ক বর্তমান সময়ে এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হয়েছে ও অন্যান্য প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কাছে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির হয়েছে। ভারতের 'Act East' ও 'Neighbourhood First' নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম রণনৈতিক সহযোগী। দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই হল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বাণিজ্যের অংশীদার। ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯.৪ বিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল ১.৪ বিলিয়ন ডলার। ২০০৯ সালে আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভারত হল অন্যতম সহযোগী। ২০০৩ সালে *The Hindu* পত্রিকা এবং The Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) নামে একটি ভারতীয় সংস্থার দ্বারা করা সমীক্ষার তথ্য অনুসারে ৪৮ শতাংশ ভারতীয় বাংলাদেশকে নিকটতম মিত্র রাষ্ট্র

বলে মনে করে। ঢাকা-নয়াদিল্লি কৌশলগত অংশীদারিত্বের ফলে মানুষের রাজনৈতিক আচরণে এই বদল বলে অনেকেই মনে করেন।

২০১৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন, যার ফলে প্রতিরক্ষা ও অপ্রচলিত শক্তি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২২টি মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারত ও বাংলাদেশের নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে যৌথ নৌ-মহড়ায় শামিল হয়। দুই দেশের উন্নত বোঝাপড়ার মান কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তা উপলব্ধি করার জন্য এইগুলি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

মধুচন্দ্রিমার পর্বের সঙ্গেই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা সে দেশের জনগণের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। জলবণ্টনের ইস্যু ও সীমান্তের ভুয়ো সংঘর্ষের মতো বিভিন্ন ঘটনা এই বিরূপতাকে আরও বাড়িয়েছে। ভারতের নাগরিকত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা NRC এবং CAA ইস্যু ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ২০১৯ সালে এরই পটভূমিতে বাংলাদেশের মন্ত্রীদের এক কূটনৈতিক সফর বাতিল হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুক্ত বাণিজ্যের দুনিয়ায় ভারত সরকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যে সংরক্ষণবাদী নীতি অনুসরণ করছে, তা বাংলাদেশের অসন্তোষ বৃদ্ধির একটি বড়ো কারণ। বাংলাদেশের *The Financial Express* পত্রিকা এই প্রসঙ্গে তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছে, ''The renewed move to put up fresh tariff and non-tariff barriers to the access of Bangladesh goods to Indian market has triggered frustration among business here. Many might find the approach on the part of India a bit harsh and not in line with the much-touted claim that the good neighbourly relations between the two countries are now at its peak.'' সর্বোপরি ভারতবর্ষের বেশ কিছু জনমাধ্যমে যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে অসত্য প্রচার শুরু হয় এবং বলা হয়, বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে চীনা ড্রাগনের করায়ত্ত এবং তার প্রমাণ হল নিজের অভ্যন্তরীণ বাজারে চীন বাংলাদেশি পণ্যের ৯৭ শতাংশকে শুল্কমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে, তখন তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

২১ শতকে চীনের উত্থানের সঙ্গেসঙ্গে ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের মতে ভারত চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে বাধাস্বরূপ দেখে। যদিও ৯০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের পুনরায় উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু ২০১৭ সাল পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনো চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। ২০১৩ সালে তাই বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী যখন চীনের থেকে সাবমেরিন ক্রয় করে, তখন ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক।

রোহিঙ্গা সংকটের সময় বাংলাদেশ ভারতকে যেভাবে পাশে পেতে চেয়েছিল, বাস্তবে তা হয়নি। যদিও ভারত রোহিঙ্গা ইস্যুর ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এসেছে, কিন্তু ঢাকা একেবারেই সন্তুষ্ট নয়।

বাংলাদেশের মতে, মায়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক বন্ধন ও বাধ্যবাধকতার কারণে রোহিঙ্গা প্রশ্নে ভারত কোনো সদর্থক ইতিবাচক অবস্থান নিতে পারেনি।

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই এক বিরূপতার মনোভাব নিয়ে এগিয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় এবং সোভিয়েত-চীন দ্বন্দ্বের পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চীনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এমনকী ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যাতে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ না পায়, তার জন্য চীন তার ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে। ১৯৭৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি। ফলস্বরূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে দুই রাষ্ট্র প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। বেশ কিছু দশক জুড়ে এমন কিছু বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে চীন-বাংলাদেশের সখ্যতা অভূতপূর্ব।

১৯৮০ সালের প্রথম দশক থেকেই চীন বাংলাদেশের প্রাথমিক উন্নয়নে সহযোগী শক্তি হিসেবে এবং বাণিজ্য সহযোগী এবং সামরিক প্রযুক্তির সরবরাহকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশও চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে রণনৈতিক সহযোগিতার নীতি নেয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে। বাংলাদেশে চৈনিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতার মতে, "If there is anything constant in international relations, it is the friendship between China and Bangladesh." বাংলাদেশ চীনের অখণ্ডতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে এবং রাষ্ট্রসংঘ সহ বহুবিধ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চীনের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। চীনের BRI প্রকল্পকে ভীষণভাবে সমর্থন জানিয়েছে বাংলাদেশ। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাংলাদেশের প্রতি চীনের এই যে সমর্থন, তা শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হলেও অক্ষুণ্ণ থাকে।

২০১৬ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট Xi Jinping যখন শেষ ৩০ বছরে প্রথমবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন, তখন এই সফর চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ককে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। এই পর্যায়ে ২৪.৪৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ২৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ছিল স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত হওয়া বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর এই সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। এই পর্যায়ে চীন বাংলাদেশকে এক ভালো পরিমাণ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে। এমনকী মহামারী মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে চীনা মেডিকেল টিম পাঠানোর প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেন।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতাও দুই দেশের মধ্যে বাড়তে থাকে। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে চীন বাংলাদেশকে ১.৮৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক অস্ত্রাদি সরবরাহ করে। এই পর্যায়ে Aircraft F-7 এবং Type 035G সাবমেরিন চীন বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। *Daily Star*-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশি বায়ুসেনার আধুনিকীকরণের জন্য এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার চীনা প্রযুক্তিতে নির্মিত সাতটি K-8W ট্রেনিংপ্রাপ্ত Aircraft-ও ক্রয় করে।

ভারতের মতোই চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট তার মধ্যে একটি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিংহভাগই বিশ্বাস করেন যে, মায়ানমার সরকারের স্বৈরাচারী

ও একনায়কতান্ত্রিক আচরণের পিছনে বর্ম হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে চীন। চীনই নিরাপত্তা পরিষদে মায়ানমারের বিপক্ষে প্রস্তাব আনতে বার বার বাধা দিয়েছে। ঢাকার শাসকগোষ্ঠীকে এই অবস্থান মোটেই খুশি করেনি। বাংলাদেশের *Business Standard* এই প্রসঙ্গে লিখছে, ''China's role as the saviour of Myanmar just never ends. China, instead of taking a role in stopping Myanmar, discouraged to 'internationalize' the Rohingya crisis. Beijing has been one of the few backers of Myanmar who played down the Rohingya repression is Rakhine as Myanmar's internal issues.''

ভারত-চীন সীমান্তে দ্বন্দ্ব দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর এক নিদারুণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সীমান্ত সংঘর্ষ ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা চলে নিজস্ব অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫২ সালে Shao Chuan Leng মন্তব্য করেছিলেন, ''Relations between India and China are of great importance not only to Asia's destiny, but also to the futureof the world. Both countries have tremendous appeal to millions of people in underdeveloped areas.'' এই মতামত বর্তমান সময়েও সত্যি। ভারত-চীন সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। ভারত-চীন দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এক অসম্ভব চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিজস্ব ভৌগোলিক ও রণনৈতিক অবস্থানগত কারণে চীন ও ভারত দুই দেশের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। Kassab-এর মতে, ''If great powers wish to succeed in the tewenty-first century political environment, they must compete with other great powers in winning weak state support.'' *The Diplomat* মনে করে, ''If Dhaka plays its cards right, the country could grasp on opportunity as both China and India up their efforts to gain influence.'' ভারতের National Security Advisor অজিত ডোভাল বাংলাদেশকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বলে মনে করেন। Pradhan-এর মতে, বাংলাদেশই হল পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রবেশদ্বার। ২০১৯ সালে তিনি লিখেছিলেন, ''The aim for the NDA government over the next five years must be twofold: To take India-Bangladesh relations to the next level and consequently give momentum to India's 'Act East' aspirations. And to ensure that all of the warmth in bilateral ties is retained.''

সিংচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের South Asian Studies-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, অধ্যাপক Li Tao-এর মতে, BRI-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর এবং

২০১৬ সালে Xi Jinping-র সফর প্রমাণ করে, ভারত ও চীনের বৈদেশিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ও গুরুত্বের প্রশ্নটিকে।

ভারত ও চীন দুই দেশই বাংলাদেশে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে উৎসাহী এবং বাস্তবত গভীর সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের নৌ-বাণিজ্য বৃদ্ধির যেমন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে, তেমনই এগুলিকে কেন্দ্র করে একটি আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে দেশটির বিকাশ ঘটতে পারে। কক্সবাজারের কাছে সোনাদিয়া সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ২ শতাংশ বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে অনেকেই মনে করেন এবং এই বন্দর নির্মাণে যখন বাংলাদেশ চীনা সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন চীন অত্যন্ত দ্রুত ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে ২০১৮ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর দুটিকে গড়ে তোলার বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত চুক্তিবদ্ধ হয়। *Dhaka Tribune*-এর এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন যে, নিজস্ব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ একদিকে যেমন তার উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে পারে, তেমনই দক্ষিণ এশিয়ার ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের কেন্দ্রে নাগরিক সমাজ এক উল্লেখযোগ্য পক্ষ হিসেবে ভূমিকা নেওয়ার দাবি রাখে। ঐতিহাসিকভাবে এই অংশ প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার সোচ্চার প্রশংসা করে এসেছে এবং ধিক্কার জানিয়েছে তৎকালীন চীনের বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থানের। পদ্মা-মেঘনার তীর ধরে তার পর অনেক জনস্রোত প্রবাহিত হলেও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনও এই মনোভাব পোষণ করে। বিশেষত বাংলাদেশের প্রগতিশীল যুবসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতীত উত্তরাধিকারকে ফিরে দেখার দাবি জানায়। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতা থাকার ফলে ভারতের সুযোগ রয়েছে এই সম্পর্ককে আরও মজবুত করার এবং নতুন আলোতে ফিরে দেখা। উপযোগিতাবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে যদি ভারতরাষ্ট্র ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয় নদীর জলবণ্টন ও সীমান্ত সম্পর্কিত যে সকল বিরোধ এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে তার যথাবিহিত সমাধানে, দুই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মিলন, আসা-যাওয়া ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র যদি সম্প্রসারিত হয়, তবে ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশি জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যে যে নেতিবাচক মনোভাব আছে, তার অবসান ঘটবে। দক্ষিণ এশিয়ায় পরস্পরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশ এক শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে।

গ্রন্থসূচি

(Bibliography)

বাংলা

অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফলজুল হক*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।

লে. জেনারেল জে.এফ.আর. জেকব, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা— একটি জাতির জন্ম*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯।

মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৩।

দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, চারুলিপি, ১৯৮৬।

আহমদ রফিক, *এ কোন বাংলাদেশি সমাজ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৭।

ড. আবদুল করিম, *রোহিঙ্গাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬।

হুমায়ুন আজাদ, *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৩।

শিরিন আখতার, *রোহিঙ্গা*, চেতনায় ঐতিহ্য, ২০১৯।

অর্জুন গোস্বামী, *দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, গাঙচিল, ২০১৭।

English

Article

Abedin Joynal, "War Agaianst Fundamentalists", *The Statesman*, October 4, 1993.

Chakravarty Nikhil, "Grouping For Democracy", *The Hindusthan Times*, March 15, 1991.

Chowdhury, A. Zaglul , "Bangla Minorities Seek Equal Rights", *The Times Of India News Service*, Dhaka, November 3, 1992.

Engineer, Asghar Ali (May 14,2001). 'Bangladesh Showing the Way'. *The Hindu*, Chennai.

Ghosh Manas, "Converts To Violence", *The Statesman*, Kolkata, October 4, 2003.

Ghosh Manas, "The Rise Of The Fundamentalist", *The Statesman*, Dhaka, May 28, 1993.

Habib Haroon, "A child of Bangali Nationalism In Trouble", *The Telegraph*, Kolkata, January 13, 2003.

Habib Haroon, "Attempting A Seize", *Frontline*, May17, 2013.

Hossein Saiyad Anwar , "Awami League— er ek Maser Pararashtraniti", (Bengali) *Bangla Bazaar Patrika*, Dhaka , August 1 , 1973.

Khan, UddinJasim.(February 19,2006). 'China top import source for Bangladesh: Beats India For the first time'. *The Delhi Star*, 5(641).

Rahman Imran, "Bangla High Court Seeks Report on Hindu Torture charge", *The Hindusthan Times*, Dhaka, January 23, 2002.

Roy Chowdhury Nilova, "Delhi To Serve Demarche On Dhaka over Terror", *The Statesman*, November 30, 2002.

Book

Ahmed Emajuddin (ed), *Society and Politics In Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka, 1989.

Ahmed, Salahuddin, *Bangladesh: Past and Present* (New Delhi: APH Publishing Corporation, 2004).

Anisuzaman (2000) *The Identity Question and Politics*, Ed. Jahan, Rounaq Bangladesh: Promise and performance, Bangladesh: University Press Limited.

Asthana, Vadana (1999) *India's Foreign Policy and Sub continental Politics*, New Delhi: Kanishka Publishers.

Avtar Singh Bhasin (ed), *India's Foreign Relations Documents- 2005* (New Delhi: Public Diplomacy Division, Ministry of External Affairs, 2005).

Banerjee, Dipankar and N. Manoharan, *SAARC: Towards Greater Connectivity* (New Delhi: Konard Adenauer Stiftung, 2008).

Banerjee, Dipankar (ed), *South Asian Security: Futures A dialogue of Directors Regional Strategic Studies Institutes* (Colombo: Regional Centre for Strategic Studies, 2002).

Bammi, Y.M., *India Bangladesh Relation: The way Ahead* (New Delhi: Viz. books, 2011).

Bandyopadhaya, J. (2006) *Making of India's Foreign Policy*, New Delhi:Allied Publishers.

Baruah, Sanjib, *India against itself: Assam and the Politics of Nationality* (Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1999).

B.N. (2011), *India in the New South Asia, Strategic, Military and Economic Concerns in the age of Nuclear Diplomacy*. New Delhi: Viva Publishers.

Bose, Sugata and Jalal Ayesha, *Modern South Asia: History Culture, Political Economy* (New Delhi: Oxford University Press, 1998).

Chakraborty S.R. (ed), *Foreign Policy of Bangladesh*, Har Anand Publications New Delhi, April, 1994

Chandra, Vishal (ed.), *India and South Asia: Exploring Regional Perception* (New Delhi: Pentagon Press, 2015).

Chellany, Brahma, *Asian Juggernaut: The Rise of China, India, and Japan* (New Delhi: Harper Collins, 2006).

Choudhary, Dilara (1992) *Bangladesh and the South Asian International System*, Inc; Chicago, U.S.A.: Kazi Publications.

Choudhari, K.C., *India's Foreign Policy in Contemporary International Scenario* (New Delhi South Asian Publishers, 2009).

Dahiya, Rumel and Behuria, (2012) *India's Neighbourhood: Challenges in the Next Two Decades*, Published by Pentagon Security International, New Delhi.

Datta, Sreeradha (2012) 'Bangladesh Illegal Migration And Challenges For India', (Edt.) Dahiya, Rumel and Behuria, Ashok K. (2012) *India's Neighbourhood: Challenges In The Next Two Decades*, New Delhi,Pentagon Security International.

Dasgupta, Siddhartha. (2010). 'India-Bangladesh Ties: New Challenges for Distant Neighbours'. In Raj Kumar Kothari (Ed.), *India's Foreign Policy in the New Millennium* (pp. 339-363). New Delhi: Academic Excellency.

Davinder Kumar Madan, *India-Bangladesh Economic Relations and SAARC* (New Delhi: Deep and Deep Publications, 1996).

Dixit, J.N. (1999). *Liberation and Beyond Bangladesh*. New Delhi: Konark Publishers(Pvt.) Ltd.

Dua, B.D. And M.P. Singh (2002) (Ed.), *Indian Federalism In The New Millennium*. New Delhi: Manohar.

Dutta Sriradhar, *Bangladesh : A Fragile Democracy*, shipra Publications, Delhi, 2004.

Ghosh, S. Partha (1989) *Cooperation and Conflict in South Asia*, New Delhi,Manohar Publications.

Grover, Verinder.(2000). 'People's Republic of Bangladesh'. In Verinder Grover (Ed.), *Bangladesh Government and Politics*. New Delhi: Deep & Deep Publications.

Haq shams-ul-Muhammed, *Bangladesh In International Politics*, University Press Limited,. Dhaka, 1993.

Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan*, University Press Limited, Dhaka, 1994.

Hauzel, Hoihnu (2005) 'Arms, Drugs smuggling and cross border terrorist activities', Ed. Farooq Sobhan, *Dynamics of India-Bangladesh Relations, Dailouge of young Journalists across the border*, Bangladesh: University Press Limited Bangladesh.

Hossain, Segufta,(2012) 'South Asia and the International Order', Edt. Pattanaik S Smruti, *Four Decades of India Bangladesh Relations*, New Delhi,Gyan Publishing House.

Jahan, Rounaq. (1980). *Bangladesh Politics: Problems and issues*. Bangladesh: University Press Ltd.

Kabir Shahriar, *Juddhaporadhider Bichar Ebong Jamaat – er Aparajniti* (Bengali), Ananya Publishers, Dhaka, February,2008.

Mehrish, B.N. (2000). 'Recognition of Bangladesh: An appraisal of India's policy'. In Verinder Grover (Ed.), *Bangladesh Government and Politics*. New Delhi: Deep & Deep Publications.

Mohite, Dilip (2003) *The Post-Cold War Era India's Foreign Policy: Continuity and Change, in India's Foreign Policy Emerging Challenges and Paradigms*, Vol-1, Edt. Upreti; B.C, Sharma; Mohanlal, Kaushik, S.M, Delhi:Kalinga Publications.

National Security Bangladesh 2009, edited by Golam Mohammad, The University Press Limited, 2010.

Omar Badruddin, *The Emergence Of Bangladesh : Class Struggles In East Pakistan (1947-58)*, Karachi, Oxford University Press, 2004.

Pandey, Onkareshwar (2006) *ISI and New Wave of Islamist Militancy in the North- East, In 'Illegal Migration From Bangladesh'*, Edt. B.B. Kumar, Delhi: AsthaBharti Publications.

Quarishi, M.Zaher (1996) *Post-Cold War context of India's Foreign Policy, in 'New World Order'*, Edt. Nautiyal; Annpurna, New Delhi: South Asian Publishers.

Roy Anil Baran, *Society, Religion And Politics In India*, Manuscript, India, Kolkata ,2001.

Roy Olivier, *The Failure Of Political Islam*, Harvard University Press, Boston, 1994.

Sibopada De (2005) *Across the India-Bangladesh Border at Dawa of Bangladesh*, New Delhi: Anamika Publishers & Distributers.

Thakar, Milind (2012) 'India-Bangladesh Relations: the Puzzle of Week Ties', in *India's Foreign Policy: Retrospect & Prospect*, Edt. Ganguly; Summit, India:Oxford University Press.

Thakar, Milind. (2010). 'Indo-Bangladesh Relations; The Puzzle of weak Ties'. In Sumit Ganguly (Ed.), *India's Foreign Policy Retrospect and Prospect*. New Delhi: OxfordUniversity press.

Yasin Madhavi, *Emergence Of Nationalism, Congress And Separatism*, Roy Publications, New Delhi, 1976.

Journal

বর্তমান, ৮ মে ২০১৩।

Abul Kashem, Md. Shariful Islam, "Narendra Modi's Bangladesh Policy and India-Bangladesh Relations: Challenges and Possible Policy Responses" India Quarterly, *Journal of International Affairs*, Vol. 72, Issue 3, 2016.

Ahamad Imtiaz , "Bangladesh , Jammat And Failure of Democracy", *Dak Bangla Intelligence Scan*, Wednesday, February 23, 2005.

Ahmed, Ishtiaq "The Partition of India: A Paradigm for Pathological Politics in India and Pakistan", *Asian Ethnicity*, Vol.5 March 2002.

Ali Raiz, "Bangladesh in 2004 The Politics of Vengeance and The Erosion of Democracy," *Asian Survey*, February,2005.

Anil Kamboj, "India-Bangladesh Relations", *World Focus*, Vol.28, No.4, April 2007.

Anisur Rahaman, "India Seeks Transit facilities in Banglades", Gulf News.com, April 19, 2011

Arunoday Bajpai, "Dynamics of India Bangladesh Relations", *World Focus*, February 2012.

Askari, Rashid. "Facts and fabrications of Bangladesh independence history", February 2012.

Bandyopadhyay, D, "Chinese Factor in Indo-Bangladesh Relations", *Mainstream*, 15 October 2011.

BBC News South Asia, "Indian PM Singh ends Bangladesh trip Without Sey deals, 6 September 2011.

Bhardwaj Sanjay, "Bangladesh Foreign Policy vis-a-vis India", *Strategic Analysis*, Vol. 27, Issue 1, 2003.

Bharadwaj, Sanjay. (April-June,2003). 'Bangladesh Foreign Policy vis-á-vis India'. The Institute for Defence studies and Analysis. *Strategic Analysis*, 27(2).

Bhattacharjee, 'Joyeeta. (September,2012). India-Bangladesh Relations: Finding A Way Forward'. *ORF ISSUE BRIEF*.

C. Raja Mohan, "India-Bangladesh Relations", *Indian Press*, 16 December 2011.

Chakraborty, Tridib, "Sheikh Hasina's India Mission: From Distance to Proximity", *World Focus*, February 2010.

Chakraborti, Tridib & Chakraborty; Mohor, "India and Bangladesh under UPA Phase II: Crests, Throughs and the Way Ahead", *World Focus*, February 2012.

Das, Gurudas, "Indo-Bangladesh Relations Issues in Trade, Transit and Security", *Himalayan and Central Asian Studies*, Vol.13, No.4, October-December 2009.

Das N.K, "Cultural Diversity, Religious Syncretism and people of India An Anthropological Interpretation", *Bangladesh E-Journal of Sociology*, Vol-3, No-2, July,2006

Datta, Sreeradh (Sep 2008). 'Bangladesh's relations with China and India:A comparative Study', *Strategic Analysis*, vol-32, issue- 5.

Dubey, Muchkund, "India-Bangladesh trade Prospects", *The Hindu*, New Delhi, May 7, 2003.

Hashmi, Taj, "The 'India Factor' in Indo-Bangladesh Relations", January 22, 2010.

Karim. A. Tariq and Charistune Fair , *Bangladesh At The Crossroads*, united states Institute of Peace, January 2007

Karlekar Hiranmoy, 'Bangladesh: The Next Afghanistan ?' *The Pioneer* , New delhi and Lucknow , December 13, 2002.

KAS Murshi, "Transit and Transshipment: Strategic Considerations for Bangladesh and India", *Economic and Political Weekly*, Vol. XLVI, No. 17, April 23, 2100, pp. 43-45.

Maritime Security; the case of Bangladesh, issue no 4, January 2009, Bangladesh institute of policy security studies, Dhaka.

Mr. Mahabub Hassan Saleh, Deputy High Commissioner, High Commission of Bangladesh, New Delhi, India, "Bangladesh-India Relations", School of Social Science, Manipur Central University, Imphal, 17th August 2012.

Mustafizur Rahman, "Bangladesh's Export Opportunities in the Indian Market: Addressing Barriers and Strategies for Future", *Southe Asia Economic Jounal*, Vol. 12, No. 1, March 2011, pp. 117-141.

Roy, Bhaskar "Keeping Bangladesh Stable" SAAG .ORG October 2. 2012.

Sringal, Harsh vardhan (Nov 2018). 'India Bangladesh relations: An Indian Perspective', *Strategic Analysis*, vol-42, issue-5, pp 524-528.

The Times of India, Kolkata, 26 March 2013.

Verma, Anand V. (January 2,2009). 'Security Threats Facing India'. *Indian Defence Review*, 23.